কাশ্মীর রণাঙ্গনে
… …

আমি কেন, কখন, কীভাবে ভারত গেলাম। সেখানে আমার মিশন কী ছিল। বাবরী মসজিদে কীভাবে উপস্থিত হলাম। কাশ্মীর কী উদ্দেশ্যে গেলাম। তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের স্তর কীভাবে পার হলাম। প্রাথমিক তিনটি টর্চারিং সেন্টারে আমার উপর কী কী নির্যাতন হল। কারাগারের দিনগুলো কীভাবে কাটলো ইত্যাদি সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এই বই।

মাওলানা মাসঊদ আযহার
কাশ্মীর রণাঙ্গনে

মূল
মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার

অনুবাদ

আবূ উসামা

শিক্ষক ও অনুবাদক

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান) ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কাশ্মীর রণাঙ্গনে
মূলঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার অনুবাদঃ আবূ উসামা

প্রকাশক
আবূ আবদিল কাদীর
মুমতায লাইব্রেরী
ঢাকা, বাংলাদেশ

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান) ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদঃ ইবনে মুমতাজ গ্রাফিক্সঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মূল্যঃ একশত বিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

বাতিলের আতংক, মুসলিম বিশ্বের অহংকার, এ যুগের শ্রেষ্ঠ দুই মুসলমান -

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর ও শাইখ উসামা বিন
মুহাম্মাদ বিন লাদেন (দামাত বারাকাতুহুম)-এর
দন্ত মুবারকে।

যাদের হুংকারে কেঁপে উঠেছে এ যুগের নরাধম ও নব্য
ফেরাউনদের ক্ষমতার মসনদ।
যাঁদের রাহনুমায়ীতে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান খুঁজে পেয়েছে ইসলাম
রক্ষার একমাত্র উপায়—জিহাদের গৌরবময় পথ।
হে আল্লাহ! মুসলিম বিশ্বের এ দুই সিংহপুরুষকে তুমি হায়াত
দারাজ কর। শত্রুদের সকল ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র থেকে এ দুই
মহান নেতাকে তুমি হেফাজত কর। দুনিয়ার সকল মুসলমানকে তুমি এঁদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ও কামিয়াব কর।
আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

প্রকাশকের কথা

আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর, শাইখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন ও জায়শে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামক মুজাহিদ বাহিনী)এর আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার (দামাত বারাকাতুহুম) এমন কয়েকজন বরকতময় ব্যক্তিত্বের নাম, যা উচ্চারণ করার সাথে সাথেই নিষ্প্রাণ মুসলিম বিশ্বেও প্রাণের স্পন্দন ও জাগরণের ধারা শুরু হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে শয়তানের দোসর বুশ, টনি, শ্যারণ, বাজপেয়ী, মুশাররফ ও কারজায়ীরা এ যুগের নব্য ফেরাউন সেজে সন্ত্রাস দমনের নামে মহাসন্ত্রাস সৃষ্টির প্রয়াস চালালেও উপরোক্ত মহান বুযুর্গত্রয়ের নাম শোনামাত্রই তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে, উৎকণ্ঠা ও আশংকায় তাদের গলা শুকিয়ে যায় বার বার। ফলে পাগলা কুকুরের ন্যায় তারা অহেতুকই আস্ফালন দেখায় ও যত্রতত্র আক্রমণের ছুতো খোঁজে।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমান যখনই আল্লাহ পাকের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে নব চেতনায় জাগ্রত হয়ে জিহাদের ভুলে যাওয়া সবককে ইয়াদ করে কাজে ঝাপিয়ে পড়ে তখনই কাফের সম্প্রদায় ও মুসলমান নামধারী তাদের পা চাটা দালালেরা প্রাণ ভয়ে ইদুরের গর্তে আশ্রয় খুঁজে। যুগে যুগে উমর, উসামা ও মাসঊদ নামক খোদায়ী সিংহগণ মুসলমানদেরকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর খলীফা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মুসলিম জাতি যখন জিহাদের মহান সবক ভুলে কাফের সম্প্রদায়ের দাসত্বকেই নিজের জন্য গৌরবের ব্যাপার মনে করছে, তখন সমগ্র পৃথিবীর শত্রুতার প্রতি কোন প্রকার আক্ষেপ না করে যারা জিহাদের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছেন প্রকৃত অর্থে তাঁরাই আল্লাহর সিংহ।

উপরোক্ত মহান বুযুর্গত্রয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার। আল্লাহ পাক তাঁকে লেখা ও বলার শক্তি সমভাবে দান করেছেন। তাঁর উন্নত বক্তব্য যদি মুসলিম সমাজকে গাফলতীর মরণতুল্য নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে, তাহলে তার ক্ষুরধার লেখনি হতাশা ও নিরাশায় আচ্ছন্ন মুসলিম সম্প্রদায়কে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে নতুন ইতিহাস রচনা করার জন্য উৎসাহিত করে।

আমাদের বর্তমান আয়োজন 'কাশ্মীর রণাঙ্গনে' মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার দামাত মারাকাতুহুমের অন্যতম রচনা **مسكرات** **زخم** বঙ্গানুবাদ। এ বইতে তিনি ঐ সব বিষয়ের রহস্য উম্মোচন করেছেন, যা জানার জন্য বিশ্বের প্রতিটি সচেতন মুসলমান উদগ্রীব। অর্থাৎ তিনি কখন, কিভাবে এবং কেন ভারত গেলেন। শহীদ বাবরী মসজিদে কি করে উপস্থিত হলেন। কাশ্মীর কি উদ্দেশ্যে গেলেন এবং সেখানে কি করে গ্রেফতার হলেন।

তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে চালানো অমানবিক নির্যাতন কিভাবে সহ্য করলেন। অর্ধ যুগেরও বেশী সময়ের বন্দী জীবন কিভাবে অতিবাহিত করলেন, ইত্যাদি সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এ বইয়ের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এটি তিনি মুশরেকদের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় লিখেছেন এবং অকল্পনীয়ভাবে তা পাকিস্তান পাঠিয়েছেন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

এ বইয়ের প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে নতুন পৃথিবীর স্বপ্নদ্রষ্টাদের জন্য পর্যাপ্ত পাথেয়, উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা, রোমাঞ্চ ও জাগরণের উপাদান। ফলে বইটি পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উঠতে পারা যায় না।

আমরা আমাদের নতুন প্রকাশনী মুমতায লাইব্রেরী থেকে এ ধরনের একটি দ্বীনী জাগরণমূলক বই প্রকাশ করতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি।

সহৃদয় পাঠক সমাজের নিকট অনুরোধ, কোথাও কোন অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন, যাতে পরবর্তীতে সংশোধন করা যায়।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জিহাদের মহান আমলে জান-মাল

নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনয়াবনত,
আবূ আবদিল কাদীর
মুমতায লাইব্রেরী, ঢাকা
১৭ রজব ১৪২৩ হিজরী।

অনুবাদকের আরজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জিহাদ ইসলামী জিন্দেগীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেনঃ “তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটি বিষয় পছন্দনীয় নয় অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।”(সূরা বাকারা, আয়াত ২১৬)

জিহাদের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন: “আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার, শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে ও পালিত ঘোড়া থেকে। যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের

উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর, আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও, যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে জানেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।”(সূরা আনফাল, আয়াত ৬০)
জিহাদের সময়সীমা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:
“আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।” (সূরা আনফাল, আয়াত ৩১)
আল্লাহ তাআলা দেখতে চান কারা তাঁর রাহে জিহাদ করে। তিনি এরশাদ করেনঃ “তোমরা কি মনে কর, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।”(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪২) জিহাদের ফযীলত এবং মুজাহিদদের মর্যাদা সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন: “গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান—যাদের কোন সংগত ওজর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদদেরকে উপবিষ্টদের উপর

মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।”(সূরা নিসা, আয়াত ৯৫-৯৬)

জিহাদ এড়িয়ে যারা ঘরে বসে থাকে এবং লড়াইয়ের ডাক শুনে তাতে সাড়া দিতে গড়িমসি করে তাদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেনঃ “হে নবী, আপনি ওদের বলে দিন যে, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়- স্বজন, তোমাদের সঞ্চিত সম্পদ ও বাণিজ্য— যাতে অচল অবস্থা দেখা দেওয়ার আশংকা কর এবং তোমাদের প্রাণপ্রিয় ঘরবাড়ী—এইসব যদি আল্লাহ, রাসুল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে অপেক্ষা কর, আল্লাহ স্বীয় কার্য সমাধা করবেন। জেনে রেখ, আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে সুপথে চালিত করেন না।” (সুরা তওবা, আয়াত ২৪)।

জিহাদে বিজয়ের নিশ্চয়তা দান করে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেনঃ “আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯)

বলা বাহুল্য যে, ইসলাম মানুষের প্রাণের মর্যাদা দান করে তার নিরাপত্তা সাধন করার জন্যই অধিক গুরুত্বসহকারে জিহাদকে ফরয করেছে। কারণ, যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের

প্রাণের সম্মান ও মূল্য নেই, নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই সেই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জন্য একত্রে বাস করা এবং ব্যবসা- বাণিজ্য, কায়-কারবার, কৃষিকাজ ইত্যাদি সম্পাদন করা সবই অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেখানে অন্যায়ের প্রতিকার ও দুনীতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকে, সেখানে নানারকম শয়তানী শক্তি জোটবদ্ধ হয়ে হাজার রকমের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে থাকে। নিষ্ঠুর শোষণ, লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি চালিয়ে থাকে। সুবিচার ও ন্যায়নীতির মূলোৎপাটন করে জুলুম ও অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে থাকে। সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের দাবিয়ে রাখে এবং অসৎ ও নীচুমনা লোকদের প্রতিপালন করে থাকে।

বিশ্বাসঘাতকতা, পর সম্পদ অপহরণ, ব্যভিচার, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, নৃশংসতা, বে-ইনসাফী ও যাবতীয় নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ প্রবল আকার ধারণ করে থাকে। এমনকি দুর্বল ও অসহায় জাতির স্বাধীনতা হরণ করা, নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা এবং নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বাধীন মানুষের গলায় গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে থাকে। উপরন্তু আল্লাহর বান্দাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। লোকদেরকে স্বধর্ম ত্যাগ করে হানাদার গোষ্ঠীর ধর্ম গ্রহণ করার

জন্য বিভীষিকাময় নিপীড়ন চালানো হয়। তখন হাঙ্গামা ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী হানাদার গোষ্ঠীর অনাচার থেকে মজলুম ও অসহায় মানুষকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া, বরং জালিমদের রক্তে পৃথিবীকে লাল করাই হয় মানবতার অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

বস্তুতঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং ফিতরাতের ধর্ম হিসাবে জিহাদকে যথাযথ গুরুত্ব দান করেছে। যতদিন মুসলিম উম্মাহ তাদের এই ঈমানী দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালন করেছে ততদিন মানুষের প্রাণের মূল্য ও মর্যাদা এবং নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা যথার্থই বহাল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানরা এক পর্যায়ে দুনিয়ার লালসায় মত্ত হয়ে গাফলতের নিদ্রা যাওয়ায় ইসলামের তরবারীতে মরিচা ধরে যায়। ফলে পৃথিবীময় অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতা দেখা দেয়, এমনকি হিংস্র, নরখাদক ও আগ্রাসনবাদের সৃষ্ট বিপর্যয়, লালসা, প্রতিহিংসা ও গোড়ামীর কারণে মসজিদসমূহ পর্যন্ত ধ্বংস হতে থাকে। ফলে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রকট হয়ে দেখা দেয়: “আল্লাহ তাআলা যদি মানুষকে মানুষ দিয়ে প্রতিহত না করতেন তাহলে গীর্জা, মন্দির, মসজিদ ও যাবতীয় উপাসনালয় ধ্বংস করে ফেলা হত।”... (সূরা হজ্জ, আয়াত ৪০)

“আল্লাহ যদি মানুষকে মানুষ দিয়ে শায়েস্তা না করতেন তাহলে দুনিয়া অরাজকতায় ভরে যেত। তবে বিশ্ববাসীর উপর আল্লাহ খুবই অনুকম্পাশীল (যে, তিনি অরাজকতা নির্মূল করার এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন)। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৫১)

তখন আল্লাহর এই ঘোষণা ঈমানদারদেরকে নাড়া দিতে থাকে।

“তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালায় আল্লাহ সে আগুন নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ নৈরাজ্যবাদীদের পছন্দ করেন না।” (সূরা মায়েদা, আয়াত ৬৪)।

বিশেষ করে বিগত কয়েক দশক ধরে ইহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চরম অরাজকতার ফলে নিরীহ মুসলমানদের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হতে থাকে। তারা পাশবিক লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে পৃথিবীর বহু দেশের মুসলমানদেরকে আল্লাহকে একমাত্র প্রভু মেনে নেওয়ার অপরাধে লোমহর্ষকভাবে নিধন, বিতাড়ন ও উচ্ছেদের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে পাশবিক উল্লাস করে যাচ্ছে। ফলে বিশ্ববাসীর মনে তাদের বিরুদ্ধে যেই ক্ষোভ ও আক্রোশ পুঞ্জিভূত হয়, তার গতি ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামকে রক্তপিপাসু, হিংস্র এবং মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বলে

ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। উপরন্তু তাদের বানোয়াট প্রোপাগাণ্ডার সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এহেন দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে আল্লাহর নিম্নোক্ত বজ্রবাণী ঈমানদারদের হৃদয়দ্বারে করাঘাত করতে থাকে, “আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না, দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে, এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর। এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।” (সুরা নিসা, আয়াত ৭৫)

এই ডাকে সাড়া দিয়ে প্রকৃত ঈমানদাররা বিভিন্ন দেশে জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেন। বিশেষতঃ আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া, মিন্দানাও, আরাকান প্রভৃতি দেশে তা উল্লেখযোগ্য অবস্থান গ্রহণ করে।

‘কাশ্মীর রণাঙ্গনে’ জিহাদের উপরোক্ত স্বর্ণশিকলের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, প্রবল প্রতাপশালী মর্দে মুমিন, জিহাদের অগ্রনায়ক, জাইশে মুহাম্মাদের প্রতিষ্ঠাতা আমীর হযরত মাওলানা মাসঊদ আযহার সাহেব,(দাঃ বাঃ)এর কাশ্মীর জিহাদের

দাস্তান। জিহাদের পথে তাঁর পদচারণার সূচনা, অগ্রগতি, উগ্রবাদী ত্রিশূলধারী পৌত্তলিকদের জিঘাংসা ও পাশবিক হিংস্রতার ফলস্বরূপ মুসলমানদের হৃদয়ের ধন বাবরী মসজিদ শহীদ হওয়ার পর তাঁর জাগরণমূলক অগ্নিঝরা বক্তৃতা, অবশেষে রাসূলের রওযা পাশে এর প্রতিকারে জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলনের অঙ্গীকারের মাধ্যমে জিহাদী তৎপরতায় নতুন আঙ্গিকে অগ্রসর হওয়া এবং জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কাশ্মীর রণাঙ্গনে গমন, সেখান থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হওয়া তারপর বন্দী জীবনে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করা এবং সেখানকার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার দাস্তান তাঁর স্বরচিত এই বই কাশ্মীর রণাঙ্গনে।

এই বই পাঠে আমরা জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, এর বর্তমান অবস্থা, এর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার হীন চক্রান্তের রূপরেখা এবং বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহের অপনোদন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারব। উপরন্তু, আমাদের হৃদয়ে জিহাদের যথার্থ গুরুত্ব ও সত্যিকারের জজবা জাগরুক হবে, এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের অনুবাদের কাজে হাত দেওয়া। বাংলাভাষী মুসলমানদের হৃদয়ে এর প্রতিফলন ঘটলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক মনে করবো। অনুবাদের কাজে যারা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে

তাদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। অনুবাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ত্রুটির কথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে সুহৃদ পাঠকের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।

পরিশেষে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে এই বই প্রকাশ পাওয়ায় সিজদাবনত মস্তকে তাঁর শোকরগুযারী করছি। আল্লাহ পাক আমাদের দ্বীনের সকল খেদমত কবুল করুন। আমীন।

নিবেদক
আবূ উসামা
২২ রজব, ১৪২৩ হিজরী

সূচীপত্র

বিষয়
পৃষ্ঠা
পূর্বকথা..15 কাশ্মীর রণাঙ্গনে....................................17 সূর্যের ললাটে..18 বাবরী মসজিদ শহীদ করে হিন্দুদের চরম মূল্য দিতে হচ্ছে.....................................23 দুটি ভারাক্রান্ত হৃদয়.........................29 জেদ্দা বিমান বন্দরে...............................32 রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর রওযায়...................................38 রিয়াযুল জান্নাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত.....42 সুতি রুমাল...44 যাত্রা হল শুরু...49 শিনাসা..51 বাবরী মসজিদের যিয়ারত...........................53 যুগের এক দুর্লভ ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ 59 প্রেমাস্পদের দিকে প্রেমিকের যাত্রা...59 ভারতের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ.........65 কাশ্মীর সফরের প্রস্তুতি.......................69 দিল্লী বিমান বন্দরে...............................74 উদাস আকাশ...77 শ্রীনগরের একটি বাড়ীতে.........................79

কাশ্মীরী ফার্ন ও কাংড়ী........................82 দুটি মুরগী...87 গাজীদের সাক্ষাৎ লাভ...............................91 নিদ্রার প্রতীক্ষায়..............................94 ভারতীয় সৈন্যের বেষ্টনীতে....................97 বন্দী হলাম...101 গালি বর্ষণ...105 কমাণ্ডার সাজ্জাদ (রহঃ)এর আদর্শ কুরবানী .... 109 ভারতীয় সৈন্যদের শ্লোগান....................115 জয় হিন্দ...116 বন্দী জীবনের শুরুর দিনগুলো................120 মুশরিকদের থেকে মুক্তির পথ..................123 শ্রীনগরের বাদামীবাগ টর্চারিং সেন্টার .... 129 বাদামীবাগ টর্চারিং সেন্টার................133 তদন্তের মর্মন্তুদ দিক.........................137 টর্চারিং সেন্টারে হজ্জের বয়ান.........148 রোদ উপভোগ ও ‘লা-শারীকা লাকা’ এর ব্যাখ্যা দান..148 ভারতীয় সৈন্যদের যথাযোগ্য নাম...........155 রিক্সাঃ..155 সিংঘারাঃ..156

বদআমলঃ...156 বিড়ি-সিগারেটঃ...................................157 বাচুংড়া ও পাঠঠাঃ..............................157 চোর মুখান্নাসঃ (হিজড়া)....................158 ভেড়াঃ...158 ডিসিপ্লিনঃ..159 পাটে খানঃ...161 খাদ্য প্রসঙ্গে কিছু কথা......................161 কাশ্মীরী বোনদের কুরবানী.....................163 লাড্ডু ও মাছ..165 মোমবাতির উপর তরকারী.............................166 কারাগারের হালুয়া................................166 টর্চারিং সেন্টারে ভুনা মুরগী.............167 উন্নত খাবার...167 টর্চারিং সেন্টারে জ্বিনের পশ্চাদ্ধাবন .... 168 মিথ্যা..172 সুবেদার নসীব সিং................................173 নানী বলে ফারসী....................................175 ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার............................179

পূর্বকথা

‘কাশ্মীর রণাঙ্গনে ’ আপনাদের হাতে। কিতাবটি ‘পাক্ষিক জায়শে মুহাম্মাদ ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক রচনা - **چـــاک قفس س** (খাঁচার ফাঁক গলিয়ে)এর প্রাথমিক ৩২টি পর্ব ও একটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার সমন্বয়ে রচিত।

আমি ভারতে কখন , কিভাবে ও কেন গেলাম ? সেখানে কী কাজে ব্যস্ত ছিলাম , বাবরী মসজিদে কিভাবে হাজির হলাম ? কাশ্মীর কী মিশন নিয়ে গিয়েছিলাম ? কিভাবে গ্রেফতার হলাম? জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব কিভাবে অতিবাহিত হল? প্রাথমিক তিনটি নির্যাতন কেন্দ্রের (টর্চারিং সেন্টার) নির্যাতন কিভাবে সহ্য করলাম? এ সকল প্রশ্নের উত্তর এ কিতাবে দেয়া হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত এ সকল লেখাকে পুস্তকাকারে সাজাতে গিয়ে কোন কোন জায়গায় সংশোধন , সংযোজন ও বিয়োজন করতে হয়েছে।

আমি শুরু থেকেই এই স্বরচিত কাহিনী সম্পর্কে চেষ্টা করেছি যাতে এটা আত্মকাহিনীর রূপ লাভ না করে। এজন্যই এ বইতে আমার নিজের ব্যক্তিগত ঘটনা খুবই কম

কিন্তু অন্যান্য মুজাহিদ ও সাধারণ মানুষের কথা অধিক পরিমাণে আলোচনা করেছি।

আন্দোলনের ব্যস্ততম দিনসমূহে ও ঝটিকা সফর চলাকালে ,
কারাগারের কঠিন দিনের দুঃসহ অবস্থাসমূহ লিপিবদ্ধ করা আমার জন্য কিছুটা কষ্টকর অবশ্যই ছিলো, যার দরুন কিছু ঘটনা যথাযথভাবে লিখতেও পারিনি।

কিন্তু আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে কিছু কিছু অগোছালো কথা প্রতি পনের দিন পর নিয়মিতভাবে পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হয়েছে। অসুস্থতার সময়ে - **چاک قفس س** (খাঁচার ফাঁক গলিয়ে)এর কয়েক পর্ব একত্রে লেখার সুযোগ হয় এবং এ সময়ই এ লেখাগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ লেখা ও প্রকাশনার কাজ পাক্ষিক জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পত্রিকায় এখনো অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তী কয়েকটি নির্যাতন কেন্দ্র , কারাগার এবং কারাগার থেকে মুক্তির আশায় বন্দী মুজাহিদদের খননকৃত সুড়ঙ্গ পথের আলোচনা সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা এখনো লেখা হয়নি।

আপনারা এ অংশ পাঠ করে পরবর্তী কিতাব শেষ হওয়ার জন্য দুআ করুন। এই কিতাব পাঠে যদি আপনাদের কোন উপকার হয় , তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য দুআ করবেন যে , দুনিয়ার কারাগার ও তাতে বন্দিত্বের ছয়

বৎসর অতিবাহিত হয়ে এখন তা অতীত কাহিনীর রূপ লাভ করেছে। কিন্তু এখনো জীবন নামক কারাগারের চাকা সচল রয়েছে। আল্লাহ পাক যেন মৃত্যুর পরের কারাগার থেকে মুক্তি দান করেন এবং মৃত্যু যেন আযাদীর পয়গাম হয়ে আসে। ঐ মালিক যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যিনি জীবন ও মৃত্যুকে পয়দা করেছেন। এটাই আমার আহত হৃদয়ের আশা- আকাংখা! এটাই আরজু ও আগ্রহ! হে আল্লাহ! এই কিতাবকে কবুল করুন এবং একে আকাংখা পূর্ণ হওয়ার মাধ্যম বানান।

আমীন। হে দুর্বল ও মুজাহিদদের প্রভু!

বিনীত

মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার
২০শে জুমাদাল উলা, ১৪২১ হিজরী
১১ আগষ্ট ২০০১ ঈসায়ী
জামেয়াতুল ফুরকান, করাচী

কাশ্মীর রণাঙ্গনে ছয় বৎসর চব্বিশ দিনের বন্দী জীবন কিভাবে অতিবাহিত হল? এই দীর্ঘ সময়ে কি কি উত্থান-পতন পর্যবেক্ষণ করলাম? কারাগারের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরীণ জগতে কি হয়? জিজ্ঞাসাবাদ ও টর্চারিং সেন্টারের কষ্টদায়ক দুঃসহ অবস্থা কিভাবে অতিবাহিত হয়? এতদসত্ত্বেও সেই যাতনার জগতে ঈমানদারের মুচকি হাসি এবং কোন কোন সময় অট্টহাসি কিভাবে বুলন্দ হয়? জেলখানায় আযান, নামায, শিক্ষা-দীক্ষা, যিকিরের মজলিস, মিছিল, সভা, প্রতিবাদ- প্রতিরোধ, পাহারা, মুক্তির আশায় বন্দী মুজাহিদদের খননকৃত সুড়ঙ্গ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কিভাবে হয় এবং কেমন হয়? মুক্তির উপায় খোঁজার জন্য গোপন বৈঠক, বিস্ময়কর প্রচেষ্টা, অতঃপর তা সফল হওয়া বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া। এ সকল বিষয় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার। আমার গ্রেফতার হওয়ার কারণ কি ছিল এবং কি অবস্থায় গ্রেফতার হলাম? এটাও এ বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় লেখা পাঁচশতের অধিক চিঠিও এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদেরকে মুক্ত

করার জন্য নেওয়া কয়েকটি বড় উদ্যোগ কি ছিল, সেগুলো বাহ্যিকভাবে কেন ব্যর্থ হল এবং তার কারণই বা কি ছিল, এ বিষয়েও লেখার, আলোচনা করার ও চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া সর্বশেষ সেই সফল অভিযান, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদের মুক্ত করলেন, তার অনুদ্ঘাটিত অধ্যায়সমূহই এ বইয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক। আমি অবশ্য তিহার জেলে বন্দী থাকাকালে কারাগার ও বন্দী জীবনের পঞ্চাশোর্ধ হৃদয় বিদারক ও আকর্ষণীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছি। যার কিছু কিছু অংশ 'সাপ্তাহিক যরবে মুমিন' পত্রিকায় মুফতী খুবায়েব ছদ্মনামে ছাপা হয়েছে। আমার প্রিয় দোস্ত-আহবাবগণ আমার জন্য এই ছদ্মনাম নির্বাচন করে আমার কিতাব **زاد مجاہد** (মুজাহিদের পাথেয়) এবং কারাগার সংক্রান্ত আমার লেখাসমূহ প্রকাশ করেছেন। আমার এ সকল লেখা একত্রে কাশ্মীর রণাঙ্গনে নামে প্রকাশিত হচ্ছে। মূল উর্দু কিতাবের নাম **مسکراتے زخم** (যাতনার মুচকি হাসি) জেলখানা থেকে আমিই নির্বাচন করেছিলাম এবং তার প্রচ্ছদে এ কবিতা লেখার অনুরোধ করেছিলাম -

زخم میرے مسکرائے ہیں کچھ اس انداز سے
دشمنوں کے دل جلے اور دوستوں کی نکلی آہ

(অর্থঃ আমার বেদনার হাসি এমন অপূর্ব আঙ্গিকে বিকশিত হল, যা দেখে শত্রুর হৃদয় দহন হতে থাকে। আর বন্ধুদের হৃদয় হতে বের হয়ে আসে আর্তনাদ!)

তাজা ক্ষতের মুচকি হাসির কথা হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহঃ) নিম্নোক্ত কবিতায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے
کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی
ہے

(তোমরা আমার অধরে হাসি দেখে ভুল বুঝ না, কেননা, আমার অধরে আমার আহত হৃদয়ের বেদনা হাসি হয়ে ঝরছে।)

কিতাব যখন পূর্ণতার একেবারে শেষ পর্যায়ে তখন আমি বিভিন্ন সমস্যা ও ব্যস্ততায় এমনভাবে আবদ্ধ যে, পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার দেখার আর সময় বের করতে পারিনি। এ ব্যাপারে আমি শ্রদ্ধেয় পাঠক সমাজের দুআপ্রার্থী। প্রথমে আমার ইচ্ছা ছিল, এর শুরু এবং শেষে কয়েকটি নতুন বিষয় ও অবস্থার কথা আলোচনা করে এই ধারাবাহিক লেখাটির ইতি টানবো, কিন্তু যখন পাক্ষিক ‘জায়শে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ নামক পত্রিকা বের করার পদক্ষেপ নেওয়া হল, তখন আমার সহকর্মীগণ পরামর্শ দিলেন যে, আপনার বন্দী জীবন, মুক্তি অভিযান ও আযাদী লাভের ঘটনাসমূহ ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ভাল হবে। বন্ধুদের পরামর্শ শক্তিশালী এবং তাদের দলীল যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলাম। দুআ করুন, আল্লাহ

পাক যেন এ বিষয়ের হক আদায় করার তাওফীক দান করেন এবং এই রচনাকে জিহাদ ও উম্মতে মুসলিমার জন্য উপকারী বানান। ইনশাআল্লাহ আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে এ লেখা পেশ করার চেষ্টা করবো।

সূর্যের ললাটে
বাবরী মসজিদের শাহাদাত বরণ একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা ছিল। এই দুর্ঘটনা বিরাট সংখ্যক মুসলমানের জাগ্রত হওয়ার এবং মুক্তির উপায় খোজার উপকরণ হয়েছে। কারণ, বাবরী মসজিদকে শহীদ (ধ্বংস) করে ইসলাম বিরোধী শয়তানী শক্তি মুসলমানদের উদ্দীপনা, ঐকান্তিকতা ও জযবার পরীক্ষা নিতে চেয়েছিল, কিন্তু এই পরীক্ষা কাফেরদের জন্য উল্টো ফল বয়ে আনল। এই দুর্ঘটনার ফলে অনেক নামের মুসলমান, কামের (সত্যিকার) মুসলমান হয়ে যায়। সাথে সাথে ভারতের মুসলমানদের সামনে গান্ধীবাদ, অহিংসনীতি, পরমত সহিষ্ণুতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ উম্মোচিত হয়। এ সকল সুন্দর শব্দের আড়ালে লুকায়িত হিন্দুত্ববাদ এবং তার প্রকৃত কুৎসিত চেহারা দৃষ্টিগোচর হয়। এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, আজ থেকে পনের/বিশ বৎসর পূর্বে সমগ্র মুসলমান জাতি জিহাদ থেকে গাফেল হয়ে স্বীয় গর্দানে দাসত্বের বেড়ি পরতে যাচ্ছিল। তাছাড়া মুসলমানদের হাত থেকে খেলাফত ছিনিয়ে নেওয়ার পর থেকে এক কেন্দ্রের অধীন হওয়া, স্বাধীনতা

লাভের স্পৃহা এমনকি ইসলামী পুনর্জাগরণের গুরুত্ব পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। ফলে কয়েকটি কুফরী শক্তি পুরো দুনিয়াটা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয় এবং মুসলমানদেরকেও ভাগাভাগী করে নিজেদের প্রজা বানিয়ে নেয়। মুসলমানগণ অসহায়ভাবে এ সবকিছু সহ্য করতে থাকে এবং মনে করতে থাকে যে, এখন গোলামী মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে পৌছে যে, মুসলমানদের স্বতন্ত্র ইসলামী বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর জানাযা পড়ে তাকে দাফন করে দেওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু এ অবস্থায় হঠাৎ এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা মুসলমানদেরকে গাফলত ও অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে এবং তাদের কাঁধ থেকে গোলামীর জোয়াল এবং হাত থেকে কাস্তে কেড়ে নিয়ে ইজ্জত ও আযাদীর প্রতীক হাতিয়ার ধরিয়ে দেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে পূনরায় এমন বাহাদুর জানবাজ জন্মগ্রহণ করতে থাকে, যাদের নাম শুনেই কাফের সম্প্রদায় থর থর করে কাঁপতে থাকে এবং যাদের মাথার মূল্য ঘোষণা করা হয়। মায়েদের কোল যখন বাহাদুর সন্তান দ্বারা পূর্ণ হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাদের ক্রেতা হলেন। আতশবাজীর আওয়াজকে যারা ভয় করতো, বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ইসলাম তার শক্তি ও

মুসলমান তাদের শৌর্য- বীর্যের স্বীকারোক্তি আদায় করে নিল। যে সকল ঘটনা ব্যাপকভাবে মুসলমানদের জাগরণের উসীলা হয়েছে যদিও তা অনেক, তবে মৌলিকভাবে তিনটি ঘটনা মুসলমানদেরকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করেছে এবং তাদের মধ্যে নবজাগরণের সঞ্চার করেছে। সেগুলো হলো-

১, আফগানিস্তানে রাশিয়ার লাল বাহিনীর অনুপ্রবেশ।

২, বসনিয়ার অসহায় মুসলমানদের উপর হিংস্র সার্বদের আক্রমণ।

৩. বাবরী মসজিদের শাহাদাত।

এই তিনটি ঘটনা মুসলমানদের বর্তমান অবস্থাকে তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে পূনরায় এমন সকল বীর ও ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করতে আরম্ভ করল, যাদের নাম শুনে কাফের সম্প্রদায় থর থর করে কাঁপতে থাকে। ঐ তিনটি ঘটনাই কাশ্মীরের জিহাদে প্রাণসঞ্চার করে এবং পৃথিবীর জান্নাত বলে খ্যাত কাশ্মীর ভূমি জান্নাতী ব্যক্তিদের পদচারণায় মুখরিত হতে থাকে। ঐ তিনটি ঘটনার বদৌলতেই মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামকে দাফন করার এবং মসজিদে আকসাকে বিক্রি করার হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। আরব, অনারব, ইউরোপ ও আমেরিকা সহ সমগ্র দুনিয়ায় দুঃসাহসী জানবাজ মুজাহিদ এবং ইতিহাসের

গতি পরিবর্তনকারী শহীদী কাফেলা তৈরী করার ক্ষেত্রেও এই তিনটি ঘটনার বিরাট অবদান রয়েছে। কাফেরদের এই তিনটি ভুল পদক্ষেপ মুসলমানদের জন্য সামগ্রিকভাবে উপকারী প্রমাণিত হয় এবং কাফের মুশরেকদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বক্ষে আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান, বসনিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় যে আঘাত করা হয়েছিল তার বিষক্রিয়া দ্রুত কাফের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রত্যাঘাতরূপে প্রত্যাবর্তন করে। তারা এখনো এর প্রত্যাঘাতের যাতনায় গোঙ্গাচ্ছে, হাপিত্তেস করছে। আমাকে গ্রেফতার করার পিছনেও এই তিনটি ঘটনা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর ছিল।

আফগান জিহাদ আমার মত নিঃষ্কর্মাকেও জিহাদের ময়দানে টেনে আনে। বাবরী মসজিদের শাহাদাত আমাকে অস্থির করে তোলে এবং আমার ক্ষীণ আওয়াজ দুনিয়ার অসংখ্য মুসলমান পর্যন্ত পৌছে দেয়। বসনিয়ার মুসলমানদের প্রতি নিপতিত নির্মম অত্যাচার আমার কলিজা ও অন্তরকে আহত করে। সুতরাং আমি আফগান জিহাদ থেকে আত্মস্থ করা জিহাদের চিরকল্যাণকর আগুন বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী নাপাক মুশরিকদের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানে পৌঁছে দিয়ে বসনিয়া সফরের ইচ্ছায় রওয়ানা হয়ে কাশ্মীরের পবিত্র জিহাদে অল্প সময়ের জন্য অংশগ্রহণের প্রাক্কালে গ্রেফতার হই।

আমি বন্দী থাকা অবস্থায় আফগান জিহাদ তার উজ্জ্বলতম অধ্যায়ে পৌঁছে এবং আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতৃহারা মুরগীর বাচ্চার ন্যায় অসহায় পেরেশান মুসলমানগণ পূনরায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আলহামদুলিল্লাহ! এতে করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য একটি মজবুত আশ্রয়স্থল লাভ হয়। আমি এ সকল মনোরম দৃশ্য অনেক দূরে বসে পর্যবেক্ষণ করি। আমি বন্দী থাকা অবস্থায় যদিও বসনিয়ায় অত্যাচারের আগুন কিছুটা ঠাণ্ডা হয় কিন্তু এই সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক অগ্নি কসোভোতে স্থানান্তর করে আমাদের বক্ষে ছুরি চালানো হয়। আমি জেলখানার শিকের ভিতর থেকে এই আঘাতের ব্যথা অনুভব করি। বাবরী মসজিদ শহীদ করার পর হিন্দুস্তানের এ যুগের ফিরআউন আদভানীর আরো তিন হাজার মসজিদ ধ্বংস করার প্লান ছিল এবং তার নাপাক হাত ‘কাশী’ ও ‘মথুরা’র মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্রাজ্যের পা জমিনে ধ্বসতে শুরু করে এবং ত্রিশূলধারী মুশরিক সম্প্রদায় ঘাবড়ে যায়। আমি ইসলামের বিজয় ও মুশরিকদের পরাজয়ের আকর্ষণীয় দৃশ্য জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে দেখছিলাম। ইরাকের উপর আমেরিকা ও তার মিত্রবাহিনীর দ্বিতীয় দফা আক্রমণ, চেচনিয়ার উপর রুশ বাহিনীর মর্মান্তিক

অত্যাচারের দাস্তান আমার জেলখানার কষ্টকে আরো বাড়িয়ে তোলে। কাশ্মীরের জিহাদের উত্থান- পতন এবং হিন্দুস্তানে চলমান অন্যান্য আন্দোলনকে আমি ছয় বৎসরের বন্দী জীবনে অনেক নিকট থেকে দেখেছি। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার দখলদারিত্ব অতঃপর সেখান থেকে ক্রুজ মিসাইল দিয়ে আফগানিস্তানে আক্রমণ বিশ্ব মুসলিমের অবস্থাকে ভিন্ন খাতে এমন সময় প্রবাহিত করলো, যখন আমি নিজেই বিড়ম্বনার শিকার।

রক্তাক্ত বিংশ শতাব্দী তার শতাব্দীব্যাপী কার্যকলাপ ও রক্তের সমুদ্র প্রবাহিত করে বিদায় নিচ্ছিল। রোমের পোপ ঘোষণা দিচ্ছিল যে, একবিংশ শতাব্দীতে খৃষ্টবাদ পুরো এশিয়াকে গ্রাস করে ফেলবে। পক্ষান্তরে হিন্দুস্তানের গণক ও জ্যোতিষ সম্প্রদায় ঘোষণা দিচ্ছিল যে, একবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুস্তান পুরো এশিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্র ও শক্তি সম্মিলিতভাবে ঘোষণা দিচ্ছিল যে, একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামী মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে (অর্থাৎ, ইসলামী স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য, ইসলামী শক্তি ও ইসলামী জিহাদ) পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এ সকল অপশক্তির বড় বড় দাবী ও দুনিয়া কাঁপানো চ্যালেঞ্জের সাথে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিনের সূর্য উদয় হয়। এই

সূর্যের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ব্যতিক্রম কিছু সন্ধান করে ফিরছিল, এই সূর্য একবিংশ শতাব্দী সম্পর্কে স্পষ্ট কোন পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিল।

ঘটনাক্রমে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিনের সূর্য ইহুদীদের আকাংখা অনুযায়ী শনিবারেও নয় এবং খৃষ্টান ও মুশরিকদের আশা অনুযায়ী রবিবারেও নয় বরং সূর্য মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের বরকতময় দিন শুক্রবারে উদিত হয়। এ দিনের সূর্য তার অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করতে করতেই এ সকল কুফরী অপশক্তির চ্যালেঞ্জ মাটিতে মিশে যায় এবং তাদের নির্লজ্জ নাক কেটে খণ্ডিত হয়। সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে সফর করছিল, তখন জিহাদের পবিত্র ভূমি আফগানিস্তানের কান্দাহার এয়ারপোর্টে একটি বিমান অবতরণ করছিল। সূর্যের লাল টকটকে অগ্নিচক্ষু কাফেরদেরকে একথা বলছিল যে, তোমরা হেরে গেছ এবং পরাজয় তোমাদের ভাগ্যলিপিতে পরিণত হয়েছে। ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। জিহাদ তার গৌরবের স্বীকারোক্তি আদায় করেছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গৌরবজনক সকাল আত্মপ্রকাশ করেছে। ইত্যবসরে আছর নামাযের সময় হয়ে যায়। সূর্য ডুবতে ডুবতে লক্ষ্য করল যে, বাইতুল্লাহ ও মসজিদে নববী হতে আরম্ভ করে ইউরোপ ও আমেরিকার মসজিদসমূহে পর্যন্ত আনন্দ- উৎসব পালন করা

হচ্ছিল, শুকরিয়ার নফল নামায পড়া হচ্ছিল এবং মিষ্টি বন্টন করা হচ্ছিল।

পক্ষান্তরে সকল কুফরী অপশক্তির মধ্যে মাতম শুরু হয়ে যায়। প্রচণ্ড ভয়ে মুনাফিকদের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে থাকে। যে টেলিভিশন ও রেডিও তারা নিজেরাই আবিষ্কার করেছিল, সেগুলোই তাদের পরাজয়ের সংবাদ বার বার শোনাচ্ছিল। আর এভাবেই বিংশ শতাব্দীর শেষ দিন ইসলামের বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্বের অটল সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর টার্গেট নির্দিষ্ট করছিল। হায়! যদি মুসলমানগণ একথা অনুধাবন করতো, তাহলে জানবাজ মুজাহিদদের আত্মত্যাগ, শহীদদের পবিত্র খুন এবং ইসলামের বিজয়ের স্বর্ণোজ্জ্বল ধারা অব্যাহত থাকত। হায়! কাফের সম্প্রদায় যদি এটি অনুভব করত এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ভবিষ্যত অপমান থেকে রেহাই পেত।

বাবরী মসজিদ শহীদ করে হিন্দুদের চরম মূল্য দিতে হচ্ছে
১৯৯৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের ঈমানদীপ্ত বিজয়ের সাথে ১৯৯২ সনের ৬ই ডিসেম্বরের ভয়ংকর দিনের একটি সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে। যদিও আমি ১৯৯৪ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী গ্রেফতার হয়েছি কিন্তু

আমার বন্দীত্বের পূর্ণ ঘটনা ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর থেকে নিয়ে। সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। চলুন ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরের দিকে চোখ ফিরাই। সেদিন যখন হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশের (ইউ.পির) ফয়েযাবাদ জেলার একটি ছোট শহর অযোধ্যায় পেত্নীর অট্টহাসির মাঝে আমাদের ইজ্জত-আব্রু ও মান-সম্মানের উপর হাতুড়ী, কোদাল ও হান্টার চালানো হচ্ছিল। অর্থাৎ, মুসলমানদের গাফলতীর শিকার এবং পরবর্তীতে মুসলমানদের জাগরণের উসীলা— বাবরী মসজিদ শহীদ করা হচ্ছিল। একদিকে দিল্লীতে নরসীমা রাওয়ের কংগ্রেস সরকার গান্ধীবাদের মুনাফিকী চাদর পরিধান করে নিজেদের মাথা হাঁটুর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। এই ঘটনা দেখেও না দেখার ভান করছিল। অপরদিকে ইউ,পির প্রাদেশিক সরকার কালিয়া সিং নামক মুশরিক মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মসজিদ ধ্বংসের কাজ নিজ হাতে সম্পন্ন করছিল। সেই ভয়ংকর দিনে দেওবন্দ, সাহারানপুরের মসজিদসমূহে নামাযী মুসল্লী থেকে আরম্ভ করে নাচ-গানে মত্ত বোম্বাইয়ের চিত্রতারকা পর্যন্ত সকল মুসলমানই হতবিহ্বল ছিল। দীর্ঘদিন যাবত যারা কট্টরপন্থী সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের মারাত্মক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত ছিল তারাও যেমন সেদিন ক্রন্দন করছিল, তেমনি ঐ সকল লোকও চিৎকার করে কাঁদছিল, যাদের আজ পর্যন্ত হিন্দুস্তানের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার উপর পরিপূর্ণ আস্থা

ছিল। আর ঐ সকল লোকও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল, যারা এতদিন পর্যন্ত হিন্দুস্তানকে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের চেয়ে বেশী নিরাপদ মনে করতো। ঐদিন ভারতের সকল মুসলমান অনুধাবন করলো যে, হিন্দুস্তানে তারা নিতান্তই একা, তাদের পুঁজি মুশরিক হিন্দু সম্প্রদায় লুণ্ঠন করে নিয়েছে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যত আশংকাযুক্ত। ঐ সকল মুসলমান যাদেরকে আলীগড় ইউনিভার্সিটি এবং স্বার্থান্ধ লোভী মুসলমান নেতৃবৃন্দ গাফলত ও চৈতন্যহীনতার ইনজেকশন দিয়ে ঘুমপাড়িয়ে রেখেছিল,তাদের ঈমান এবং গায়রতও পার্শ্ব পরিবর্তন করে জেগে উঠতে আরম্ভ করল এবং এভাবেই ধর্ম নিরপেক্ষতার ঘুম পাড়ানি মন্ত্র এবং টেবলেট তার প্রতিক্রিয়া হারিয়ে ফেললো

ধূর্ত হিন্দু সম্প্রদায় তাদের কাজকে সত্তর বৎসর পর্যন্ত দু' ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। তাদের এক অংশ আর,এস,এস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ) এবং ভি.এইচ.পি (বিশ্ব হিন্দু পরিষদ)এর নেতৃত্বে ভেতরে ভেতরে সংগঠিত হচ্ছিল এবং হিন্দুস্তানের সামরিক ও বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধীরে ধীরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছিল। সাথে সাথে যুবকদেরকে সামরিক ট্রেনিংও দিচ্ছিল। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে অখণ্ড ভারত

বানানোর স্বপ্নে তারা গোপনে আন্দোলন চালাচ্ছিল। পক্ষান্তরে তাদের অন্য গ্রুপ মাথায় গান্ধি টুপি পরে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে গাফলতী ও অলসতার স্বপ্নে বিভোর করে ধর্ম নিরপেক্ষতার নিদ্রাতুর বড়ি সেবন করিয়ে তাদের ঈমান ও গায়রতকে ঘুম পাড়ানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। এই উভয় গ্রুপই মুসলমানদের জন্য ছিল মারাত্মক বিপজ্জনক। এদের এক গ্রুপের হাতে ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীক ত্রিশূল, যার তিনটি ফলকই মুসলমানদের রক্তে গোসল করার জন্য পাগলপারা। অপর গ্রুপের হাতে ছিল মিষ্টিবিষের পেয়ালা। যে পেয়ালা থেকে দু'হাতে মুসলমানদের সে বিষ এজন্য পান করানো হচ্ছিল, যেন তারা মুসলমান না থাকে এবং সর্বদা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে। উভয় গ্রুপ উপমহাদেশের বিভক্তির পর খুব দ্রুত তাদের কাজ করে যাচ্ছিল।

অপরদিকে মুসলমানগণ তাদের কেন্দ্র ও নেতৃত্ব হারানোর ফলে উপরোক্ত উভয় গ্রুপেরই ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়। তদ্রুপভাবে যে সকল ফের্কা ও উপদল, মারাত্মক ধরনের ইসলাম বিরোধী ও ঈমান বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে তারাও হিন্দুদের এ সকল হীন ষড়যন্ত্রে হিন্দুদেরকে পরিপূর্ণরূপে সহযোগিতা করতে থাকে। এক্ষেত্রে কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও

হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায় সহ অন্যান্য ফের্কার লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে যেমন হিন্দুস্তানের মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও বিপদ -আপদের সম্মুখীন হতে হয় , অপরদিকে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান হিন্দুস্তানের মুসলমানদেরকে ভুলে গিয়ে তাদেরকে নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করতে থাকে। ফলে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের অবস্থা এ পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে ,

منزل نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی

اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا

অর্থাৎ , (এমন অসহায়) যার কোন মঞ্জিল নেই , (সমুদ্রে হাবু ডুবু খাচ্ছে) তবুও সমুদ্র তীর দেখার (এবং) সমুদ্র তীরে (পৌছার) আগ্রহও নেই। হে জিজ্ঞাসাকারী ! (তুমি তো ভালভাবেই জান) আমাদের পরিণতি কি হবে ?

গোলামী এমন এক মারাত্মক ব্যাধি , যা একটি জাতিকে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক রোগে আক্রান্ত করে দেয়। গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ জাতি , ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তাদের জীবিত থাকার জন্য প্রতিটি শ্বাস -প্রশ্বাসেই মুনাফেকীর আশ্রয় নিতে হয়। এ কারণেই মিথ্যা বলা ও সুযোগ সন্ধানী হওয়াটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। গোলামী মানুষের যবানকে তীক্ষ্ণ এবং

হিম্মতকে দুর্বল করে দেয় এবং মানুষের মধ্যে কাজ করার পরিবর্তে শুধু বড় বড় কথা বলার ও চাপাবাজি করার প্রবণতা দেখা দেয়। গোলামী মানুষের মধ্যে হীনমন্যতার মত মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে, যার দরুন লৌকিকতা, বাহানা এবং অহংকারের মত মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং অন্যের সামনে নিজেকে বড় করে দেখানোর ও বড় বড় বুলি আওড়ানোর মত অহেতুক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যে সকল জাতি গোলামীর জিঞ্জির গলায় নিয়ে প্রতিপালিত হয়, তারা আত্মার উন্নতির কথা ভুলে গিয়ে উদরপূর্তির চিন্তায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর সীমাতিরিক্ত পেট পালার চিন্তা মানুষকে সর্বপ্রকার অন্যায় কাজে লিপ্ত করে দেয়। গোলামী মানুষকে বিভিন্ন প্রকারের নেশা, অহেতুক খেলাধুলা ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত করে দেয়। আর এ পর্যায়ে গোলাম জাতি নিজের ব্যথাকে ভুলে থাকার জন্য আত্মবিস্মৃতির মত মারাত্মক তো আক্রান্ত হয়ে যায়। গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ জাতি অধিকাংশ সময় আত্মত্যাগ, কুরবানী ও বিশ্বস্ততা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও বিপদ-আপদ তাকে স্বার্থপর বানিয়ে দেয়। সে শুধু নিজের স্বার্থ চিন্তায়ই মগ্ন থাকে, অন্যের জন্য কোন কিছু চিন্তা করার সময়ই সে পায় না। ফলে তাদের চিন্তাশক্তি লোপ পায় এবং তাদের

কর্মশক্তি সংকুচিত হয়ে যায়। সাথে সাথে তারা এমন নীচ ও সাধারণ কাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে শুরু করে, যার প্রতি অতি গুরুত্বারোপ মানুষ ও মানবতার জন্য অপমান বৈ নয়।

গোলামীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে গোলামীর ক্ষতিকর প্রভাব হতে বেঁচে থাকা অসম্ভব না হলেও কষ্টকর অবশ্যই। তাছাড়া মানুষের স্বভাবও এমন যে, সে সহজে নিজের ভুল এবং পরাজয় স্বীকার করে না। গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ জাতি, কোন কোন সময় গোলামীকে পরাজয় মনে করে তা থেকে বাঁচার পরিবর্তে তাকে গর্বের ব্যাপার মনে করতে আরম্ভ করে এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে বাস্তব অবস্থা অস্বীকার করতে হয় এবং সাথে সাথে স্বাধীন জাতির দোষ আবিষ্কার করতে হয়। গোলামীর এই স্তরটি অত্যন্ত বিপদজনক। কারণ, এ স্তরে পৌছলে স্বাধীনতার আশা শেষ হয়ে যায়, মানুষ নিজেকে পরিস্থিতির হাতে সঁপে দিয়ে ধ্বংস ও অপমানকে নিজের ভাগ্যলিপি ভাবতে থাকে।

হিন্দুস্তানের মুসলমান লেখকদের মধ্যে থেকে ওয়াহিদুদ্দীন খানের রচনাবলী পাঠ করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, সে গোলামীর এই বিপদজনক স্তরেই পৌঁছে গেছে। এ কারণেই সে জিহাদ ও স্বাধীনতার মত বাস্তবতাকেও অস্বীকার করে এবং এই মারাত্মক তো আক্রান্ত হওয়ার কারণে সে আযাদী পাগল

মুজাহিদদেরকেও সহ্য করতে পারে না। বাস্তবতা এই যে, উপমহাদেশের অন্যায় বিভাজন হিন্দুস্তানের মুসলমানদেরকে গোলামীর অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছে। এটা অবশ্য আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ এবং আকাবিরদের মেহনতের ফল যে, হিন্দুস্তানের মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ গোলামীর এই মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেঁচে আছেন। অবশ্য এটাও একটি তিক্ত সত্য যে, মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ গোলামীর বিভিন্ন প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে ঐ সকল মারাত্মক রোগ স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়, যার আলোচনা আমি সামান্য পূর্বে করেছি। আফসোসের ব্যাপার হল, গোলামী যেহেতু মানুষের মধ্যে স্বার্থান্ধতা ও অহংকারের সৃষ্টি করে, এজন্য আমার এ আলোচনা হিন্দুস্তানের কিছু কিছু মুসলমানের খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু আমার বাস্তব অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের মধ্যে অথবা নিজের পরিবারের মধ্যে রোগ এজন্য খুঁজে যে, তার যথাযথ চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলবে। তদ্রুপ আমরাও আমাদের হিন্দুস্তানের মুসলমান ভাইদের জন্য চিন্তিত থাকি।

আলহামদুলিল্লাহ! হিন্দুস্তানের অধিকাংশ মুসলমান আমাদের নিয়ত ও ইচ্ছাকে ভালভাবে জানেন এবং বুঝেন। এভাবে গোলামীর কুপ্রভাব নিয়ে আলোচনার অর্থ এও নয় যে, আযাদ

মুসলমানগণ একেবারে দুধে ধোয়া ও ত্রুটিমুক্ত। বরং বাস্তব অবস্থা এই যে, সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদেরকে আজ গোলামীর জিঞ্জির চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে এবং কেউই আজ পূর্ণ স্বাধীন নয়। জিহাদ ত্যাগ করার অভিশাপ আমাদেরকে অপমান ও অপদস্থতার অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছে। এছাড়া ইয়াহুদীদের অনেক বদঅভ্যাসের অনুসরণ ও অনুকরণ করার ফলে আমরা পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছি।

মুসলমান জাতি হিসেবে আমরা ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম থেকেও বঞ্চিত এবং কেন্দ্র থেকেও বিচ্যুত হয়েছি। যদি কেউ এ কথায় দ্বিমত পোষণ করে, তাহলে সে বলে দিক মুসলমানদের কেন্দ্র কোনটি? কেন্দ্র তো আমরা তাকেই বলবো, যা আমাদের সবার জন্য সমান হবে, আমাদের সকলের ব্যথায় ব্যথিত হবে। এমন কেন্দ্র, যাকে আমরা পরিপূর্ণরূপে নিজেদের কেন্দ্র হিসাবে পরিচয় দিতে পারি এবং যেখানে মুসলমানদেরকে অমুসলমানদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। এমন কৈন্দ্র, যেখানে পৌছে আমরা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করতে পারি। এমন কেন্দ্র, যেখানে আমাদের সাথে বংশ, বর্ণ ও এলাকার ভিত্তিতে পার্থক্য করা হয় না।

অবশ্য এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, বর্তমানে কয়েক বৎসর হতে আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য

একটি কেন্দ্র গড়ে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের গাফলত, অলসতা ও স্বার্থপরতার কারণে ঐ কেন্দ্রও পরিপূর্ণরূপে সংগঠিত ও সংরক্ষিত হতে পারেনি। রিক্ততার এ দহন ও বঞ্চনার এ দাস্তান অন্য সময়ও আলোচনা করা যাবে। আমি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ যখন গোলামীর ছুরির নিচে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিল, ঠিক তখন সাম্প্রদায়িক কট্টোরপন্থী বিষাক্ত হিন্দু অজগর দীর্ঘ দিনের গোলামী মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে নিজের ফনা বিস্তার করছিল।

আর,এস,এস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ) দীর্ঘ সত্তর বৎসরের গোপন কার্যক্রম চালানোর পর এখন চূড়ান্ত আক্রমণ করে হিন্দুস্তানকে মুসলমানদের জন্য দ্বিতীয় স্পেনে পরিণত করার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর,এস,এস-এর পৃষ্ঠপোষক সংগঠন ‘বিশ্ব হিন্দু পরিষদ’ও তার কাজ ও কর্মসূচীর ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটিয়েছে। আর,এস,এস-এর সশস্ত্র সংগঠন ‘বজরংদল’ ও ‘শিবসেনা ইত্যাদি নামে শক্তি সঞ্চয় করছিল। তাদের চেষ্টার ফলে সাধারণ বেসামরিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় টিকিধারী হিন্দু দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। ধূর্ত হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদেরকে পরিপূর্ণরূপে

নির্মূল করার জন্য শিখ সম্প্রদায়কে হাতে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, এ পর্যায়ে তারা শিখ সম্প্রদায়ের সংগঠন আকালী দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশকে হাতে নিয়ে হিন্দুস্তানকে স্পেনে পরিণত করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। কিন্তু এ কাজ কোথা থেকে শুরু করা হবে, এক্ষেত্রে এটিই ছিল হিন্দুদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মুসলমানদের পরিপূর্ণ ধ্বংস করার জন্য বাবরী মসজিদকে নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্ভবত নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে-

১, বাবরী মসজিদ যেখানে নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে পূর্বে রাম মন্দির ছিল এ কথা ঘোষণা করলে সকল হিন্দু একটি প্লাটফর্মে একত্রিত হবে। কারণ, কোন হিন্দুই রামের নামে নির্মিত মন্দিরের বিরুদ্ধাচারণ করবে না।

২, দীর্ঘদিন যাবত বাবরী মসজিদ বিরান পড়েছিল। কাজেই এ মসজিদ ধ্বংস করার পর বিশেষভাবে হিন্দুস্তানের এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার অবস্থা দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা হবে।

৩, উত্তর প্রদেশে (ইউপি) মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ কোটির ঊর্ধ্বে এবং সাধারণত মুসলমান নেতৃবৃন্দও ইউপিতে জন্ম নিয়ে থাকে। কাজেই তাদের এলাকায় সংঘটিত ধ্বংসলীলা তাদের অবস্থানকে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলবে।

৪. সে সময় ইউ.পিতে রাজ্য সরকার ছিল বিজেপির, বিধায় এত বড় জঘন্য ধ্বংসলীলা তাদের জন্য সহজ ছিল এবং রাম মন্দির নির্মাণের দোহাই বিজেপিকে প্রাদেশিক ক্ষমতা থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

সম্ভবত উপরোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতেই এই জঘন্য ধ্বংসলীলা সংঘটিত করার জন্য বাবরী মসজিদকে নির্বাচন করা হয়। বাহ্যিকভাবে তো মনে হয় যে, হিন্দু সম্প্রদায় অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই ১৯৯২ইং এর ৬ই ডিসেম্বরকে এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে। কিন্তু বাস্তবে নির্বোধ মুশরিক সম্প্রদায় তারিখ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মারাত্মক ভুল করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা এ বিষয়টিকেও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বাবরী মসজিদের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও হিন্দুদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ৬ই ডিসেম্বরের (১৯৯২) ঐ দুঃখজনক ঘটনার সাথে আমার গ্রেফতার হওয়ার ঘটনার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

দুটি ভারাক্রান্ত হৃদয় সে সময়টিতে আমি আফগানিস্তানের জিহাদে ব্যস্ত ছিলাম। কাশ্মীরের জিহাদী আন্দোলনেও আমার সামান্য অংশ ছিল। জিহাদের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ ও শহরে সফর ও বক্তৃতাও চালু ছিল। জিহাদের শিরোনামে অল্পবিস্তর লেখালেখিও চলছিল। সংগঠনের ‘দাওয়াত ও ইরশাদ’ তথা প্রচার বিভাগ এবং মাসিক ‘সদায়ে মুজাহিদ’ এর সম্পাদনাও আমার দায়িত্বে ছিল। সাথে সাথে আমার আল্লামা বিন্নুরী টাউনে ‘জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়ায়’ পাঠদানের সৌভাগ্যও হয়েছিল। এমন সময় বাবরী মসজিদের শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। বস্তুত এতে আমি সীমাহীন ব্যথিত হই। বেদনাপূর্ণ এই দুর্ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে আমি আমার সম্পাদিত পত্রিকায় ‘আহ! বাবরী মসজিদ’ শিরোনামে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বেদনাপূর্ণ এই প্রবন্ধ দ্বারা আমি বাবরী মসজিদের চতুর্পাশ্বে প্রজ্জ্বলিত লেলিহান অগ্নিশিখা নির্বাপিত করার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম। আমি জানি প্রবন্ধটি পাঠ করে অনেক মুসলমানই আবেগাতিশয্যে অশ্রু বিসর্জন করে। অনেকের হৃদয়ে কিছু একটা করার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু কেন্দ্র, উপকরণ এবং জিহাদের ব্যাপারে ব্যাপক সমর্থনের অভাবে কিছুই হতে পারেনি। ফলে সোয়া শ’ কোটি মুসলমানের সম্মুখে বাবরী

মসজিদকে ধ্বংস করা হয়। সেদিন থেকে আমি বাবরী মসজিদের বেদনার অংশীদার হই এবং বাবরী মসজিদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করতে থাকি। বাবরী মসজিদের বিষয়ে পরপর তিনটি বক্তৃতা দান করি। আল্লাহ তা’আলা সেই সকল বক্তৃতা দেখতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্ণকুহরে ও হৃদয়ের মর্মমূলে পৌঁছে দেন। নিঃষ্পাপ শিশুরা সেই বক্তৃতা মুখস্ত করে। আর বড়রা তার ক্যাসেট বিতরণ করে। জানিনা কোন বাতাসের কাঁধে ভর করে এসব বক্তৃতা সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে। সম্ভবত বাবরী মসজিদের নির্যাতিত হওয়ার তীব্রতারই ফলে এর আলোচনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অন্যথায় আমি অগ্নিঝরা কোন ভাষণদাতা কিংবা কোকিলকণ্ঠী কোন বক্তা নই। এসব ক্যাসেট বিতরণের পিছনে আমার কোন প্রচেষ্টাও ছিল না। শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে এবং জিহাদের বরকতে ক্যাসেট সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং নানাজনের অন্তরে নানারকম প্রভাব সৃষ্টি করে।

ভারতের মুসলমানদের নিকট ইউরোপ, আমেরিকা ও কতক আরব দেশের মধ্যস্থতায় ক্যাসেট পৌঁছলে সেখানে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। তরুণেরা আবেগাতিশায্যে আত্মহারা হয়ে যায়, বড়রা নিজ হাতে ক্যাসোট বিলি করতে থাকে। মূলতঃ বাবরী মসজিদের শাহাদাতের ক্ষত ভারতের মুসলমানদেরই ক্ষত ছিল এবং বাবরী মসজিদের শাহাদাত তাদেরকেই পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত

করার সূচনা ছিল। ফলে বক্তৃতার সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া ভারতের মুসলমানগণ গ্রহণ করেন। তার এ কথায় সান্ত্বনা লাভ করেন যে, তাদের দেশের সীমান্তের ওপারেও তাদের ব্যথায় ব্যথিত মানুষ রয়েছে। তারা আরও সান্ত্বনা লাভ করে যে, তারা নিঃসঙ্গ নয়, কিন্তু সকলেরই প্রশ্ন হলে – ‘কার এ বক্তৃতা’ । কোন কোন ক্যাসেটের কভারে বক্তার নাম লেখা ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই সে নাম অচেনা ছিল। দরিদ্র মুসলমানেরা বক্তৃতা শুনে, বক্তার নাম পাঠ করে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে বেসে পড়ে। তবে কিছু কিছু প্রভাবশালী মুসলমান এই বক্তাকে খুঁজে বের করার সংকল্প করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন আলেম আর কেউ কেউ ছিলেন রাজনীতিবিদ। তারা চিন্তা করেন যে, যিনি বাবরী মসজিদের বেদনাকে মুসলমানদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তাঁকে খুঁজে বের করে তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করব, হয়ত তাঁর নিকট হিন্দুস্থানের মুসলমানদের সমস্যাবলীর কোন সমাধান পাওয়া যাবে।

একদিকে কিছু মুসলমান এই বক্তার সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন আর অপরদিকে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শে লিপ্ত ছিলাম যে, ভারতের অন্যান্য মসজিদকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়, বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করা

যায় এবং কট্টরপন্থী হিন্দুদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্র থেকে মুসলমানদেরকে কিভাবে বাঁচানো যায়। আমাদের নিকট আল্লাহর উপর ভরসা ও দৃঢ় সংকল্প ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল ছিলাম। পক্ষান্তরে আমাদের সম্মুখে ছিল শক্তিশালী, গোয়ার ও দাম্ভিক এক দুশমন। আর আমরা ছিলাম দুর্বল ও অক্ষম। কিন্তু জিহাদ ও তার ফলাফল সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ আমাদেরকে আশার বাণী শুনাচ্ছিল। সুতরাং আমরা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করি যে, বাবরী মসজিদকে বিধ্বস্ত করে লাল কৃষ্ণ আদভানী ও বাল থেকারে মুসলমানদেরকে যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, নিঃসম্বল হওয়া সত্ত্বেও আমরা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব।

কিভাবে এবং কোথেকে কাজ শুরু করা হবে এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছিল। এমন সময় বহির্দেশের এক সফরকালে ফজর নামাযের জামাআতে আমার বামদিকে জনৈক ব্যক্তি এসে দাঁড়ায়। ইকামত বলা হচ্ছিল বিধায় আলাপ ও পরিচয় হতে পারেনি। নামাযান্তে উভয়ে নিজ নিজ অযীফা পাঠে লিপ্ত হই। আমি ঘুনাক্ষরেও ধারণা করিনি যে, আমার প্রতীক্ষায় তিনি আমার সঙ্গে বসে আছেন এবং হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে তাশরীফ এনেছেন। আমি নিয়মমাফিক অযীফা শেষ করে

দাঁড়িয়ে গেলে সেও দাঁড়িয়ে যায় এবং চরম উষ্ণতায় আমার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। আমার পরিচিত একজন লোক তার পরিচয় দিয়ে বলে যে, ইনি অমুক দেশ থেকে এসেছেন। আপনার সঙ্গে নির্জনে কিছু কথা বলতে চান। সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হলো।

ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে আমরা উভয়ে মুখোমুখী উপবেশন করি। কথোপকথনের সূচনাতেই বিদেশী সেই লোকটির চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু উছলে পড়ে। তিনি বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে বলেন, যুবকেরা অস্থির, বড়রা কেঁদে মরছে। সকল মুসলমানের উপর এক বিস্ময়কর অবস্থা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি কিছু একটা করুন। আপনি পথ বলে দিন, পথিক অনেক রয়েছে। তিনি আবেগ ও আত্মহারাবস্থায় সতর্কতার সকল ধাপ ডিঙ্গিয়ে অনেক কিছুই বলে ফেললেন। কথার মাঝে তার সমমনা কয়েক ব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এমন স্পর্শকাতর ও বিপদসংকুল বিষয় নিয়ে প্রথম আলাপকালেই উভয়ে উভয়ের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন ও নির্ভর করতে শুরু করি। অথচ এ ধরনের কাজে ফুঁ দিয়ে দিয়ে পা ফেলতে হয়। মাসের পর মাস যাচাই বাছাই করে আস্থা পোষণ করা হয়। কিন্তু কিছু অবস্থা ও কিছু কিছু ব্যক্তি থাকে সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে। এ সাক্ষাতেও এমনই হল। বেদনা

ভারাক্রান্ত দুই হৃদয় পরস্পর মিলিত হল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন কাজ শুরু করতে হবে এবং পবিত্র রমযান মাসে মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পবিত্র জিহাদী পরিবেশে কাজের বরকতময় সূচনা করা হবে। সাক্ষাৎ শেষ হলো আর আমার সফরের পর সফর চলতে থাকল। কিন্তু অন্তর ছিল অস্থির, কখন পবিত্র রমযানের আগমন হবে! আর মসজিদে নববীতে বসে পাগলদের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হবে।

জেদ্দা বিমান বন্দরে
আমি পাকিস্তান থেকে বহু দূরে আফ্রিকার একটি দেশে বন্ধুদের সঙ্গে অবস্থান করছিলাম। পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। এই মাসেরই ২৩তম রাত্রে পবিত্র মদীনায় রিয়াযুল জান্নাতে আমাদেরকে একত্র হতে হবে। রমযানের মধ্যভাগ অতিবাহিত হওয়ার পর আমি আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে সৌদী দূতাবাসের শরণাপন্ন হই। সৌদী-দূতের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সুবাদে আমার বন্ধুটি মাত্র এক ঘন্টায় ওমরার ভিসা নিতে সক্ষম হয়। তা নাহলে পাকিস্তানী পাসপোর্ট দিয়ে সৌদী প্রশাসনের এমন সুদৃষ্টি লাভ করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। পাকিস্তান থেকে ওমরার ভিসা লাভ করতে কখনই তেমন জটিলতা হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু অন্যান্য দেশের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, পাকিস্তানী পাসপোর্ট দেখতেই সৌদী দূতাবাস ভালবাসা ও হৃদ্যতার সকল দরজা বন্ধ করে দেয়। ওমরার ভিসার জন্য তারা এত অধিক কাঁদায় যে, উটের সফরই অধিক সহজ মনে হতে থাকে। তখন সৌদীর তেল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গলায় চালিত তরবারীরূপে আমাদের চোখে দেখা দেয়। এজন্য পাকিস্তানীরাও কিছুটা দায়ী, কারণ, তারা কয়েকটি রিয়ালের লালসায় সৌদীতে বাসস্থান গড়ে বসে এবং তারা এজন্য কিছু অশোভন আচরণও করে থাকে। তবে একথাও সত্য যে, তেল সম্পদ অনেক আরবের থেকে মনুষ্যত্ব ও ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে এবং যেসব নৈতিকতার কারণে তারা শেষ নবী ও মক্কা- মদীনার খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করে, তা থেকে তারা শূন্য হতে চলেছে। যা হোক, এবার আমি খুব সহজে ভিসা পেয়ে যাই। আর এজন্য আল্লাহর অনেক শোকর আদায় করি।

২৩ তারিখ অত্যাসন্ন ছিল। সম্মেলনের কোন কোন সাথী ইতিমধ্যে জেদ্দায় পৌছেছেন বলে, আমি অবহিত হই। আমিও পথসম্বল বেঁধে রওয়ানা হই। সফরটি ছিল দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর। এক বিমান থেকে আরেক বিমানে যেতে হচ্ছিল। পথিমধ্যে এমন পংকিল বিমানবন্দরসমূহে প্রতীক্ষার মুহূর্ত অতিবাহিত হচ্ছিল, যেখানে মানবতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। সৌভাগ্যক্রমে

কিছু উত্তম সফরসঙ্গী পেয়ে যাই। তাদেরও গন্তব্য ছিল মক্কা মুকাররমা। তাদের সাহচর্যে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর এই সফর ভালভাবেই অতিবাহিত হয়। আমার সঙ্গে কুরআন শরীফও ছিল, পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত সফরকে মধুময় করে দেয়। তাছাড়া মক্কা মদীনা জিয়ারতের জন্য মনের অস্থিরতা এবং মহতী কাজের পরামর্শে অংশগ্রহণের উন্মাদনাও সফরকে সহজ করে দেয়। অবশেষে ৩৬ ঘন্টা সফর করার পর আমরা জেদ্দায় পৌছি। এখানে ইমিগ্রেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রীরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাহরীর সময় শেষ হতে চলছিল। সাথে যা ছিল তা দিয়ে সাহরী সেরে ইমিগ্রেশনের সারিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। স্বভাবমাফিক সৌদী কর্মকর্তাদের মেজায উত্তপ্ত ছিল। পাকিস্তান থেকে আগত বিমানের যাত্রীদেরকে জুলাবের বড়ি খাওয়ানো হচ্ছিল এবং বাথরুমে গিয়ে দেখা হচ্ছিল কে নেশা (হিরোইন, চরস ইত্যাদি) জাতীয় জিনিস পেটে ভরে নিয়ে এসেছে। ইহরামের শুভ্র চাদর পরিহিত পবিত্র মক্কা মদীনা যিয়ারতকারীদের মুখমণ্ডল থেকে অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধের লক্ষণ উদ্ভাসিত হচ্ছিল। কিন্তু তাদের কিছুই করার ছিল না। কষ্ট করে সবকিছুই সহ্য করছিল।

আমরা অন্য একটি দেশের বিমানে এসেছিলাম বলে জুলাবের বড়ি খাওয়ার অসহ্য অত্যাচার

থেকে বেঁচে যাই। ইমিগ্রেশনের কাজ তার ঐতিহ্যবাহী মন্থরতার সাথে চলছিল। সৌদী কর্মচারীদের কোন অনুভূতিই ছিল না যে, তারা পবিত্র মক্কা মদীনায় জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের মেজবান। আল্লাহ পাক তাদেরকে মুসলমানদের নেতৃত্বদানের জন্য এবং ইসলামের কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আদিষ্ট করেছেন। সিগারেটের লম্বা টান, কয়েক মিনিট পরপর সুগন্ধ কফির চুমুক, প্রতি আধা ঘন্টা পর বিনা কারণে আসন ছেড়ে চলে যাওয়া এবং কোন কোন সময় দীর্ঘক্ষণ পারস্পরিক আলাপচারিতা; এসব হচ্ছিল খুব মনোযোগ সহকারে। আর নিতান্ত বিরাগভাব ও শিথিলতার সঙ্গে পাসপোর্টও পার করা হচ্ছিল। তাদের এ কাজ ইতিপূর্বেও আমি অনেকবার দেখেছি। আজ পূনরায় এসব দেখে অন্তর ছটফট করছিল। বৃদ্ধ জিয়ারতকারীরা ক্লান্ত হয়ে সারির মাঝে বসে পড়েছে। মহিলারা চরম পেরেশান। অসুস্থদের অবস্থা দেখার কেউ নেই। উপরন্তু কারো নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগও করা যায় না।

আমার বুঝে আসে না আমাদের এসব আরব ভাইদের কি হলো। এরা তো সেই জাতি, যারা কায়সার ও কিসরার মুকুট ও সিংহাসন উৎপাটন করেছিল। আজ তারা প্রবৃত্তি পূজা, সম্পদের মোহ ও অলসতার যুপকাষ্ঠের বলি হচ্ছে এবং তারা দাসত্বের সেই গর্তে নিপতিত হচ্ছে, যার কল্পনাও আত্মাকে বিমর্ষ করে। এক সময় এই

আরবরাই সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সবক দিয়েছিল। অথচ, আজ গরীব মুসলিম দেশসমূহের অধিবাসী এবং তাদের পাসপোর্টসমূহ দেখে তাদের ঘৃণা ঝরে পড়ছে। আর কাফেরদের গণ্ডদেশ দিয়ে তাদের সম্পদ পানির মত প্রবাহিত হচ্ছে। আরবেরা চাইলে তেল সম্পদকে ব্যবহার করে সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানদেরকে মুক্ত করতে পারত এবং ইসলামের হৃত মর্যাদাকে বহাল করতে পারত। কিন্তু তারা নিজেরাই তো তেলের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে দাসত্বের পঙ্কিলতায় ফেঁসে গিয়েছে, এখন তাদের থেকে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ধর্ম সবকিছুই ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এমন এক সময় ছিল (এবং পূনরায় সে সময় আসবে ইনশাআল্লাহ), যখন মানুষ ঈমান বাঁচানোর জন্য হারামাইনের দিকে দৌড়ে আসত। কিন্তু বর্তমানে হারামাইনের অধিবাসীদেরকে স্বীয় ঈমান রক্ষার্থে আফগানিস্তানের পর্বত ও পাথুরে ভূমিতে আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

এমন এক সময় ছিল, যখন আরবরা শুকনো রুটি খেয়ে সমগ্র পৃথিবী শাসন করত। কিন্তু বর্তমানে তারা স্বর্ণ রৌপ্যের মধ্যে ডুবে থেকেও পরের শাসনাধীন। তারা আজ স্বদেশেও পরদেশী ও দাস হতে চলেছে। আল্লাহ তাআলা আরবদের উপর এবং সমস্ত মুসলমানদের উপর রহম করুন। এখন তো কিছু কিছু আরব কলামিষ্ট ইসলামকে এক দিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের

আরবীয় হওয়ার উপর গর্ব করছে। জনৈক ব্যক্তি এমন লোকদেরকে বড় উত্তম জবাব দিয়েছেন।

“হে আরব মুসলমানগণ! তোমাদের মর্যাদা ও গর্বের কারণ, তোমাদের আরব হওয়া নয়;তোমরা আজ যা কিছু পেয়েছ তা সবই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসীলায় পেয়েছ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাদের ইতিহাস থেকে সরিয়ে রেখে তাকিয়ে দেখ তোমরা কে? আদ ও সামুদের কাফের, যাদের অস্তিত্বও এই পৃথিবী বরদাশত করেনি। লুত (আঃ)এর কওমের পাপীরা, যাদের উপর আসমান পাথর বর্ষণ করেছে। আবূ জাহল ও আবূ লাহাবের মত অজ্ঞতা ও জুলুমের মূর্তিমান মানুষ, যাদের কারণে মানবতার মস্তিস্ক লজ্জায় নেতিয়ে পড়েছে এবং মূর্তির সম্মুখে উলঙ্গ অবস্থায় মস্তকাবনতকারী পশুসদৃশ সেসব মানুষ, যাদের জীবন তাদের উদর ও লজ্জাস্থান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল—এরাই তো ছিল তোমাদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু তোমাদের মাঝে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং তার উপর কুরআন নাযেল হল, আর তখন, আরবদের ভাগ্য তারকা উদ্ভাসিত হল। আরবরা সম্মান ও মর্যাদা ইসলাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদৌলতেই লাভ করেছে।”

বিধায় যতক্ষণ তারা ইসলাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত থাকবে, ততক্ষণ মর্যাদা ও মহত্ব তাদের পদচুম্বন করবে। কিন্তু যখন তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন ও আদর্শকে পরিত্যাগ করবে, তখন তারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বোঝায় পরিণত হবে। তাদের এ বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে যে, তারা আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? দুনিয়ার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যতা আল্লাহর দরবারে কোনই মূল্য রাখে না। পায়খানার এই স্তুপ কারো নিকট কম থাক বা বেশী থাক এতে কিছুই আসে যায় না।

বাদশাহ ফয়সাল মরহুম বলতেন, “এই তেলের কারণে যদি আমাদের ইসলামী মর্যাদা ও গায়রতের উপর আঘাত আসে, তাহলে আমরা আমাদের প্রাসাদসমূহ ধ্বংস করে দিয়ে পূনরায় তাঁবুর মধ্যে চলে যাব এবং তরবারীর ছায়ার নিচে ইজ্জতের জীবন যাপন করব।”

বাদশাহ ফয়সালের এই চিন্তাধারা তার স্থলাভিষিক্তদের মধ্যেও যদি স্থানান্তরিত হত! তারা নিজেদের দ্বীন ও জাতিকে এই পরিমাণ সস্তায় বিক্রিযোগ্য না করত,যেই পরিমাণ সস্তায় আজ বিক্রি হচ্ছে। আর ইহুদীরা মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে মুসলমানদের দেখে হাসছে। আমি যখনই সৌদী আরব যাই, সেখানকার বিমানবন্দর থেকেই এসব

চিন্তা আমার মস্তিষ্ককে কুরে কুরে খেতে থাকে। সৌদী কর্মকর্তাদের ঘৃণাভরা দৃষ্টির কারণে আমার ক্রোধের পরিবর্তে দয়ার উদ্রেক হয়। কারণ, সম্পদের যে ঐশ্বর্যের কারণে তারা এসব করছে, সেই সম্পদ তো তাদের কাল হতে চলেছে। তাদের নতুন প্রজন্ম থেকে ইসলাম ও আরবীয় ঐতিহ্য লোপ পেতে চলেছে। দুনিয়ার বড় বড় কাফেররা আরব শাহজাদাদেরকে তাদের বোঝা বহনকারী পশু মনে করে থাকে। এমন পশু, যা তাদের সকল অভিমান ও ঔদ্ধত্যকে বহন করে। তাদের প্রতিটি আদেশে ‘লাব্বাইক’ বলে সাড়া দেয়। তাদের কথায় স্বধর্ম ও স্বজাতির সাথেও গাদ্দারী করে। হায়! আরবরাও যদি তাদের মধ্য থেকে এমন একজন মোল্লা ওমর পেত! যে এই জাতিকে গায়রত, ইজ্জত ও আত্মনির্ভরতার বিস্মৃত সবক স্মরণ করাতে পারত এবং দোস্ত ও দুশমনের পার্থক্য তুলে ধরতে পারত।

কয়েক ঘন্টা প্রতীক্ষার পর ইমিগ্রেশনের ধাপ শেষ হলে সামানপত্রের চেকিং এর পালা শুরু হয়। পবিত্র মক্কা মদীনার নিরাপত্তা বহাল রাখার জন্য এ ব্যাপারে যত কঠোরতাই করা হোক তা কমই, কিন্তু তাদের কথাবার্তার ধরন ও আচরণ যদি মেজবানের ন্যায় হত এবং নিজেদেরকে মক্কা মদীনার খাদেম মনে করত তাহলে অনেক মুসলমানই স্বস্তি পেত এবং অনেক বদদ্বীন দ্বীনদার হত। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ শাসক ও বিরুদ্ধবাদীর ন্যায়ই

আচরণ হয়ে থাকে। আমার নিকট মুজাহিদদের কিছু ডলার ছিল। আমি মালপত্র চেককারীকে জলদি করার জন্য আবেদন জানালে তা তার স্বভাব বিরুদ্ধ হয়। সে আমার মালপত্র থেকে ডলারের তোড়া বের করে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চেক করতে আরম্ভ করে। তারপর এ বিষয়ে দক্ষ আরেকজনকে ডেকে আনে। সেই দক্ষ লোকটি ডলারগুলো উলট পালট করে দেখে খুব আনন্দ ভরে চিৎকার করে ওঠে, “হে খালেদ! মাবরোক হোক, এর মধ্যে অনেকগুলো জাল ডলার রয়েছে।”

খালেদ সাহেব আমার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। একথা শুনেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। প্রায় চল্লিশটি নোটকে জাল সাব্যস্ত করা হয়। আর আমাকে অপরাধীর মত অন্যান্য যাত্রী থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়। কয়েকজন কর্মকর্তা একত্রিত হয়ে আমাকে পূনরায় তল্লাশী করে। আমার জুতা কেটে ফেলে এবং আমাকে অপর একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সে কক্ষে ডলার চেক করার মেশিন ছিল। চল্লিশটি জাল নোটকে মেশিনে দেওয়া হলে মেশিন ১২টি বাদে অবশিষ্ট গুলোকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করে। এবার বারটি নোট এবং এর বাহক অপরাধীকে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে আসা হয়। এখানে অন্য একজন বিশেষজ্ঞ বারটি নোট মেশিনের সামনে তুলে ধরলে মেশিন চারটি নোটকে সন্দেহযুক্ত আর অবশিষ্ট আটটিকে খাঁটি আমেরিকান

সাব্যস্ত করে। এবার আমাকে বড় একটি কক্ষে প্রায় পনেরজন অফিসারের সম্মুখে পেশ করা হয়। তারা সকলে আমাকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল আর নানারকম প্রশ্ন করছিল। আমি তাদেরকে বললাম, ফজর নামায কাযা হচ্ছে, আমাকে নামায পড়তে দিন।

তারা অনুমতি দিল, আমি সেই কক্ষ থেকে বের হয়ে এক কোণায় নামায আদায় করি এবং আমার সমস্যা মহান মালিকের দরবারে পেশ করি। আমার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। আমি বারবার এ কথাই বলি—হে আল্লাহ! আমি তো তোমার ঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে, তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযায় হাজিরা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, জিহাদের ফরজ জিন্দা করার উদ্দেশ্যে এবং বাবরী মসজিদের হিসাব চুকানোর উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছি। কিন্তু আমার সঙ্গে এসব কি হচ্ছে?

দুআর পর অন্তরে শান্তি অনুভব করি। আমি পূনরায় বড় কক্ষটিতে প্রবেশ করে দেখি একজন লোক আমাকে থানা পুলিশের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। বড় অফিসারটি আমাকে লক্ষ্য করে বলল—চারটি ডলার সন্দেহযুক্ত রয়েছে। এজন্য থানায় যেতে হবে। আমি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে মুখ খুললাম। আমি চিৎকার করে আরব অফিসারদেরকে বললাম—এটিই কি আপনাদের মেহমানদারী? মুসলমানদের সঙ্গে আপনারা এমন আচরণই করে

থাকেন? এরপর আল্লাহ পাক আমার মুখ দিয়ে যা বের করলেন সব বলে মনের বোঝা হালকা করলাম। আমি তাদের সামনে জিহাদ সম্পর্কে বললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। অবিরাম ধারায় আমার কথা চলছিল। বেদনায় আমার আওয়াজ কাঁপছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, তাদের কারো কারো চোখ থেকে অশ্রু উছলে পড়ছে। বাস্তবে তো তারা মুসলমান, আরব শাহজাদা। এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। সুতরাং ইসলাম ও জিহাদের সুস্পষ্ট দাওয়াত তাদের অন্তরকে নাড়া দেয়। তাদের গায়রতকে জাগ্রত করে। আমি আমার কথা শেষ করে বললাম-“নিয়ে চলো আমাকে থানায়, আর খুব সওয়াব কামাও।”

এ কথা বলে আমি আমার চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে যাই, কিন্তু তারা সকলে বসে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন তাদের উপর নীরবতা চেপে বসেছে। কিছুক্ষণ পর তারা চেতনা ফিরে পায়। তখন বড় অফিসারটি স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠে “আমি তো তাকে থানায় পাঠাব না।” বাকীরা তার কথায় একমত হয়। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি অবিচল থাকে, যার কাছে আমি তাড়াতাড়ি করার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আবেদন করেছিলাম। কিন্তু সমস্ত অফিসারকে তার বিরুদ্ধে দেখে সেও নরম হয়ে যায়। তারপর একজন অফিসার আমার মালপত্র উঠিয়ে নেয়। আর একজন আমার আগে আগে দরজা পর্যন্ত আসে। দরজার নিকট এসে উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে

আমাকে বিদায় জানায়। তাদের একজন আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করে। আমি তৃপ্তির বাস গ্রহণ করে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীন ভবন থেকে বাইরে বের হয়ে আসি। আমাকে জানানো হয়েছিল যে, কয়েকজন লোক আমাকে নেওয়ার জন্য বিমানবন্দরে আসবে। আমি ডানে বামে তাদেরকে তালাশ করতে থাকি। সহসা সম্মুখে পার্কিং এরিয়ার দিকে আমার দৃষ্টি পড়লে আমি দেখতে পাই যে, যে ব্যক্তির সাথে একটি মসজিদে আমার মোলাকাত হয়েছিল, তিনি অস্থিরভাবে আমার অপেক্ষা করছেন। আমি অগ্রসর হয়ে তার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হই। তিনি আমার দেরীতে বের হওয়ায় চিন্তিত ছিলেন। আর আমি সত্ত্বর কাবায় পৌঁছার চিন্তায় বিভোর ছিলাম।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর রওযায়
অন্যান্য সাথীরা পূর্ব থেকেই জেদ্দাতে আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন। জেদ্দায় সংক্ষিপ্ত অবস্থানের পর আমাদের কাফেলা মক্কা মুকাররমা অভিমুখে রওয়ানা হয়। সকলের দেহ ইহরামের শুভ্র চাদরে আবৃত ছিল। আর মুখে ছিল ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ এর বিশ্বস্ততার ঘোষণা। হারামের সীমানা আরম্ভ হতেই মনের ভাব পরিবর্তন হতে থাকে। যখন সিত্তিন সড়কের প্রাচীন এলাকা শুরু হয়, তখন থেকে মক্কা মুকাররমায়

প্রবেশ করার অনুভূতি তীব্র হতে থাকে। আমার সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনই বিস্ময়কর ব্যবহার হয়ে থাকে যে, আমার যখনই মক্কা মুকাররমায় হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়, তখনই দু'আ করার লোভ বেড়ে যায়। তখন কোন দুআটি আগে করব, আর কোটি পরে করব তা ঠিক করাই জটিল হয়ে যায়।

এমন মনে হয় যে, দয়াময় আল্লাহ তার ঘরে হাজির হওয়ার তাওফীক দেওয়ার সাথে সাথে স্বীয় রহমতের সকল ভাণ্ডারও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আর তার ক্ষুদ্র এই মেহমানকে সেই ভাণ্ডার থেকে চেয়ে নেওয়ার অবাধ অধিকার দিয়েছেন। আমার মত অকর্মণ্য ও ক্ষুদ্র ইনসানকে তার ঘরে আহবান করাই মালিকের এত বড় দয়া যে, তাঁর শোকর আদায় করতে আমার ভাষা অপারগ। মুখে বিচিত্র ধরনের আরবী দুআসমূহ এবং উর্দু আবেদনসমূহ উচ্চারিত হতে থাকে। হৃদয়ে দ্বীনী ও ঈমানী বাসনার প্লাবন চলতে থাকে। নয়ন-মন বায়তুল্লাহর জিয়ারতের জন্য ব্যগ্র ও অধীর হতে থাকে।

তাছাড়া কাবার দুয়ারে আমাদের এই উপস্থিতি ছিল বিশেষ এক লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বিধায় দুআর মধ্যে সে বিষয়টি প্রবল ছিল। মসজিদে হারামে পৌছে অনতিবিলম্বে বায়তুল্লায় হাজির হওয়ার প্রোগ্রাম করা হয়। রমযানুল মুবারকের জনারণ্যে বিক্ষিপ্তভাবে পরস্পরের সাথে

সাক্ষাত করার ব্যবস্থাও ঠিক করা হয়। মানুষের জন্য যাবতীয় চিন্তামুক্ত হয়ে কাবার ছায়াতলে যাওয়াই মঙ্গলজনক। যেন কাবা শরীফের উপর পতিত প্রথম দৃষ্টির পুরো স্বাদ সে লুটে নিতে পারে। মনের বাসনা মালিকের দরবারে পেশ করতে পারে।

এখানে এসেও যদি মানুষ তার মালিকের দিকে নিবিষ্ট হৃদয়ে ধাবিত না হয়, তাহলে আর কোথায় হবে? এখানে এসেও যদি মালিকের সঙ্গে হৃদয় একাকার না হয়, তাহলে আর কোথায় হবে? এখানে এসেও যদি গোনাহের প্রতি অনিহা সৃষ্টি না হয়, তাহলে আর কোথায় হবে? এ অভিযোগ যথার্থ যে, কাবার মেজবানেরা তার আশেপাশের পরিবেশকে দুনিয়াদারী দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। এ কথাও ঠিক যে, দুনিয়ার প্রাচুর্য এবং কাবার আশেপাশের দোকানসমূহে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীসমূহ হারামের যেয়ারতকারীকে গাফেল করে দেওয়ার শক্তি রাখে। কিন্তু একথাও সত্য যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে জেনেছে এবং তার পরিচয় লাভ করেছে, তার চতুর্পারে এসব সামগ্রীর সাথে কিসের সম্পর্ক? আল্লাহ তাআলার প্রকৃত আশেকদেরকে জান্নাতের মহামূল্যবান নেয়ামতরাজিও হাকীকী মালিক থেকে গাফেল করতে পারবে না। দুনিয়ার তুচ্ছ ও নাপাক শোভা কি করে তাকে গাফেল করতে পারে? প্রকৃত ঈমানদারের নিকট

দুনিয়ার কোনই মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকে না। সে তো মালিকের চৌকাঠে মস্তক দানের জন্য এখানে আসে। সে তার অন্তরে শুধুমাত্র এ বাসনাই নিয়ে আসে যে, মালিক তার মস্তককে তাঁর পথে কবুল করুন। সে তো মালিকের চৌকাঠে স্বীয় মস্তক স্থাপনের বিনিময়ে মালিককে রাজি করতে আসে। সুতরাং সে ‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ বলে মালিকের সামনে নিজেকে পেশ করে। স্বীয় মস্তক নত করে মহান আল্লাহর নিকট থেকে তাকেই (আল্লাহকেই) যাঞ্চা করে। প্রেমের এই বাণিজ্যে এবং ভালোবাসার এই অপূর্ব আঙ্গিকে পার্থিব জগতের তুচ্ছ ও অভিশপ্ত সামগ্ৰীসমূহ কি করে অন্তরায় হতে পারে।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ পূনরায় মালিক করুণা করেছেন, তাঁর তুচ্ছ গোলামকে তাঁর ঘরে আসার তাওফীক দান করেছেন। আমি ও আমার সঙ্গীরা দুআর জন্য হাত উঠাই এবং কম্পিত হৃদয়ে দুআ করতে থাকি। একদিকে মাত্র কয়েকজন নিঃস্ব ব্যক্তি অপরদিকে সেই জম্মু থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঝঞ্চা বিক্ষুব্ধ শিরকের প্লাবন। তবে সহায়সম্বলহীন মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক আজ নিজেদের বিষয়টি সেই সত্তার সমীপে পেশ করছে, যাঁর অনন্ত শক্তি ও সাহায্যের সম্মুখে তরঙ্গায়িত সাগরও এক ফোটা পানির চেয়ে অধিক দুর্বল ও অসহায়। সেই রব ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্রতর নুড়ি ও মাকড়সার জালকেও বিরাট

শক্তি দান করেন আর ইচ্ছা করলে হস্তিবাহিনী ও মানব শক্তির স্তম্ভসমূহকেও তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত করে ছাড়েন। সকল সাথী মন খুলে মন ভরে দুআ করতে থাকি। তারপর তাওয়াফ, পুনঃ তাওয়াফ, জমজমের পানি পান, সাফা মারওয়ার সায়ী ও মাথা মোড়ানোর পালা আসে।

প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল অপূর্ব ভাবময়। অনেকবারই হারামাইনের কথা লেখার ইচ্ছা অন্তরে জেগেছে, কিন্তু মনও সাড়া দেয়নি এবং কলমও চলেনি। প্রতিবার এ কথাই ভেবেছি যে, ইনশাআল্লাহ, সামনের বার লিখব, কিন্তু কখনই তার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। আর এ কথাও সত্য যে, প্রেমের কথা লেখা সহজও নয় এবং সবার জন্য সম্ভবপরও নয়। ফলের মিষ্টতা ভক্ষণকারীই অনুধাবন করতে পারে, কিন্তু তার মিষ্টতার কথা শত সহস্রভাবে লেখা হলেও পাঠক তার প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারবে না। তবে এতে করেও সেই মিষ্টতা অর্জনের প্রেরণা জাগ্রত হতে থাকে। জিহাদের মিষ্টতার ব্যাপারেও সেই একইকথা। যতক্ষণ তার স্বাদ আস্বাদন না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার হাকীকত বুঝে আসতে পারে না।

জিহাদের বদৌলতে যে স্তরের ঈমান নসীব হয়, তা শুধুমাত্র রণাঙ্গনে বের হওয়ার পরই লাভ করা যায়। জিহাদের ময়দানের বাইরে বসে থেকে লক্ষবার চেষ্টা করলেও সেই ঈমানের মধুরতা পাওয়া সম্ভব নয়।

শাহাদতের ক্ষেত্রেও ঠিক একই অবস্থা। তার প্রকৃত স্বরূপ তা লাভ করার পরই অনুধাবন করা যায়। আর তাই তো শহীদ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে যে, শহীদ জান্নাতের যাবতীয় নি'আমত পাওয়ার পরও শাহাদতের স্বাদ বিস্মৃত হতে পারবে না। তখনও সে এর বাসনা করতে থাকবে। আজ কত মানুষ দুনিয়ার সামান্য শান্তি আর তুচ্ছ সরঞ্জামের জন্য শাহাদতের পথ পরিহার করে থাকে। অথচ তুচ্ছ এই দুনিয়া তো দূরের কথা জান্নাতের নিআমতরাজিও শাহাদতের স্বাদ ভোলাতে পারবে না। কিন্তু এই পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় এই নি'আমতের আসল হাকীকত জানা সম্ভব নয়। যা কিছু জানা যায় তাতো শুধুমাত্র আকাংখা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

তাই হাদীসে এসেছে যে, শহীদ এই আকাংখাও করে যে, হে আল্লাহ! আমাকে পুনর্বার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও, যাতে করে আমি শাহাদতের হাকীকত আমার সাথীদের বুঝিয়ে আসতে পারি। অথচ শহীদ নিজেও জানে যে, আমার সাথীরা শাহাদত সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। কিন্তু সে বোঝে যে, তারা যত কিছুই জানুক না কেন, তা শাহাদতের হাকীকত বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। আর তাই সে নিজে এসে তা বোঝাতে চায়। সত্যিই নিজের প্রিয় মালিকের জন্য প্রাণ দেওয়া আর মালিক তা কবুল করা চাট্টিখানি কথা নয়। এই নি'আমত লাভ করতে পারলেই এর প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করা সম্ভব।

যাই হোক, আমি বলছিলাম যে, হারামাইন শরীফাইনের বিবরণ লেখার ইচ্ছা ও বাসনা থাকা সত্ত্বেও তা পুরা হয়নি। আজকের বৈঠকে যে কয়টি কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হল, তাও জিহাদের আলোচনার বরকতে হয়েছে। এবার এসব কথার এখানেই ইতি টেনে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছি। ওমরাহ আদায় করার পর আমাদের কাফেলা মদীনা মুনাওয়ারার দিকে যাত্রা করে। হৃদয়ে আনন্দ ও পুলকের উচ্ছলতা ও লজ্জামিশ্রিত ভাব আচ্ছন্ন হয়েছিল। এবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শহরে কোন কোন রহমত লাভ হবে তারই প্রতীক্ষায় ছিলাম। ইতিপূর্বে যখনই সেখানে হাজির হয়েছি, তখনই তাঁর অপূর্ব আতিথেয়তা ঈমান বৃদ্ধি করেছে। এখানে দুআ করার চেয়েও দুরূদ শরীফ পাঠ করায় অধিক স্বাদ উপভোগ হয়।

পবিত্র কুরআনে পবিত্র মদীনার যেসব জায়গার আলোচনা বারবার এসেছে, সেসব জায়গায় মানুষ আত্মহারা হয়ে যায়। বিশেষ করে উহুদের শহীদদের মাযারের পাশে বসলে আর উঠতে মন চায় না। মসজিদে নববীর বামদিকের পবিত্র রওজা ও রিয়াযুল জান্নাহর মধ্যবর্তী স্থানটিকে অপূর্ব শান্তি ও নিরাপত্তার খনি বলে অনুভূত হয়। সত্যিই মসজিদে নববীর প্রতিটি দ্বার ও কোণ এবং মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিটি পাথর থেকে

জিহাদ ও শাহাদতের স্মৃতি জেগে ওঠে মনকে অস্থির করে। পবিত্র এই শহরের প্রতিটি কণা মানুষকে জিহাদের হাকীকত বুঝিয়ে দেয়। একথা সত্য যে, মানুষ পৃথিবীর যেখানেই থাক না কেন, তার অন্তরে মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির হওয়ার বাসনা চেপে বসে থাকে। কিন্তু মদীনার মাটিতে আসার পর মানুষের উপর জিহাদের ময়দানে পাগলপারা হয়ে ঝাপিয়ে পড়ার উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। মদীনা মুনাওয়ারার আদ্যোপান্ত জিহাদের দাওয়াত আমি এই আলোচনায় হারিয়ে গেলে পাঠকদেরকে আমার বন্দী কাহিনী পাঠ করার জন্যে নিশ্চয়ই আরো অনেক মাস অপেক্ষা করতে হবে। বিধায় ওয়াদা মোতাবেক আমি বন্দী জীবনের আলেখ্য শোনানোর জন্য অন্য কথায় খুব বেশী জড়াচ্ছি না। অথচ এমন অনেক জায়গা আসে যেখানে হৃদয়ের সুর বেজে ওঠে। কলম সেই বিষয়ের দিকে ঘুরে যায়। কিন্তু আমি সত্বরই আমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে মূল বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করছি।

রমাযানুল মুবারকের ২৩ তারিখ। রমযানের শেষ দশকে মসজিদে নববীর শোভা বৃদ্ধি পায়। সেখানে তারাবীহ ছাড়া কিয়ামুল লাইলের (তাহাজ্জুদ) নামাযও জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। অন্য সময় মসজিদে নববী ইশার নামাযের কিছু সময় পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। রমাযানুল মুবারকে তা ২৪ ঘন্টা

উন্মুক্ত থাকে। তৌহিদ মদিরায় উন্মত্ত নবীপ্রেমিকগণ সেখান থেকে মন খুলে ফয়েয লাভ করেন। তারাবীহ নামাযান্তে আমরা আমাদের আবাসস্থলে ফিরে আসি। রাতের খাবার খেয়ে সকল সাথী পূনরায় মসজিদে নববীতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেই। উযু ইত্যাদি সেরে সকলেই মসজিদে নববীতে গমন করি। ঘটনাক্রমে রিয়াযুল জান্নাতে জায়গাও পেয়ে যাই। সফর চলাকালে আমাদের নিজেদের মধ্যে বিস্তারিতভাবে অনেক কিছুই চূড়ান্ত হয়েছিল। অনেক বিষয়ে বিশদভাবে মত বিনিময়ও হয়েছিল। বাকী ছিল শুধু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আর রাসূলে কারীম ইমামুল মুজাহিদীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সান্নিধ্যে আল্লাহ তাআলার দরবারে নুসরাত ও তাওফীকের জন্য দুআ করা।

রিয়াযুল জান্নাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত রিয়াযুল জান্নাহ। মুসলমানদের জন্য এক আবেগময় ও আধ্যাত্মিক পবিত্র স্থান। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মিম্বার ও হুজরার (যেখানে তিনি আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) সহ অবস্থান করতেন, এই পবিত্র স্থানটি এখন তাঁর রওযা) মাঝামাঝি জায়গাকে জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা আখ্যা দিয়েছেন। বাস্তবিকই

স্থানটি সন্দেহাতীতভাবে রিয়াযুল জান্নাহ। যে-ই জান্নাত সন্ধান করবে, তাকেই হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মিম্বার থেকে তাঁর পবিত্র কবরের মধ্যবর্তী দূরত্বকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে এবং মানতে হবে। এই মিম্বরে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য আমাদেরকে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জাত পর্যন্ত পৌছে দেয়। আর তাঁর পবিত্র সত্তা আমাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেয় এবং এক আল্লাহর সামনে মস্তকাবনত করে যাবতীয় বস্তুর সামনে মস্তকাবনত করা থেকে রক্ষা করে।

কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্ক আমাদেরকে সেই মিম্বার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যেই মিম্বার হতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে পাওয়া চির সত্য কথা বয়ান করা হত। আর ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সেই সত্যবাণীসমূহ আমাদেরকে মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেয় এবং তাঁকে পাওয়ার সকল পথ বাতলে দেয়। আজ এই নিশিতে দুর্বল কয়েকজন মানুষ পবিত্র সেই মিম্বার ও পবিত্র রওযার মধ্যবর্তী স্থানে গোল হয়ে বসেছে। তাদের মানস চক্ষের সম্মুখে কাশ্মীরের সেই অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে

জ্বলছিল, যার মধ্যে রসূলের উম্মত ভস্মিভূত হচ্ছে। তাদের দৃষ্টির সমুখে বাবরী মসজিদের সেই বিধ্বস্ত ইমারত ভাসছিল, যার থেকে রক্তাশ্রু ঝরছে। তাদের সম্মুখে ত্রিশূলধারী হিন্দুদের আস্ফালনকারী সেই দল বিরাজ করছিল, যারা ভারতের নদীনালাকে মুসলমানদের খুনে রঙ্গীন করছে। তাদের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল ভারতের বিশ কোটি মুসলমানের ভবিষ্যত, যাদের উপর স্পেনের মতো ঘাতক পরিকল্পনার রক্তপিপাসু ছুরি চিকচিক করছিল। রিয়াযুল জান্নায় বসে চারজন লোক এ সকল চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বপ্রকার দ্বিধা-সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে। কারণ, তাদের সকলের ভরসা ছিল মহান আল্লাহর উপর। তারা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদচিহ্ন ধরে মুশরিকদের সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ছিল। এ চার ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)এর যুগের চিন্তান্বিত পিপীলিকার ন্যায় স্বজাতিকে রক্ষা করার ও জাগিয়ে তোলার জন্য ডাক দেব। আবাবিলের মত সামর্থ্য মোতাবেক মুশরিকদের উপর আঘাত করব এবং নমরুদাগ্নি নির্বাপিত করার জন্য সাহস ও শক্তি মত পানি ছিটাব। আর কাজের ফলাফল সেই জাতের উপর ন্যস্ত করব, যিনি চিন্তান্বিত পিপীলিকার আওয়াজকে পবিত্র

কুরআনের আয়াত বানিয়েছেন। আবাবিলের পাথরকে ধ্বংসাত্মক শক্তি দিয়েছেন।

কিন্তু এই কাজের নেতৃত্বদানের গুরুদায়িত্ব কার কাঁধে ন্যস্ত করা যায়? তিনজনের দৃষ্টিই আমার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। আর আমি আমার দুর্বলতা ও অযোগ্যতা চাপে লজ্জাবনত হচ্ছিলাম। দীর্ঘ বিতর্কের পর আমি না চাওয়া সত্ত্বেও এবং অস্বীকার করার পরও এই মহান কাজের নেতৃত্বের ভার আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিছু কিছু দায়িত্ব অবশিষ্ট তিনজনের মধ্য থেকে দুই জনের উপর দেওয়া হয়। এখন প্রায় সবকিছুই চূড়ান্ত। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মালিকের দরবারে সিজদাবনত হই। তাঁর রহমত ও নুসরাত ভিক্ষা চাওয়ার জন্য হাত ও আঁচল প্রসারিত করি। দীর্ঘক্ষণ দুআ চলতে থাকে। তারপর আমাদের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি সেই রাতেই এবং পরদিন সকালে ছোট একটি পুস্তিকা লিখি। পুস্তিকাটি লেখকের নাম ছাড়াই কয়েক ভাষায় ছাপানোর জন্য কয়েক জায়গায় পাঠিয়ে দেই। এভাবেই সেই মহান কাজের সূচনা হয়, যার চূড়ান্ত ফলাফল আজও প্রকাশ পায়নি। এই কাজের কিছু বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্য আমাকে কিছু সময়ের জন্য এই দাস্তান বন্ধ করতে হবে। পাঠক! এবার আমি একটি প্রবন্ধ তুলে ধরছি, যেটি আমি বন্দী হওয়ার প্রায় দুই বছর পর দিল্লীর

কুখ্যাত তিহার জেলখানায় লিখেছিলাম। যারা সত্যিকারার্থেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে চায়, তাদের জন্য এতে দিকনির্দেশনামূলক অনেক কিছু রয়েছে। লেখাটি আপনাদেরকে ২৩শে রমযানুল মুবারকের রাতে, রিয়াযুল জান্নাহতে অনুষ্ঠিত পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও কিছুটা অবহিত করবে। এবার লেখাটি পাঠ করুন। এর শিরোনাম ‘সুতি রুমাল’।

সুতি রুমাল
ধাক্কা খেয়ে বিমান রানওয়েতে অবতরণ করে। বিমানের বাতি জ্বলে উঠে। আমি কল্পনার জগত থেকে প্রত্যাবর্তন করে বাস্তব জগতকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকি। এটি ছিল আমার জীবনের এক বিস্ময়কর সফর। এখনও যার ইতি হয়নি। বাংলাদেশের জাতীয় বিমান কোম্পানী বিমান এয়ারলাইন্সের বোয়িং বিমান দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে (যাকে ইন্দিরা গান্ধী বিমান বন্দর নাম দেয়া হয়েছে) অবতরণ করেছে। গতি কিছুটা শিথিল হয়ে এখন মন্থরভাবে এগিয়ে চলছে। ঠিক যেন আমার মতই। বিমান যেমন অবতরণের পর দ্রুতগতিতে দৌড়াতে দৌড়াতে মন্থরগতিতে চলতে থাকে, আমিও জীবনের কয়েকটি বছর এমনই জোর গতিতে অতিবাহিত করে এখন ধীরগতিতে এগিয়ে চলছি। আমার প্রত্যেকটি সফরের ঐ

সময়টিতে কষ্ট হয়, যখন বিমান অবতরণ করে দৌড়ানোর পালা শেষ করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পিল পিল করে টহল দিতে থাকে। যেন সে বায়ু সেবন করছে আর ঘুরছে। তখন আমার উপর সময় নষ্ট হওয়ার অনুতাপ চেপে বসে।

সফর চলাকালে তো আমি আমার সময় লেখাপড়ার কাজে ভালভাবে ব্যয় করি। কিন্তু বিমান যখন অবতরণ করে, তখন সব কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়। তারপর অধৈর্য মুসাফির ভদ্রতা ও শালীনতার যাবতীয় চাহিদা বিস্মৃত হয়ে হুড়োহুড়ি করতে থাকে। শিশুদের হৈচৈ, সিটের মাঝখান দিয়ে যাত্রীদের সারি আর লাফিয়ে লাফিয়ে আসন ডিঙ্গানোর কষ্টকর কাজ—এ সবের কারণে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। আর যখন এ স্মরণ হয় যে, বিমান বন্দরের বাইরে কত বড় বড় ব্যক্তিত্ব আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তখন অন্তর বিষাদে ভরে যায়। এই দশ পনের মিনিট সময়কে শত শত বৎসরের চেয়েও দীর্ঘ মনে হতে থাকে। বিমান বন্দরের বাইরে কখনও রূহানী মুর্শিদ, কখনও শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ও স্নেহময়ী মা, আর কখনও জিহাদী কমাণ্ডার, কখনও তাবলীগী বন্ধু, আর কখনও বা অতীব আপন জন, প্রিয়জন ও বন্ধুজন প্রতীক্ষায় থাকেন। তাদের অনেকের সম্পর্কেই আমার জানা থাকে যে, তিনি বিমানবন্দরে আসবেন। তাদের প্রতীক্ষার কষ্ট তাদেরকে ছেড়ে আমার উপরই সওয়ার হয়ে যায়। এতো ছিল অতীতের অবস্থা, কিন্তু এখন যখন বিমান নয় বরং আমি নিজেই

অতীব মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছি, আর চতুর্পাশ্বে অসভ্যতা ও অশালীনতার সার্বিক চিত্র বিরাজমান। এসবের হৈ- হুল্লোড় ও লম্ফ-ঝম্পও চলছে রীতিমত। এমনিভাবে আরো এমন অনেক কিছুই হচ্ছে, যা হওয়া উচিত ছিল না।

ওদিকে আমার রূহানী মুর্শিদ, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, আমার শ্রদ্ধেয় মা- বাবা, আমার স্নেহের ভাইবোন ও আমার সফরসঙ্গী মুজাহিদ এবং উম্মতে মুসলিমার বহু সদস্য আমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন। কিন্তু সময় অতিবাহিত হচ্ছে অথচ এমন কোন রাস্তা বের হচ্ছে না, যা অতিক্রম করে আমি তাদের নিকট পৌছতে পারি। তাদের দীর্ঘশ্বাস আমাকে আর আমার নীরব ক্রন্দন তাদেরকে অস্থির করে তুলছে, কিন্তু কি বা করার আছে? তারাও অসহায় আর আমিও অপারগ। তাদের দৃষ্টিও আসমানের দিকে নিবদ্ধ, আর আমার দৃষ্টিও সেদিকেই আবদ্ধ। আমাদের সকলেরই হৃদয়ের বাসনা, কখন আমাদের সকলের মালিক মহান আল্লাহ কোন একটি রাস্তা খুলে দেবেন, আর আমি সে পথ অতিক্রম করে প্রতীক্ষমান সেই ব্যক্তিত্বগণের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে পারব আর কারও বা কদমবুসি করতে পারব।

বিমান থেকে অবতরণ করে আমি পালাম বিমান বন্দরের বিস্তৃত লাউঞ্জে চলে যাই। কুফুরীর এই আবাসভূমিতে প্রবেশ করে আমি

আমার প্রয়োজনীয় দুআসমূহ পাঠ করি। আজ এখানে অস্বাভাবিক কোন ভীড় বা ঠেলাঠেলি নেই। আমি ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করে একজন অফিসারকে আমার পাসপোর্ট দেই। সে নির্দ্বিধায় ভিতরে প্রবেশের সিল মেরে দেয়। আমি আইনানুগভাবে শত্রুর ভূমিতে প্রবেশ করি। এত সহজে ইমিগ্রেশন হওয়ায় আমি খুবই পুলকিত ছিলাম আমি আমার রবের শোকর আদায় করছিলাম। অথচ আজ থেকে মাত্র এক বছর পূর্বে শুধুমাত্র ট্রানজিট যাত্রী হিসেবে আমি বোম্বাই বিমান বন্দরে অবতরণ করি। আমার নিকট ডলার ও পাউণ্ড উভয়টিই ছিল। ভারতের লোলুপ মুশরিকরা আমাকে বেষ্টন করে ধরে। কোন কোন অফিসার আমাকে কাবু করার জন্য ধমকী দিতে থাকে। আবার কেউ কেউ দক্ষ দালালের মত কয়েকটি ডলার দিয়ে আমাকে মুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিতে থাকে। অনাচার ও নির্লজ্জতার এই নৃত্য মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়। আল্লাহর রহমতে সেদিন অকস্মাৎ আমার সময়মত ক্রোধের উদ্রেক হয়। তখন আমি ভুলে যাই যে, আমি আমার নিকৃষ্টতম দুশমনের দেশে অবস্থান করছি, নাকি করাচীর নিস্তার পার্কের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছি। বোম্বাই বিমান বন্দরে যখন আমি আমার সহজাত উচু আওয়াজকে আরেকটু উচু করে কড়া কড়া কথা শুনাতে লাগলাম, তখন সেখানে সমাবেশের রূপ নিতে লাগল। অন্যান্য অফিসাররাও সেখানে এসে উপস্থিত হল। এ দৃশ্য দেখে সামান্য

পূর্বে যেই অফিসারের ডলারের জন্য লালা ঝরছিল সে সংকুচিত হয়ে গেল। সে সাদাসিধা এক দরবেশ মৌলভীর নিকট থেকে ডলার লুটে নেয়ার ফিকিরে ছিল। কিন্তু পরিবেশ প্রতিকুল হয়ে যাওয়ায় সে ঘুষের পরিবর্তে লজ্জা পেতে লাগলো আর আমি নিশ্চিন্তে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানযোগে করাচী যাত্রা করলাম। বোম্বাইয়ের রণক্ষেত্রে প্রাপ্তি সফলতার ঘোর কেটে যাওয়ার পুর্বেই করাচী বিমান বন্দরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লোকেরা হেলথ কার্ড না থাকার কারণে আট দিন পর্যন্ত আমাকে একটি হাসপাতালে নজরবন্দী করে রাখে।

1 সে উপাখ্যানও বিস্ময়কর। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে কখনও সুযোগ হলে তা শুনাব।

দিল্লী বিমান বন্দর থেকে আমি টেলিফোন করে জানলাম, সব ঠিকঠাক মত আছে। টেক্সি নিয়ে হোটেলের দিকে রওয়ানা করলাম। টেক্সিওয়ালা আমাকে বড় ধরনের একজন আরব শায়েখ মনে করে কিছু হাতিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা তৈরী করছিল। কিন্তু আমি তো সজাগ ছিলাম। কথার মাঝে আমি তাকে ভয়

1

(সম্ভবত তখন ভারতে প্লেগ মহামারী চলছিল। যার দরুন ভারত থেকে আগত লোকদের মধ্যে যাদের নিকট হেলথ কার্ড না থাকতো, তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানো হত।)

ধরিয়ে দিলাম। ফলে সে কোন প্রকার শয়তানী না করে আমাকে সোজা হোটেলে নামিয়ে দেয়। হোটেল কক্ষে আমি গরম পানি দিয়ে উযু করে নামায আদায় করি। রাত দুটায় আমার সঙ্গীগণ চলে আসেন। তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত ও কিছুক্ষণ কথাবার্তায় বুঝতে পারি যে, আলহামদুলিল্লাহ, সবকিছু ঠিক আছে। আমি আমার সম্মুখে সফলতা দেখতে পাচ্ছিলাম। আল্লাহর সাহায্যে সে কাজের সবকিছু আশাতীতরূপে আপনা আপনি পেয়ে যাচ্ছিলাম। যে কাজের জন্য আমি গত তিন বছর ধরে বিরামহীনভাবে মেহনত করছিলাম, যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রমযানুল মুবারকের মত পবিত্র মাসের তেইশ তারিখ রাতে মুজাহিদীনদের সর্দার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওযার সম্মুখে বসে দুআ ও কান্নার মাধ্যমে করা হয়েছিল, মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র ভূমিতে আমার উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র মাটিতে আমি যে কাজের দাওয়াত এবং যে আন্দোলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র লিখি। যার প্রচারযোগ্য অংশ লেখকের নাম ছাড়াই অনেকগুলো ভাষায় মুদ্রিত হয়।

এ আন্দোলন সাধারণ কোন আন্দোলন নয়। এটি বিশ কোটি মুসলমানের জান-মাল ও ঈমান-আমল হেফাজতের বিষয় ছিল। এটি ছিল তিন হাজার

মসজিদ সংরক্ষণের পরিকল্পনা। এটি বিভিন্ন অধিকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য সহযোগিতার আন্দোলন ছিল। আমি এ কাজের জন্য সর্বদিক থেকে সীমাহীন সহযোগিতা পাচ্ছিলাম। যে কারণে আমি আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতামুখর ছিলাম। আমি নিজেও অভিভূত ছিলাম যে, চতুর্দিক থেকে আমি শুধু সহযোগিতাই পাচ্ছি। প্রতিটি ধাপ দ্রুত পার হচ্ছি। যা আমার মধ্যে স্বনির্ভরতা সৃষ্টি করে। আমি বিশ্বাস করি, ইনশাআল্লাহ এ কাজ আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়ে গেছে এবং তার চূড়ান্ত সফলতার বিষয় ফয়সালা হয়ে গেছে। সুতরাং সমস্ত তথ্য নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। কারণ,বিষয়টি ছড়ানো সমীচীন মনে হয়নি।

আমার ইচ্ছা ছিল যে, পরিকল্পনামাফিক কাজ যত অগ্রসর হবে, সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট শাখার লোকদেরকে সঙ্গে নিতে থাকব। কাজটি যদিও জটিল, দুরূহ, দীর্ঘ ও ধৈর্যসংকুল ছিল, কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভের প্রত্যাশাও ছিল। এরপর যখন প্রাথমিক সকল কাজ সম্পন্ন হল, তখন আমি সমীচীন মনে করলাম যে, নিজেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে তা নিরীক্ষা করে দেখব ও যথারীতি আন্দোলন আরম্ভ করব। সাথে সাথে কাশ্মীর প্রান্তেও যাওয়ার সংকল্প করি। অথচ সেখানে আমার বিশেষ কোন কাজ ছিল না। কিন্তু জিহাদের ময়দানের ফযীলত, মুজাহিদদের সঙ্গে সাক্ষাত, তাদের

সাহস বর্ধন, ঐক্য স্থাপনের পর তা পাকাপোক্ত করা এবং কার্যত জিহাদে অংশগ্রহণ করার বাসনা ও আল্লাহর পথে জান দেওয়ার আবেগ সেখানে যাওয়ার জন্য আমাকে আগ্রহী করে। যাই হোক, আমি যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, প্রথমে আমি সেই কাজ শুরু করি।

কিন্তু এই ভূখণ্ডেই ‘রেশমি রুমাল’ আন্দোলনও মাঝপথেই ধরা পড়ে যায়। এই আন্দোলনের অনেক কল্যাণই লাভ হয়েছে। কিন্তু যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই আন্দোলন শুরু করা হয়, সে সময় তা পূর্ণ হয়নি। যদিও পরবর্তীতে কিছু না কিছু পূর্ণতা লাভ হয়েছে। আমাদের এই আন্দোলনও রেশমী রুমালের আন্দোলনের মত নিখাদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুরু হয়েছে। এটি যদিও ঐ আন্দোলনের মোকাবেলায় কিছুই নয়, কিন্তু এর লক্ষ্যও অনেক বড়, যদিও এতদুভয়ের মাঝের তুলনা এমনই, যেমন এক ফোটা পানির তুলনা সাগরের সঙ্গে। কিন্তু উভয় আন্দোলনের লক্ষ্য অভিন্ন ছিল। এই আন্দোলন ছিল পূর্ব আন্দোলনের অবশিষ্টাংশের অন্তর্ভুক্ত। আন্দোলনের কাজ মাত্র শুরু হয়েছে। এ সময় আমার সফরের যাবতীয় প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে যায়। এ ব্যাপারে যেখানেই কখা হয়েছে সেখানেই অপ্রত্যাশিত সফলতা লাভ হয়েছে। বিশেষ ও সাধারণের আবেগ ও আত্মদানের বাসনা আমাকে অধিক প্রভাবিত

করে। কয়েকটি প্রোগ্রাম চুকিয়ে আমি কাশ্মীর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই এবং অবশিষ্ট কাজ সেখান থেকে ফিরে এসে করার ইচ্ছা করি। যাওয়ার পূর্বে দুআ করি, হে আল্লাহ! আমার কাশ্মীরের সফরকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর কর। তারপর কাশ্মীরেই আমার পায়ে বেড়ী আর হাতে হাতকড়া পরানো হয়। রেশমী রুমাল আন্দোলনে ‘আন্দোলন’ গ্রেফতার হয়েছিল। আর এখানে আন্দোলনকারী গ্রেফতার হল। এখন যদিও আন্দোলনের বিক্ষিপ্ত উপকারিতা চালু রয়েছে, কিন্তু সম্মিলিত আক্রমণ পিছিয়ে গিয়েছে। আমি বন্দী হওয়ায় সব ‘সুতা’ এলোমেলো হয়ে গেছে। কিন্তু উদ্দীপনা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। আল্লাহ করুন যে, বিশ কোটি মুসলমানের চিন্তা নিয়ে, হাজার হাজার মসজিদের দরদ নিয়ে, বিচক্ষণতা ও মেধা এবং কুরআনের আলো নিয়ে, আল্লাহর তাওফীক ও মুসলমানদের সহযোগিতায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে যাক এবং এ কাজকে পূর্ণতা দান করুক, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

যাত্রা হল শুরু
আমরা পবিত্র মদীনায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিপীড়িত ও ব্যথিত উম্মতের সংরক্ষণের জন্য শ্রম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাই। সে সময় ভারতে এমন লাভা উত্তপ্ত

হচ্ছিল, যার বিস্ফোরণে পুরা উপমহাদেশের চিত্র পাল্টে যেত। সে লাভা আজও বিদ্যমান আছে এবং তা ভেতরে ভেতরে জ্বলছে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, বর্তমানে ভারতের সংখ্যালঘু খৃষ্টানরাও মুসলমান, শিখ ও ছোট জাতের হিন্দুদের ন্যায় নিজেদেরকে অরক্ষিত মনে করছে। জালিমের সঙ্গদাতা নিজেও সেই জুলুমের শিকার অবশ্যই হয়, তাতে সন্দেহ নাই। এই সময় কয়েকটি দেশও সফর করি। আলহামদুলিল্লাহ, তাতে জিহাদের কাজকে সম্মুখে অগ্রসর করার অনেক সুযোগই হাতে আসে। বাবরী মসজিদ বিষয়ে প্রদত্ত আমার ভাষণসমূহ বিশ্বের অনেক দেশেই পৌছেছে। লাখ লাখ মুসলমান সে ভাষণ শ্রবণ করেছে। তাই কোন দেশেই আমার পরিচয় দানের প্রয়োজন পড়েনি এবং কাজের জন্য যথেষ্ট সময় ও অনুকূল পরিবেশ হাতে পাই। ইউরোপের সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দুটি মুজাহিদ সংগঠন একীভূত করার কাজ জোরে শোরে চলতে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ সমর্থন দান করি। সুতরাং ১৯৯৩ ঈসায়ীর অক্টোবর মাসে ‘হারকাতুল আনসার’ আত্মপ্রকাশ করে। ফলে কাশ্মীর এবং ভারতের মুসলমানগণ তাদের কাংখিত সফলতা হাতের নাগালে দেখতে থাকে। হারকাতুল আনসারের অন্যান্য দায়িত্বের সাথে সাথে প্রচার ও প্রকাশনা শাখার পূর্বের দায়িত্ব পূনরায় আমার উপর ন্যস্ত করা হয়। অধিকৃত

কাশ্মীরে হরকাতুল আনসারের ঐক্য পাকাপোক্ত করার কাজ স্বেচ্ছায় আমি আমার দায়িত্বে নিয়ে নেই। এখন আমার সম্মুখে কাজের এক দীর্ঘ তালিকা, হরকাতুল আনসারের ঐক্যবিরোধীদের দীর্ঘ সারি এবং অনেকগুলো দেশ থেকে আসা দ্বীনি তাকাযার দীর্ঘ আহবান উপস্থিত। আমি আমার এ সকল কাজ সম্পন্ন করা, দ্বীনী তাকাযাসমূহ পুরা করা এবং বিরুদ্ধবাদীদের থেকে দূরে থাকার জন্য এক দীর্ঘ সফরের প্রোগ্রাম বানাই। আমার প্রথম মঞ্জিল ছিল প্রতিবেশী একটি দেশ, তারপর সেখান থেকে আমার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। অধিকৃত কাশ্মীর ছিল তার পরবর্তী মঞ্জিল। তারপর ভারতের অন্যান্য এলাকার কাজ চুকিয়ে বিশ্বের প্রায় পাঁচ ছয়টি দেশে তাবলীগের উদ্দেশ্যে সফরের ইচ্ছা ছিল। দীর্ঘ এই সফরে আলবেনিয়া ও বসনিয়ার মত দেশও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমার এসব অঞ্চলের মজলুম মুসলমানদের অবস্থা কাছে থেকে দেখার ইচ্ছা ছিল। প্রত্যেক দেশে সংক্ষিপ্ত অবস্থান করার এবং সেখানকার বন্ধুদেরকে অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করার প্রোগ্রামও তৈরী করা হয়। পাসপোর্ট এবং টিকেটের ব্যবস্থাও সহজেই হয়ে যায়। লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান দূতাবাস থেকে ভারতের মালটিপ্লাস ভিসাও পেয়ে যাই। সম্ভবত তারা আমাকে চিনতে পারেনি। বরং একথা

নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তারা আমাকে চেনেনি।

আলহামদুলিল্লাহ, ব্যবস্থাপনা এমনই ছিল যে, তারা যেন আমাকে না চিনেই ভিসা দিয়ে দেয়। ফলে পরবর্তীতে তারা খুবই অনুশোচনা করে। এটি আল্লাহ পাকের প্রবল ব্যবস্থাপনা ছিল যে, তিনি আমাকে ভারতে প্রবেশ করান। আর তখন তাদের জন্য অনুশোচনা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে এভাবেই লাঞ্ছিত করেন এবং আপন বান্দাদেরকে এভাবেই সাহায্য করেন। আমার ভারতে যাওয়া এবং সেখান থেকে ফিরে আসা শুধু আর শুধু আল্লাহর সাহায্য আর অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে। কারাগারে লেখা আরেকটি প্রবন্ধ এখানে তুলে ধরছি। প্রবন্ধটি আমার ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কিছু দৃশ্য আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরবে। প্রবন্ধের শিরোনাম ‘শিনাসা।

শিনাসা
বেটা! আল্লাহ হেফাজত করুন।.... বেটা! আমি তোমাকে বাধা দেব। আমি তোমাকে আল্লাহর হাওলা করছি, বেটা। আল্লাহর হাওলা। অশ্রুর ফোটা প্রতিরোধের চেষ্টারত ওয়ালিদ সাহেবের কণ্ঠস্বর তার হৃদয় বেদনার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। আমি বললাম, আব্বাজান! দুঃশ্চিন্তার কি আছে? ইতিপূর্বেও আমি

বিদেশের অনেক সফর করেছি। এতে কান্নার ও অস্থির হওয়ার কি আছে? আমার কথা শুনে তার চক্ষুদ্বয় থেকে বাঁধভাঙ্গা নদীর ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি বললেন,বেটা! তুমি কোথায় যাচ্ছ তার সবই আমি অবগত আছি। আল্লাহর রাস্তা, এ রাস্তা থেকে বাধা দিয়ে আমি পাপী হতে চাই না। বেটা! আল্লাহই তোমার নেগাবান। তারপর হঠাৎ করেই বললেন, আমি বিমান বন্দর পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাব। তার স্নেহপূর্ণ সুমিষ্ট এ কথা শুনে আমিও কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ি। আবেগ ও মুহাব্বত আমার হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। অথচ আমি মুসলিম উম্মাহর খাতিরে সকল ভালবাসা ও আবেগকে ঝেড়ে ফেলে বাহ্যত অতি দৃঢ় হয়ে এই সফরের উদ্দেশ্যে পা বাড়াই। কিন্তু মাতাপিতার অতুলনীয় আত্মিক সম্পর্ক, মুহাব্বত ও ভালবাসা আমার অস্তিত্বকে কুঁরে কুঁরে খেতে থাকে। মন চাচ্ছিল, স্নেহপরায়ণ পিতাকে ঝাপটে ধরি। তার স্নেহের উপত্যকায় হারিয়ে গিয়ে নিজেকে বিস্মৃত হই। কিন্তু সহসাই আমি নিজেকে সামলে নেই। আমি চিন্তা করলাম, আমি যদি আবেগপ্রবণ হয়ে হারিয়ে যাই, তাহলে পথের সন্ধান কে করবে? পথে কে অগ্রসর হবে? আমি বললাম, আব্বাজান! আপনি বিশ্রাম করুন আর আমার জন্য দুআ করুন। বিমান বন্দরে যাওয়া আপনার জন্য সমীচীন নয়। আপনি তো জেনেই ফেলেছেন এটি ব্যতিক্রমধর্মী একটি সফর।

এটি ছিল করাচীতে দীর্ঘ এই সফরের পূর্ব রাতের শেষ প্রহর। ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে তিনটা বেজে উঠল। করাচী শহর এখন ঘুমিয়ে আছে সড়ক ও পথের জ্বলন্ত বাতিসমূহ পরিবেশকে অধিকতর উদাসীন করে রেখেছে। আমি সেই পোশাক পরিধান করলাম, যা বাল্যকালে একসময় পরতাম। পরবর্তীতে এই পোশাকের ব্যাপারে আমার অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। কারণ, আমাদের রক্তপান করে জীবন ধারণকারী নরাধমেরা এই পোশাককে সম্মানের পোশাক বানানোর জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে। আর মুসলিম উম্মাহর সহজ সরল ও সাদাসিধা লোকেরা জালেম শিকারীকে ত্রাণকর্তা ও উন্নতির পথপ্রদর্শক মনে করে তাদের প্রতিটি নোংরা, নির্লজ্জ, নির্বোধ ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজকে গ্রহণ করে চলেছে। কিন্তু ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও আজ আমাকে এই পোশাকই পরতে হল। এমন পোশাক, যা পরিধান করে আমি নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পাচ্ছিলাম। তবে তার উপর সাদা পোশাক পরিধান করার পর লজ্জা হ্রাস পায়।

তিনজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সাথে আমি বিমান বন্দর পৌছি। আজ আমাকে পোশাক ও পরিচয় পরিবর্তন করে নিজের দেশ থেকে এভাবে যেতে হচ্ছে। কিন্তু কেন? বড় দীর্ঘ সেই উপাখ্যান, যা শোনানোর সাহস আমার মধ্যে নেই এবং তা সহ্য করার শক্তিও আপনাদের কলিজায় নেই। সংক্ষিপ্ত এই যে, মুসলমানদেরকে

রক্ষা করার জন্য, স্বদেশকে রক্ষা করার জন্য, ইসলামী সীমান্তকে রক্ষা করার জন্য আমার এ সফর। যে কাজ ছিল এ দেশের শাসকদের করণীয়।

কিন্তু শাসকদের এ নিয়ে কিসের মাথা ব্যথা। কারণ, তারা সময় পায় মাত্র পাঁচ বছর। কিন্তু তাদের দায়িত্ব অনেক। মাত্র পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত এই সময়ে নিজের অধঃস্তনের জন্য উপার্জন করতে হয় এবং সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাংকসমূহের উদর পূর্ণ করতে হয়। তাদের ইসলাম ও মুসলমানের সংরক্ষণ এবং সীমান্ত রক্ষা করার মত অর্থহীন কাজের অবসর কোথায়? এ ছিল এক বেদনা, এক আঘাত, আবার আনন্দ ও সৌভাগ্যের মুহূর্তও যে, আমি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এবং আমার দেশের জন্য এ সবকিছু করছিলাম। বিমান বন্দরের যাবতীয় কাজ দ্রুত শেষ করি। এই বিমান বন্দর থেকেই এ পর্যন্ত অনেকবার বিদেশ সফর এবং প্রায় শতাধিকবার আভ্যন্তরীণ সফর করেছি, কিন্তু আজ পরিস্থিতি ছিল ভিন্নরকম। সর্বদা আশংকা ছিল, যদি পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে উপায় কি হবে? কারণ, এমন সাক্ষাত তো প্রায় সকল সফরের সময়ই হয়ে থাকে। আমি প্রয়োজনের সময় পরিচিতদের হাত থেকে সহজে পার পাওয়ার জন্য কিছু উত্তর পূর্ব থেকেই তৈরী করে রাখি। কিন্তু

আল্লাহর সাহায্য পদে পদে আমার সঙ্গ দিচ্ছিল।

করাচী বিমান বন্দর থেকে ঢাকার হোটেল পর্যন্ত পরিচিত কারো মুখোমুখি হতে হয়নি। যে সময় যে অবস্থা। সেদিন তো আমি পরিচিতজনদের থেকে লুকিয়ে ফিরছিলাম। আর তার দেড় বছর পর তিহার জেলখানায় পৃথক একটি সেলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্বরে পুড়ছিলাম। মাথার ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম। তখন মন চাচ্ছিল, আহা! কোন পরিচিতজন যদি এসে সালাম করত, আর আমার মাথায় হাত রেখে এতটুকু মাত্র জিজ্ঞাসা করত, আপনি কেমন আছেন? কি অবস্থায় দিন কাটছে?

বাবরী মসজিদের যিয়ারত আমি যখন ভারতে পৌঁছি তখন সেখানে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায়। নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাশ্মীর শাখা রাজেশ পাইলট নামীয় একজন গোঁড়া মুশরিকের হাতে। আজ যখন আমি এই প্রবন্ধ লিখছি, এসময় রাজেশ পাইলট ইহজগতে নেই। এক সড়ক দুর্ঘটনায় সে মারা পড়েছে। ভারত পৌছে আমি আমার কাজের ছক তৈরী করি। আমি দৃঢ় সংকল্প করি যে, ইনশাআল্লাহ, অযোধ্যা গিয়ে বাবরী মসজিদ যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করব। প্রাথমিক

কাজ শেষ করতে দুই-তিন দিন পার হয়ে যায়। দিল্লীর একটি হোটেলে একটি রুম ভাড়া করেছিলাম। নামায পড়ার জন্য কোন কোন সময় দূরবর্তী মসজিদে চলে যেতাম। আবার কোন কোন সময় হোটেল কক্ষেই পড়তাম। দিল্লীতে শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন মুজাহিদ বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয়। তাদের কেউ কেউ কিছুদিন ধরে অবসর বসেছিল। আমি তাদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য প্রস্তুত করি। ভারতের ১৩ দিনের এই অবস্থানের অন্তরালে দীর্ঘ এক দাস্তান রয়েছে। তার কিছু উল্লেখ করব, আর কিছু করব না। আজকের এই আসরে বাবরী মসজিদ যিয়ারত করার ঘটনাটি তুলে ধরছি। পাঠক এবার আসুন, আজকে কারাগারে লিখিত সেই প্রবন্ধটি পাঠ করছি, যার শিরোনাম ‘বাবরী মসজিদের যিয়ারত’।

জগদ্বিখ্যাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনের পর এখন আমাদের গাড়ী ফয়েজাবাদ অভিমুখে এগিয়ে চলছে। আমরা চারজন আরোহীর সকলেই পথ সম্পর্কে অনবহিত। কিন্তু একটি আবেগ, একটি দরদ এবং একটি আকর্ষণ আমাদেরকে মঞ্জিলের দিকে টেনে নিচ্ছে। ফয়েজাবাদ পৌছে একটি বাজার সদৃশ অঞ্চলে আমরা অল্প সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি করি। পরবর্তী সফর বিপদসংকুলও হতে পারে। কারণ, অনেকেই এ রকমই বলেছেন, কিন্তু আমরা এসব আশংকার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু মঞ্জিল পর্যন্ত

পৌঁছতে চাচ্ছিলাম ঠিক সেই পতঙ্গের ন্যায়, যে প্রদীপের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, কিন্তু তার ডানা ও পালক কেটে যাওয়ার বা জ্বলে যাওয়ার ভয় করে না।

অন্য একটি কাজের উদ্দেশ্যে গাড়ী থামানো হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের আসল কাজও হয়ে গেল। মস্তকে টুপিধারী ও দেহে মাদরাসার ছাত্রের পোশাক পরিহিত শ্যামলা রঙ্গের এক যুবক নিজে নিজেই আমাদের গাড়ীর নিকট চলে আসে। আমাদের নিকট এসে সে সালাম করে। আমরাও তালিবে ইলম আর সেও তালিবে ইলম। তাই দুই মিনিটেই আমরা পরস্পরের অকৃত্রিম সহযোগী হয়ে যাই। সে জিজ্ঞাসা করে, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? আমরা তার কথার উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে জিজ্ঞাসা করি, শুনেছি বাবরী মসজিদ নাকি এখান থেকে অল্প দূরে, অযোধ্যা নামক অঞ্চলে? সে বিষাদময় কণ্ঠে বলল—হাঁ ছিল। আমি বললাম, এখন কি অবস্থা? সে বলল, শহীদ করা হয়েছে। সেখানে অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। চতুর্দিকে হাজার হাজার সশস্ত্র পুলিশের কড়া পাহারা রয়েছে। আমি বললাম, তুমি কিভাবে জানলে? সে বলল, আমি কিছুদিন পূর্বে ছদ্মবেশে সেখানে গিয়েছিলাম। তার ভিতর পর্যন্ত দেখে এসেছি। আমি বললাম, আমরা যেতে চাইলে কিভাবে যেতে হবে? সে বলল, আমি সাথে যাচ্ছি। চেষ্টা করব। কিছু বিপদও রয়েছে, কিন্তু

আমি তার ধার ধারিনা। সে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসে। গাড়ীর ইঞ্জিন গুনগুনিয়ে ওঠে। তখন আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় সহচরও গুনগুনিয়ে বলেন, ‘সংকল্প দৃঢ় হলে মোড়ে মোড়ে সহযোগীও পাওয়া যায়।’

পথিমধ্যে জানতে পারি যে, সে ব্রেলীর একটি মাদরাসার ছাত্র। অন্য একটি মাদরাসায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক। কিন্তু সেখানে ভর্তি হতে পারেনি। ভর্তি হতে পারবে, তেমন আশাও নেই। আমি তাকে বললাম, ফেরার পথে ইনশাআল্লাহ তুমি ভর্তি হতে পারবে। সে অভিভূত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, কিরূপে? আমি বললাম, অমনি। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম? আমি বললাম, নামহীন। তারপর আমি তাকে বুঝালাম, প্রিয়! নাম পরিচয়ের আবর্তে পড়ো না। তোমার ভর্তি হওয়ার দরকার থাকলে আল্লাহর মেহেরবানীতে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছেন। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানেরও বন্ধু। কিছুক্ষণ পর আমরা অযোধ্যায় পৌছি। সেই নগরী যেখানে মোঘল সম্রাট বাবরের নামে সম্পৃক্ত মুলসমানদের এবাদতখানা ‘বাবরী মসজিদ’ ছিল। ১৯৯২ ঈসায়ীর ডিসেম্বরের ৬ তারিখে এই নগরীতে লক্ষ লক্ষ মুশরিক একত্রিত হয়ে মহান এই মসজিদকে শহীদ করে। তারা মুসলমানদের অন্তরে এমন এক আঘাত করে, যা ঐ সময় পর্যন্ত শুকাবে না, যে পর্যন্ত এ

মসজিদ তার পূর্বের জায়গায় পূর্ণ প্রতাপের সঙ্গে নির্মিত না হবে এবং তার খসে পড়া প্রত্যেকটি পাথরের প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হবে।

অযোধ্যায় প্রবেশ করতেই আমার অন্তর কাঁপতে থাকে। দুঃখ ও ক্রোধে কলিজা জ্বলতে থাকে। চোখের পানি বাইরে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়। ফলে গাড়ী চালাতে সমস্যা হচ্ছিল। আমাদের আত্মমর্যাদার পরীক্ষার অকৃতকার্যতার ফলাফল, আমাদের ভীরুতা ও আরামপ্রিয়তার ভয়ঙ্কর পরিণতি অল্প পরেই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে দেখা দিবে। লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসছিল। অন্তর অপরাধানুভূতিতে ও অনুতাপে কাঁপছিল। আহ! সে দিনটিও দেখতে হল, যেদিন হিন্দুরা আমাদের জীবদ্দশায় মহান এই মসজিদকে ভেঙ্গে ফেলে। এই মসজিদ কি এতীম ছিল? দুনিয়ার বুক থেকে কি মুসলমান নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল? এই দৃশ্য বারবার কি ঘটতে থাকবে?

বেদনার তরঙ্গ, দুঃখের আঘাত এবং অন্তরে বিদ্ধ প্রশ্নরাজি অযোধ্যায় পৌছতেই আমাকে দুর্বল করে ফেলে। আমাদের গাড়ী পুরাতন ধাচের ঘনবসতিপূর্ণ শহরটিতে প্রবেশ করেছে। মন্দিরের তীক্ষ্ণ চূড়া আমার অন্তর ছিদ্র করছিল। চৌরাস্তা ও মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে শেরেকের প্রতীকসমূহ জ্বলজ্বল করছিল। তালিবে ইলমটির নিকট আমি

মসজিদের পথ জিজ্ঞাসা করি। সে দ্বিধায় পড়ে যায়। ইতিপূর্বে সে পদব্রজে এসেছিল। সে তখন সংকীর্ণ গলিপথ অতিক্রম করে মসজিদের নিকট গিয়েছিল। গাড়ীপথ তার জানা ছিল না। সে বলল, এখানে একটি মাযার আছে। চলুন আমরা প্রথমে সেখানে যাই। সেখান থেকে রাস্তা বের করে নেব। আমরা মাযারে যাই। শ্বেতপাথর ও মর্মর পাথরে তৈরী মাযার। পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনা। আগরবাতির সুগন্ধিতে ভরা বড় একটি কক্ষ। পিতলের রেলিংয়ের মাঝে পাকা উঁচু একটি কবর অসংখ্য চাদরে আবৃত। কোণায় দানবাক্স। পাশেই ছোট একটি মসজিদ। কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলা ও শুভ্রবস্ত্র পরিহিত একজন খাদেম। খাদেমটি গাড়ী দেখেই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে স্বাগত জানায়। তারপর মাযারের ভিতরে নিয়ে যায়। আমরা সূরা ফাতেহা পাঠ করে দুআ করি। লোকটি আমাদেরকে বুযুর্গদের কারামত ও আরো অনেক কিছু শোনাতে আরম্ভ করে। আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে বাবরী মসজিদে নিয়ে চলুন। পথে আপনার সঙ্গে কথা হবে। সে মাজুর মহিলাদের সমস্যার কথা তুলে ধরল। আমরা কিছু দেওয়ার ওয়াদা করলাম। তাতে সে অত্যন্ত খুশী হয়ে বলতে লাগল, বাবরী মসজিদের ধারেই মুহাম্মাদ সিদ্দীক নামে আমার এক বন্ধুর বাড়ী রয়েছে। আমরা তার বাড়ীতে যাব। সেখান থেকে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাবে। ওদিকে পুলিশের সন্দেহ থেকেও বাঁচতে পারব।
আমরা খুবই খুশী হলাম। সেও আমাদের সাথে

গাড়ীতে উঠে বসল। আমি ড্রাইভিং করতে লাগলাম। গাড়ীর মধ্যে পূনরায় আওয়াজ গুঞ্জরিত হল, ‘সংকল্প দৃঢ় হলে প্রতি মোড়েই দিশারী পাওয়া যায়।’

মাযারের বর্ষিয়ান খাদেম এই পথেই যেন বড় হয়েছে। সে সংকীর্ণ গলিপথ অতিক্রম করতে থাকে। পথিমধ্যে অবস্থিত বিশেষ কয়েকটি স্থানের পরিচয় দেয়। সে বলে, এখানে মুসলমান খুব কম। সামনে একটি মসজিদ আসবে। মসজিদটি অর্ধেক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে জুমআর নামায পড়া হয়। ফয়েযাবাদ থেকে একজন মৌলভী সাহেব আর কয়েকজন মুসল্লী এসে নামায আদায় করেন। এখানকার অনেকগুলো মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাযারসমূহ খুব জাঁকজমকপূর্ণ থাকে। খুব ঠাটবাটের সাথে বার্ষিক ওরশ হয়।

একটু পর সেই ঐতিহাসিক মসজিদ দেখতে পাই, যার একাংশ জ্বালানো ছিল। আমরা সেটি দূর থেকেই দেখে সম্মুখে চলে যাই। অল্পক্ষণ পর দূর থেকে পুলিশের ট্রাক আসতে দেখি। তাদের সংখ্যা ছিল অনেক। সামান্য উঁচু একটি জায়গায় পুলিশদেরকে সতর্কাবস্থায় দেখা যাচ্ছিল। তারা সংখ্যায় কয়েক হাজার তো অবশ্যই হবে। আমি পুলিশের মধ্য দিয়ে দ্রুত গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাই। তাদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে যায়। ততক্ষণে আমরা মসজিদের সাবেক দরজার অদূরে পৌঁছে যাই।

মাযারের খাদেম লোকটি রাস্তার ধারে গাড়ী দাঁড় করানোর জন্য ইঙ্গিত করে। আমি গাড়ী দাঁড় করাই। খাদেম লোকটি গাড়ী থেকে বের হয়ে, এই সিদ্দীক! এই সিদ্দীক! বলে চিৎকার করতে থাকে। আমরা গাড়ীতে বসে থাকি। আমাদের অবস্থা দেখে পুলিশ বাহিনী অস্থির ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে। ত্রিশ বছর বয়সী এক তরুণ বাড়ীর উপর থেকে নীচের সড়কে নেমে আসে। খাদেম লোকটি তাকে সালাম করে বলে, মেহমান এসেছে, বাড়ীতে নিয়ে যাও। যুবকটি আমাদেরকে বাড়ীতে প্রবেশ করার জন্য আহবান করে। আমরা রাস্তা থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে অবস্থিত তার সাদামাটা ও কাঁচা বাড়ীতে প্রবেশ করি। সে রশির বুনানো খাট সামনে এনে বসতে বললে আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। সে আমাদেরকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে আসে এবং ছোট একটি মাচার উপর দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সেই বেদনাপূর্ণ দৃশ্য দেখায়, যা স্মরণ করে আজও আমার অন্তর কেঁদে ওঠে।

আমাদের থেকে কয়েক ফুট দূরে মাটি ও পাথরের বিরাট এক স্তুপ দেখা যাচ্ছিল। জানতে পারলাম, এগুলো বাবরী মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। এ স্তুপীকৃত ধ্বংসাবশেষের উপরে গেরুয়া রঙ্গের কাপড়ের একটি তাঁবু টানানো, যার সম্মুখে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এটি বাবরী মসজিদের বুকের উপর তৈরী করা অস্থায়ী মন্দির। আমি চেষ্টা করা

সত্ত্বেও নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলাম না। আমার এবং আমার প্রিয় বাবরী মসজিদের মাঝখানে একটি পরিখা, যা সরকার বাবরী মসজিদের তিনদিকে খনন করে রেখেছে। আমার অবস্থা ছিল সেই অপরাধীর মত, যার গাফলতির সুযোগে তার মাকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। আর এখন সে মায়ের কবরে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছে। হঠাৎ করেই আমার বেদনা ক্রোধে পরিণত হয়। আমি দৃঢ় সংকল্প হয়ে মাটিতে কয়েকটি আঘাত করি, যার ফলে ধূলা উড়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। আমি মনে মনেই এ বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেই যে, ইনশাআল্লাহ! এখানে একদিন না একদিন বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মিত হবে। এর ভবন থেকে আল্লাহু আকবর ধ্বনি গুঞ্জরিত হবে। মসজিদকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না? আজ বাবরী মসজিদের ইমারত নেই ঠিকই, কিন্তু তা কোটি কোটি মুসলমানের অন্তরে ও মুখে জীবিত আছে। মুসলমান তো বটেই শত্রুরা পর্যন্ত এর আলোচনা করে ক্লান্ত হয় না। আমি আবেগ মিশ্রিত বিরল বিস্ময়কর অবস্থা এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে মসজিদের বুকের উপর মন্দির দেখছিলাম। এমন সময় খাদেম লোকটি বলল, এখানে বেশি সময় দাঁড়ানো যাবে না, ফিরে চলুন।

আমরা ফিরে চললাম। সিদ্দীক সাহেব বললেন, আমার পিতা এই মসজিদের খেদমত করতেন।
আমাদের বাড়ী মসজিদের দরজা সংলগ্ন ছিল।

আমার পিতা স্বয়ং তাতে নামায পড়েছেন। কিন্তু আমি এটি বন্ধই দেখেছি। তিনি চা পানের দাওয়াত করলেন। আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম। পুলিশের কয়েকজন লোক গাড়ীর আশে পাশে দাঁড়িয়েছিল। কেউ নাম্বার প্লেট দেখছিল। কেউ সম্মুখের কাঁচের ভিতর দিয়ে উকি দিচ্ছিল। আমি তাদের ভিতর দিয়ে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসি। তাদের চেহারার অস্থির প্রশ্নাবলী এবং তাদের অন্তরের উত্তেজিত জালেমী সংকল্পসমূহ কোন সত্ত্বা প্রতিহত করেন তা আমার জানা ছিল। আমি গাড়ী ষ্টার্ট করি কিন্তু তাদের কেউ কেউ সামনে দাঁড়িয়েই থাকে। তাদের নির্বাক অবস্থা সকলের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করছিল। আমি দ্রুতগতিতে গাড়ী চালিয়ে দেই। সম্মুখস্থ সিপাহীরা তড়িৎ ডানে বামে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। আমরা গলিপথে হারিয়ে যাই। আমার অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, যে মহান সত্তা আমাদেরকে বাবরী মসজিদের স্থান যিয়ারত করার ভাগ্য দান করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে ঈমানদারদের অন্তর শীতল করবেন।

বাবরী মসজিদের শাহাদত ঈমান ও সংকল্পের এক নতুন জাগরণ সৃষ্টি করেছে। এখন তো অনেক মুসলমান এ কথাও বলে যে, তারা বাবরী

মসজিদের পরবর্তীকালের মুসলমান। ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের এখন বাবরী মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়ার অনেক বেদনা। কারণ, ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে দীর্ঘ ৪৬ বছর ভারত শাসনকারী এই দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। দলের নেতারা স্বীকার করেছে যে, তাদের পরাজয়ের বড় একটি কারণ কংগ্রেসের শাসনকালে বাবরী মসজিদ শহীদ হওয়া। সুতরাং এখন কংগ্রেস বাবরী মসজিদের সপক্ষে বিবৃতির পর বিবৃতি দিচ্ছে। অপরদিকে বাবরী মসজিদ শহীদ করার দায়ে দায়ী বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি)এর লিডাররা বাবরী মসজিদের শাহাদাতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে। কারণ, মসজিদ শহীদ করে তাদের যেসব উদ্দেশ্য অর্জন করার ছিল, তা অর্জিত হয়নি। এখন তাদেরকেও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, তারা মুসলমানদেরকে বুঝতে ভুল করেছে। তারা ভারতের বুকে স্পেনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর স্বপ্ন বাস্তব হতে দেখছে না। ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দের মার্চের নির্বাচনে বিজেপি প্রথম সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী মাত্র দশ মিনিট সময় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। সে ভাষণে তাকে বাধ্য হয়ে বাবরী মসজিদের আলোচনা করতে হয়। তারপর আমরা অনাস্থা আন্দোলনের সময় ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয় বিতর্ক শুনি, তখন প্রত্যেক সদস্যই বাবরী মসজিদের আলোচনা উঠায়। কংগ্রেসের নামকরা লিডার

শরৎ পায়োর তো তিনবার এই কথা বলে যে, ১৯৯৬তে যখন বাবরী মসজিদকে শহীদ করা হয়, তখন দেশ সাম্প্রদায়িক বিপর্যয়ের আবর্তে পড়ে যায়।

বিজেপির প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, অতঃপর এসেম্বলীর আলোচনায় বাবরী মসজিদের বিষয়টি এমন শক্তিশালীভাবে উত্থাপিত হতে দেখে আমি ভাবলাম যে, আলহামদুলিল্লাহ! মুসলমানদের একটি পবিত্র ইবাদতখানার খুন পুরা ভারত হজম করতে পারছে না। অন্যেরা তো পরের কথা। খোদ দোষীরাও সাফাই গাচ্ছে। তাই এ ঘটনা থেকে বিশ্ববাসীর বুঝে নেয়া উচিত যে, মুসলমানদের সঙ্গে টক্কর দেয়া সহজ ব্যাপার নয়।

যুগের এক দুর্লভ ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ ভারতে এগার দিনের অবস্থানকালে অকস্মাৎ যুগের একজন মহান ও দুর্লভ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পাঠক আসুন আজকের বৈঠকে সেই সাক্ষাতের ইতিবৃত্ত পাঠ করি। কিন্তু আফসোস, সেই ব্যক্তিত্ব এখন আর আমাদের মাঝে নেই! প্রেমিক তো সাকীর দরবারে চলে গেছেন। কারা প্রকোষ্ঠে লিখিত সেই প্রবন্ধের শিরোনাম ‘প্রেমাস্পদের দিকে প্রেমিকের যাত্রা’।

প্রেমাস্পদের দিকে প্রেমিকের যাত্রা
কেন জানি আজ ভোর থেকে একটি বিষয় বারবার মস্তিষ্ক থেকে উতলে উঠে কাগজে আসার জন্য আমাকে অস্থির করে তুলছিল। কিন্তু আমি তা লেখার জন্য কোনভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না। কেননা সে কথা আমি বিস্তারিতভাবে লিখলে, এমন কিছু ব্যক্তিত্বের জন্য বিপদাশংকা সৃষ্টি হতে পারে, যাদের মর্যাদা ও প্রাণ রক্ষার্থে আমি আমার জান কুরবান করতেও পিছপা হব না। আর অস্পষ্টভাবে ইশারা ইঙ্গিতে লিখলে লাভই বা কি? কারণ, ইঙ্গিতে তো অনেক লেখা হয়েছে। এখন তো স্পষ্ট করে লেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সকাল থেকে এই টানাহেঁচড়ার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত হয়। একবার তো হাতে কলম নিয়ে বসেই পড়লাম। কিন্তু বিষয়টি তুলে ধরার সাহস হল না। বিষয়টি ছিল খুবই সাদামাটা। আমি আমার ভারতের মুসলমান ভাইদের সমীপে নিবেদন করতে চাচ্ছিলাম যে, তারা যেন নিজেদের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য অহিদুদ্দীন খান, আখলাক হুসাইন ও বেলাল বজ্রলোভীর ন্যায় লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। এরা তিনজনই আপন আপন নামের শুরুতে ‘মাওলানা’ শব্দ লিখে থাকে।

ভারতের পত্রপত্রিকাসমূহ তাদের মূর্খতাসুলভ অর্থহীন বক্তব্যসমূহ ফলাও করে ছাপিয়ে থাকে। যার ফলে পত্রপত্রিকাসমূহে অভদ্রতার এক তুফান

বয়ে চলেছে। একদিকে তো আরভান শূরীর মত ইসলামের শত্রু বড় বড় কলাম লিখে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। অপরদিকে অহিদুদ্দীন খান ও আখলাক হুসাইন কাসেমীর মত লোকেরা সরকারী পদক ও পুরস্কারের লালসায় ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। এ ছিল আমার প্রতিপাদ্যের প্রথম দিক। এতে আমি একথা আরজ করতে চাচ্ছিলাম যে, এরা দু’জন এবং নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠা বেলাল বজ্রলোভী কিভাবে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। আলোচনার দ্বিতীয়াংশে আমার এমন সকল ব্যক্তিত্বের নাম লেখার ইচ্ছা ছিল, যাঁদের নিকট ভারতের সকল মুসলমানের যাওয়া উচিত এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে তাঁদের সঙ্গেই পরামর্শ করা উচিত। এঁরা দ্বীনের যে ব্যাখ্যা দান করেন, শুধুমাত্র তাই গ্রহণ করা উচিত। পুণ্যময় এসব ব্যক্তিত্ব এবং দ্বীনের এ সকল মহান সংরক্ষকের মধ্যে সর্বপ্রথম যেই নাম আমার মস্তিষ্কে আসছিল তিনি হলেন, ভারতের মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী (রহঃ)এর সম্মানিত নাম।

কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছিল যে, আমি তাঁর নাম লিখে দিলে আবার কিনা তাকে ভারতের জালেম সরকার কষ্ট দিতে শুরু করে। কারণ ঐ হতভাগাদের নিকট কারো কোন মর্যাদা বা

গুরুত্ব নেই। আটশ বছর পর্যন্ত মুসলমানদের লবণ খেয়ে জীবন ধারণকারী এই অকৃতজ্ঞরা মাত্র পঞ্চাশ বছর ধরে নখের অধিকারী হয়েছে। আর তারা সেই নখ কেবলমাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করছে। তারা দারুল উলুম নদওয়ার মত প্রতিষ্ঠানের উপর অতর্কিত আক্রমণ করতে এবং বাবরী মসজিদের মত পবিত্র স্থানকে শহীদ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। আল্লাহ না করুন, আমার লেখার কারণে যদি হযরত মুফতী সাহেবকে তারা কষ্ট দেয়, তাহলে তো বড়ই মনবেদনার কারণ হবে। তাই আমি এ বিষয়ের উপর কিছু লেখার ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। অথচ আমি অনেকদিন ধরে এক আগুনে জ্বলছিলাম।

ভারতের পত্রপত্রিকাসমূহ, যেগুলোর মালিকেরা কট্টর হিন্দু-ভালো কোন দ্বীনী আলোচনা ছাপে না। অথচ অহিদুদ্দীন খান এবং আখলাক হুসাইন কাসেমী সেসব পত্রিকার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের ভ্রান্ত তাফসীরের বিষ ছড়াচ্ছে। তারা ইসলামের সেই চিত্র তুলে ধরছে, যা মির্যা কাদিয়ানী, স্যার সৈয়দ আহমাদ খান এবং গোলাম আহমাদ পারভেজ এঁকেছিল। বিগত দিনগুলোতে অহিদুদ্দীন খান আফগানিস্তানের জিহাদের বিরুদ্ধে কয়েক পর্বের একটি প্রবন্ধ লেখে। প্রবন্ধটি পত্রিকাসমূহের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে ছাপা হয়। আমি প্রবন্ধটি শেষ হওয়ার জন্য

অপেক্ষা করছিলাম। যখন মিথ্যা, বানোয়াট ও অর্থহীন প্রগলভতার এই ধারা খতম হয়, তখন আমি প্রবন্ধের উপর বিস্তারিত এক অভিমত লিখি। তাতে তার লেখার প্রতিটি লাইনে ভুল ধরি এবং এ কথাও প্রমাণ করি যে, আফগানিস্তানের জিহাদ সম্পর্কে অহিদুদ্দীন খানের কিছুই জানা নেই। বরং শুধুমাত্র নজীবের কমু্যনিষ্ট সরকার অহিদুদ্দীন খানের আতিথ্যকালে যা কিছু বলেছে, সে ঐ কথাগুলোই পত্রিকায় উগলে দিয়েছে। অবস্থা এমন যে, বিভিন্ন জিহাদী সংগঠন ও তার প্রধানদের নাম পর্যন্ত সে ঠিকভাবে জানে না। আমি এই অভিমত লিখে অন্যের নামে পাঠিয়ে দেই, কিন্তু তা পত্রিকায় ছাপা হয়নি। মুসলমানদের সমর্থনে লেখা প্রায় সকল প্রবন্ধেরই এ অবস্থা হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে এ ধরনের কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী যদি গান্ধীকে মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ লেখে বা তসলিমা নাসরিনকে নির্যাতিতা বলে বা বসনিয়া ও ফিলিস্তিনের মুজাহিদদেরকে লেখনীর মাধ্যমে পিষে ফেলে বা কুরআন মজীদের বিকৃত তাফসীর করে, তখন তাদের সব কথাই ছাপা হয়। তাদের সেসব ছবিও পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করে, যেগুলোতে অহিদুদ্দীন খান নরসীমা রাওয়ের নিকট থেকে পদক গ্রহণকালে তাকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখছে (ছবিটি কয়েকদিন পূর্বে পত্রিকায় এসেছে, আর যে-ই

তা দেখেছে , সেই অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছে)। আজ সকালে এসব চিন্তা আমাকে তীব্রভাবে ঘিরে ধরে। আমার অন্তর কাদছিল। কারণ , মুসলমান আজ কত মজলুম অথচ তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানকারীগণ জনসমক্ষে আসতে পারছে না। একদিকে মুসলমানদেরকে জবাই করা হচ্ছে , আর অপরদিকে নিজেদের চেহারারই কিছু লোক তাদেরকে এই বলে শাসন করছে যে , জবেহের সময় তোমরা চিৎকার কর কেন ? সকাল দশটা পর্যন্ত এ বিষয় নিয়ে লেখার ইচ্ছাকে মুলতবী রাখি। তারপর সেদিনের পত্রিকা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করি। পনের মিনিট পর পত্রিকার এক কোণায় আমার চোখ পড়ে। ঐ কোণার খবরটি দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবী কেঁপে উঠছে। আমার অন্তরে ঠিক তেমনি ধাক্কা লাগে , যেমন গত বছর আমার শায়েখ হযরত আকদাছ মুফতী ওলী হাসান সাহেব (রহঃ)এর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে লেগেছিল। পত্রিকায় ভারতের মুফতীয়ে আযম হযরত আকদাছ মাওলানা মুফতী মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী (রহঃ)এর দুঃখজনক মৃত্যু সংবাদ ছিল।

إنّــا للــه وإنّــا إليــهِ رَاجعُــون.......... اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ،آمِيْن

(আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আমরা তাঁর নিকটই ফিরে যাবো। হে আল্লাহ , আমাদেরকে তাঁর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এবং তাঁর

অবর্তমানে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেল না। আমীন।)

যে সময় ভারতীয় মুসলমানদের উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চলছে এমন সময় উম্মতের মহান এই পথপ্রদর্শক এবং এমন আলোকময় ব্যক্তিত্ব চলে যাওয়া বিরাট এক দুর্ঘটনা।

হযরত মুফতী সাহেব (নাঃ মাঃ) উলামায়ে দেওবন্দের কামালাতের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন। এ যুগের অদ্বিতীয় বক্তা এবং ইসলামের মহান চিন্তানায়ক ছিলেন। আজ দেওবন্দের ফাতাওয়ার আসন এমন এক শূন্যতা উপলব্ধি করবে, যা পূর্ণ হওয়া কঠিন। মুফতী সাহেবের ইলমের উৎকর্ষতা সম্পর্কে তো আলেমগণই কিছু লিখতে পারেন। আমার মত নিরক্ষরের জন্য তো তাঁর যোগ্যতা অনুধাবন করার জন্য এ কথাই যথেষ্ট যে, তিনি মুহিরুল উলুম সাহারানপুরের ‘সদরে মুদাররিস’ (প্রধান শিক্ষক) এবং দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতী ছিলেন। পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মুফতী ওলী হাসান সাহেবও ছিলেন তাঁর ছাত্র। তিনি স্বীয় উস্তাদের ইলমী উৎকর্ষতার কথা খুব বেশী বলতেন। এ থেকে আপনারা হযরতের ইলমী মর্যাদা অনুমান করতে পারেন। আল্লাহ পাক তাঁকে অসম্ভব স্মরণশক্তি দান করেছিলেন। বৃদ্ধ অবস্থাতেও এমন ব্যক্তিকে চিনে

ফেলতেন, যার সঙ্গে একবার মাত্র দেখা হয়েছে।

এই সফরে আমি দিল্লীতে এসে জানতে পারি যে, হযরত মুফতী সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আমার অন্তর তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করার জন্য অস্থির হয়ে যায়। কারণ, আমার অন্তরে তাঁর প্রতি সীমাহীন ভক্তি ছিল। ছাত্র জমানায় জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, আল্লামা বিন নূরী টাউনে তাঁর নূরে পরিপূর্ণ আলোচনা শুনেছিলাম। যার মধুরতা আজও অনুভূত হয়। তারপর পবিত্র মক্কায় এমন মোলাকাত হয়েছিল, যা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আরও এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যা আমাকে তাঁর ভক্ত বানিয়ে ফেলে। দিল্লীতে তার সাক্ষাত করতে যাওয়া আমার জন্য সমীচীন ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আমাকে আকর্ষণ করছিল। তাছাড়া আমার এক বন্ধু সাহস জুগিয়ে বলল, সেখানে আপনাকে কে চিনবে? আমরা আপনার অন্য নাম বলে দিব। সুতরাং আমরা সোৎসাহে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির বাড়ীতে গেলাম, যেখানে হযরত অবস্থান করছিলেন। তিনি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। চতুর্দিকে ভক্ত অনুরক্তদের ভীড়। বড় বড় উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। একজন একজন করে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মুসাফাহা করছিল এবং দুআ চাচ্ছিল। হযরত তাদের বেশির ভাগকেই চিনছিলেন। তিনি জ্ঞান

ও তথ্যপূর্ণ কথা বলছিলেন। তাঁকে কথা বলতে দেখে আমি অপরিমেয় আনন্দ লাভ করি। কারণ, আমি শুনেছিলাম যে, বার্ধক্যজনিত দুর্বলতাহেতু তিনি কথা বলতে পারেন না। কিন্তু এখানে এক অপার্থিব পরিবেশ বিরাজ করছিল। তিনি কথা বলছিলেন, তাঁর কথায় আধ্যাত্মিকতা ও ইলম জীবন্ত হয়ে উঠছিল আমি তাঁর অদূরেই দোজানু হয়ে বসে যাই। আমি তাঁর মুখোমণ্ডলে ভারতের মুসলমানদের উজ্জ্বল অতীত অনুসন্ধান করছিলাম। আমি মত্ত হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তার জিয়ারতে মগ্ন ছিলাম। এ সময় আমার সঙ্গী আমাকে হযরতের সঙ্গে মুসাফাহা করতে বলে। আমি না করলাম, কিন্তু তিনি পীড়াপীড়ি করছিলেন। আমি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁর হাতের মধ্যে হাত দিয়ে মুসাফাহা করি। তিনি আমার উভয় হাত শক্ত করে চেপে ধরেন। আমি বিচলিত হয়ে পড়ি যে, তিনি আমাকে চিনে ফেলেছেন। হযরত জিজ্ঞেস করেন, আপনার নাম কি?

আমি নীরব থাকি। কারণ, সত্য বলে ফেঁসে যেতে চাচ্ছিলাম না। আর তাঁর মজলিসে সত্যের অন্যথাও বলতে চাচ্ছিলাম না। তিনি তাঁর স্বভাবের বিপরীত দুই তিনবার আমার নাম জিজ্ঞেস করেন। আমি বললাম, হযরত! আপনার নিকট দুআর জন্যে এসেছি। একথা বলে আমি পিছু হটে আসি। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, হযরত আমাকে চিনে ফেলেছেন। এবার আমি কিছুটা দূরে তাঁর দক্ষিণ দিকে দোজানু হয়ে বসে

পড়ি। অল্প পরে আমি লক্ষ্য করি যে, তিনি আমার দিকে বারবার ইশারা করে কথা বলছেন। আর কেউবা মাথা ঘুরিয়ে আবার কেউবা মাথা উঁচু করে আমাকে দেখছে। পরে জানতে পারি যে, তাদের কেউ একজন আমাকে চিনে ফেলে। সে দ্বিতীয়জনকে এবং দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনকে পরিচয় বলে দেয়। এভাবে উপস্থিত সকলে আমার পরিচয় জেনে ফেলে। তাদের কেউ কেউ আমার বয়ানের ক্যাসেট শুনেছিল। এ অবস্থা দেখে আমি সেখান থেকে সরে পড়াই নিরাপদ মনে করি। এমন না হলে আরো কত সময়ই যে হযরতের সান্নিধ্যের স্বাদ উপভোগ করতাম এবং এই মজলিস থেকে পরিতৃপ্তি লাভ করতাম তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু আজ যখন তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ পাঠ করি, তখন হৃদয় আকাশে বেদনার মেঘ ছেয়ে যায়। এখন কে তাঁর মত বন্ধুকণ্ঠে মুসলমানদেরকে বলবে, জিহাদ ফরয। ভারতে কয়েকজন লোক ছাড়া বাকী সকলে কৌশল অবলম্বনের পাঠ দান করছে, পক্ষান্তরে হযরত মুফতী সাহেব বাবরী মসজিদ শহীদ হওয়ার পর বলেন—আমার মতে বর্তমান ভারত সরকার সম্পর্কে ঐ বিধানই প্রযােজ্য, যা ইংরেজ সরকারের উপর ছিল। এখানে স্মরণীয় যে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে শাহ আবদুল আজীজ (রহঃ) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম জিহাদ ফরয হওয়ার ফতোওয়া দিয়েছিলেন।

একবার হযরত মুফতী সাহেব আফ্রিকার একটি জামে মসজিদে জুমুআর বয়ান করছিলেন। সে সময় আমিও সেখানে উপস্থিতি ছিলাম। কিছু লোকের জিহাদ সম্পর্কে সংশয় ছিল, তারা হযরত মুফতী সাহেবের খেদমতে চিরকুট লিখে জিহাদ সম্পর্কে জানতে চায়। হযরত বলেন—এ চিরকুটের উত্তর দিলে তোমরা কেউই ঘরে বসে থাকতে পারবে না।

একবার আমরা কয়েকজন সাথী মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে হযরত মুফতী সাহেবও সেখানে ছিলেন। আমাদের একজন ভারতীয় বন্ধু মুফতী সাহেবের খাস মুরীদ ছিলেন। তার সঙ্গে আমরা হযরতের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর অবস্থানস্থলে যাই। বন্ধুটি আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ইনি একজন মুজাহিদ। মুফতী সাহেব আনন্দে হাসতে আরম্ভ করেন। উষ্ণভাবে মুসাফাহা করেন। তিনি তার মুরীদকে বলেন— এরা তো মুজাহিদ, কিন্তু তুমি কি? আরে ভাই তুমিও মুজাহিদ হয়ে যাও। তাঁর কথায় আমরা স্বাদ উপভোগ করছিলাম। এমন সময় হযরত বলেন — দেখ ভাই! তোমরা জিহাদ করছো, এটা বড় বরকতপূর্ণ আমল। কিন্তু মনে রাখবে, সবসময় বিজয়ের প্রত্যাশা করবে না। কখনো বদরের যুদ্ধের মত বিজয় মিলবে, কখনো উহুদের যুদ্ধের মত বাহ্যিক পরাজয় হবে, আর কখনো বা বাহ্যিক কোন ফলাফলই দেখা যাবে না। কিন্তু পরবর্তীতে তার প্রভাব পড়বে। এর

অনেক দৃষ্টান্তই রয়েছে, সর্বশেষ দৃষ্টান্ত, হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ), তাঁর শায়েখ ও সঙ্গীদের বালাকোটে শহীদ হওয়া। এই আন্দোলনের প্রভাব পরবর্তীতে প্রকাশ পায়। মোটকথা জিহাদে ব্যর্থতা নেই।

হযরতের বাণীরূপে নূরের নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। আর আমরা তাতে হারিয়ে গিয়ে সবকিছু বিস্মৃত হচ্ছিলাম। সহসা একজন লোক এসে মজলিসের ধারাবাহিকতাকে ছিন্ন করে দেয়। তার হঠাৎ এই প্রবেশে আমি যে পরিমাণ ব্যথিত হই, জীবনে আর কিছুতেই এত ব্যথা পাইনি। লোকটি উল্টা পাল্টা কিছু প্রশ্ন করে চলে যায়। হযরত অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তার কথা শ্রবণ করেন। এ অবস্থা দেখে হযরতের মনের উদারতার উপর আমার সীমাহীন ঈর্ষা হয়। লোকটি চলে যাওয়ার পর আমরা দুআ চেয়ে বিদায় নেই। আমরা আশ্চর্য ছিলাম যে, ভারতের একজন বুযুর্গ কিভাবে মুজাহিদদের সাহস এমন বৃদ্ধি করছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর জিহাদের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসা থাকার কারণেই আমাদের মত অযোগ্যদেরকে তিনি এভাবে উপদেশ দিলেন। যে উপদেশ আজ পর্যন্ত অহর্নিশ আমাদের সহচর হয়ে আছে এবং আমাদের অন্তরে সান্ত্বনা যোগাচ্ছে।

হায়! ভারতের আধ্যাত্মিকতার মদিরাখানা আজ উদাস হয়ে আছে। আজ এমন এক নির্ভীক, নিঃসংশয় ও উদার খোদাপ্রেমের সাকী বিদায়

নিয়েছেন, এই বিরানোম্মুখ মদিরাখানার জন্য যার তীব্র প্রয়োজন ছিল। অন্তর এই দুঃসংবাদকে কোনমতেই মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু পত্রিকা তো একথাই বলছিল যে, প্রেমিক তো প্রেমাস্পদের নিকট চলে গিয়েছে। আর এমন সংবাদ প্রায়শ সত্যই হয়ে থাকে।

ভারতের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ বিধ্বস্ত অবস্থায় হলেও বাবরী মসজিদের যিয়ারত নসীব হয়। সেখানে রক্ষিত নিষ্প্রাণ, নির্বাক, নাপাক ও দুর্গন্ধময় মূর্তি দর্শন—যদিও তা দূর থেকেই হয়েছে — অন্তরে এমন ক্ষতের সৃষ্টি করে, যা এখনও মনকে অস্থির করে। অনেক সময় নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে। বিশেষত যখন আমি একদিকে এসব মূর্তিপূজারীদের জাগরণ, অপরদিকে আমার মূর্তি সংহারক জাতির মধ্যে ধ্বংসাত্মক নিদ্রা ও গাফলতের জীবাণু, সাপ ও অজগরের ন্যায় দেখতে পাই, তখন আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ অনুভব করি। হায়! আমার এই নিঃসঙ্গতা যদি দূর হত! ভারত অবস্থানকালে হযরত আকদাস মুফতী মাহমুদ হাসান (রহঃ)এর যিয়ারত আমার জন্য এক স্মরণীয় অমূল্য ও প্রশান্তিময় উপঢৌকন ছিল। যা লাভ করায় আজও আমি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করি। ভারতে কোন কোন মুজাহিদের সাক্ষাতও

স্মরণীয় হয়ে আছে। আমরা পরস্পর মন খুলে মিলিত হই। পরস্পরে অনেক কথা বলি।

ভারতে আবেগপূর্ণ কিছু উপাদানও দেখতে পাই। যেগুলো পোক্ত ও বাস্তবমুখী হওয়া জরুরী। কাঁচা ইট আর কাঁচা ফল কোন কাজের নয়, এসব সাময়িক ব্যবহার্য মাত্র। আজ সর্বত্র কাঁচা ইটের স্তুপ। এসব ইটকে হৃদয়ের উষ্ণতা, কলিজার উত্তাপ, ঈমানের জ্বালা, আমলের শক্তি এবং ময়দানের প্রশস্ততা দিয়ে কেউ যদি পোক্ত করে, তাহলে এমন শক্ত পাথরে পরিণত হবে, যেগুলো কেউ ভাংতে পারবে না। যেগুলোর আঘাত এবং প্রহার কেউই সইতে পারবে না। কিন্তু কে হবে সেই ঈমানী উত্তপ্ততার হাঁপড়? কে উত্তপ্ত করবে কলিজার এই রক্ত? কে প্রেমজ্বালার মৃত আসরকে পূনরায় জীবন্ত করবে? বর্তমানে তো রাতের আবাস, উদরপূর্তি আর বিলাসিতার চিন্তা কাউকে অবকাশই দেয় না।

সমগ্র ভারত ভিতরে ভিতরে এক আগ্নেয়গিরির মত জ্বলছে। সেখানে প্রত্যেক ঈমানদারের জীবন ধারণ বিপদসংকুল। কোন সম্মানি লোক নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কোন মানুষই সেখানকার অসুরাকৃতির নির্যাতন সহ্য করতে তৈরী নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্রাজ্য যা একান্তই প্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধ, অচিরেই তার সবকিছু সহ ধ্বসে যাবে। তবে এখন ঈমানদারদের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন

যোগ্য নেতৃত্বের। এমন নেতৃত্ব, যার উপাদানে উম্মাহর দরদ, বীরত্ব, পৌরুষ, অসীম সাহসিকতা, আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য পাগলপারা, জিহাদের জোশ এবং ইসলামের একেকটি শাখা-প্রশাখা ও তার ভাবধারার সঙ্গে ভালবাসা থাকবে। তখন উপমহাদেশের চিত্র এত দ্রুত পাল্টে যাবে, যত দ্রুত গরমের প্রচণ্ডতায় পারদ উপরে ওঠে। তখন দুশমন তাদের নিজেদের মধ্যে লড়বে, মরবে আর একে অপরকে হত্যা করবে। আর মুসলমানরা তাদের ভিক্ষার ঝুলিতে নিরাপত্তার ভিক্ষা দান করবে।

ভারত অবস্থানকালে কতক ঐতিহাসিক স্থানও দেখার সুযোগ হয়। কতক স্থান দেখে লজ্জিত হই যে, এগুলো থাকতেও আমরা আল্লাহকে ভুলে বসেছি। তারপর নিজেদেরকে ভুলে গিয়েছি। এসব স্থানের ভিত্তিপ্রস্তরে শহীদদের তাজা খুন ও আলেমদের ঘাম এখনো আত্মমর্যাদার পয়গাম শোনায়। ঘুম থেকে জাগানোর চেষ্টা করে। আর কতক স্থান দেখে দুঃখ হয় যে, এগুলো বানানোর কি বা প্রয়োজন ছিল? এসব ইমারত উম্মতকে কি দিয়েছে? এগুলো যে উম্মতকে কিছু দেয়নি, তা নিশ্চিত। বরং উম্মত থেকে অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে এবং এখনো নিচ্ছে। হায়! এসব যদি নির্মাণ করা না হত! তাহলে জমিনও শান্তি লাভ করতো, জমিনের অধিবাসীরাও শান্তি লাভ করত। হায়! আদ জাতি বড় বড়

পাহাড়ের উপর অধিক পরিশ্রম করার পূর্বে নিজেদের ছোট অন্তরের উপর যদি মেহনত করত। স্মৃতি সৌধ নির্মাণের পরিবর্তে সেই মহান সত্তার স্মরণ সৌধ যদি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করত, যার স্মরণই স্মরণিকা এবং সৌন্দর্যের মাপকাঠি।

سراپا حسن بن جاتے ہیں جس کے حسن کے عاشق
بتا اے دل!حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں

যে মহান সত্তার সৌন্দর্য -প্রেমিকের

আপাদমস্তক সৌন্দর্যে পরিণত হয় ,

হে অন্তর ! বল দেখি , সুন্দরদের সারিতে

এমন সুন্দরও কি হয় ?

ভারত অবস্থানকালে আমি কয়েকটি এলাকাও সফর করেছি, পানিপথের মাটিতে এই আশায় পা ফেলি যে, হয়ত বা মারাঠাদেরকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করানেওয়ালা কোন নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদের পদচিহ্নের উপর এই অযোগ্যর পা পড়বে। আমাদের অবস্থা এই যে, সেসব মুজাহিদগণ মারাঠাদের পুরা এক প্রজন্মকে তাদের ইসলামের শত্রুতার বীজ সহকারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর আমরা বালথ্যাকার নামক একজন মারাঠাকেই সোজা করতে পারছি না , যার হিংস্র মুখ থেকে মুসলমানদের ফোটা ফোটা রক্ত এখনও ঝরছে।

আমি আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট হযরত আকদাস হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ও তার পার্শ্বস্থ আল্লাহ পাকের ঘোষণা মত অমর জীবনের স্বাদ গ্রহণকারী হযরত হাফেজ জামেন শহীদ (রহঃ)এর মাযারেও হাজির হই। জানিনা এ সকল মহান বুযুর্গ বর্তমানের ভারত সম্পর্কে রূহের জগতে কি ভাবছেন? তাঁদের যা বলার ছিল, তা বলে গেছেন এবং যা করার ছিল তা করে গেছেন। এখন উম্মতের দায়িত্ব হলো, তারা ভেবে দেখবে, এ সকল মহান বুযুর্গের কলমের নূর এবং শহীদদের খুন থেকে তারা কি বুঝেছে এবং কি শিখেছে।

আমার ভারত অবস্থানকালের সেই মুহূর্তটি বড়ই স্মরণীয়, যখন আমি মাকবারায়ে কাসেমীতে (কাসেমী কবরস্থান) মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, উচ্চ মর্যাদাশালী, অতুলনীয় ইলম ও আমলের পাহাড় এবং জিহাদের স্তম্ভ হযরাতে আকাবেরদের কবরসমূহের মাঝে বিস্মিত, অভিভূত ও আত্মনিমজ্জিত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, যেন আসমান জমিনে নেমে এসেছে। সূর্য মৃত্তিকা গর্ভে আত্মগোপনের ব্যর্থ চেষ্টা করছে এবং ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় মাটির বুকে শায়িত আছে। কবরের ধারে হাস্যোজ্জ্বল বোর্ডসমূহে যখন দৃষ্টি পড়ে, তখন তাঁদের সম্মানিত নাম দেখে অন্তর ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে।

হুজ্জাতুল্লাহি ফিল আরয হযরত কাসেম নানুতবী (রহঃ), হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ), হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) এবং দারুল উলুম দেওবন্দের আরো নাজানি কত মহান ব্যক্তিত্ব এখানে শায়িত আছেন। প্রত্যেক কবরের পিছনে জীবন গ্রন্থের উজ্জ্বল পৃষ্ঠাসমূহের স্তুপ চোখে পড়ছিল। ফজর নামাযের পর মহাত্মাদের সেই অসাধারণ উদ্যানে যাই। আত্মবিস্মৃত অবস্থায় সময় পার হতে থাকে। সূর্যের তীব্র আলোকচ্ছটায় যখন প্রকৃতিস্থ হই, তখন সৌদী আরবের আল্লাহ প্রেমের বেদনাপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী, যুগের এক মহাখতীবের আওয়াজ আমার কানে ধ্বনিত হতে থাকে। আর হৃদয় বীনাকে সজাগ করতে থাকে। তিনি বলছিলেন, “আল্লাহওয়ালাগণ আল্লাহর ভালবাসা, তার যিকর এবং তার সঙ্গে বিশ্বস্ততাপূর্ণ জীবন যাপনের বদৌলতে মৃত্যুর পর এক অপূর্ব ও বিস্ময়কর প্রকৃত জীবন লাভ করে থাকেন। এমনকি আমাদের মত দুনিয়ার মোহে মৃত হৃদয়ের অধিকারী লোকেরাও যখন সেসব আল্লাহওয়ালাদের কথা আলোচনা করি, তখন আমাদের জীবনেও অপার্থিব জীবনের উষ্ণতার স্বাদ লাভ করি।” তার বক্তব্যের মোটামুটি অর্থ তুলে ধরা হলো। এমনই এক অবস্থা তখন আমার উপরও বিরাজ করছিল। সেই ভাবময় মুহূর্তে আমার অন্তরের বিচিত্র উত্থান পতন হচ্ছিল। অপূর্ব আবেগ, অপূর্ব কল্পনা ও অপূর্ব উৎসাহ অন্তরে বিকশিত হচ্ছিল। আমার

চতুর্পার্শ্বে সেসব লোকের কবর রয়েছে, যাঁরা সফল, স্বার্থক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ মহান জীবন অতিবাহিত করে আপন রবের নিকট চলে গেছেন এবং পিছনে নিজেদের জন্য অনেক কিছুই রেখে গেছেন।

তারা আমাদের মতই মানুষ ছিলেন, কিন্তু এমন কাজ তারা করে গেছেন, যা চিন্তা করলে ঘাম ঝরে। হৃদয় বিস্ময়ের আবর্তে ডুব দিতে থাকে। এ সকল আকাবির তাওহীদের দায়ী এবং সুন্নাতের আশেক ছিলেন। আমি তাঁদের কবরের সম্মুখে হাত উঠিয়ে দুআ করলে তাঁদের শিক্ষার পরিপন্থী হত, যদিও তা নিশ্চিতভাবে আল্লাহর দরবারেই উঠত, কোন কবরওয়ালার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু দর্শনার্থীদের ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা রয়েছে। তারা রব থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে কবরপূজারী হয়ে যাবে। তাই আমি হাতের পরিবর্তে অন্তরকে সেই রবের দিকে রুজু করি, যে রব এঁদেরকে এমন উৎকর্ষতা দান করেছেন। তার সমীপে নিবেদন করি—প্রভু হে! আমার মত অসহায়কেও আকাবিরদের নিসবতে কামিয়াব কর।

এই সফরকালেই ইলম সম্রাট, হাদীসে রাসুলের যথার্থ ভাষ্যকার, ইমামুল আসর হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ)এর কবরেও হাজির হওয়ার সৌভাগ্য হয়। ইলমের এই মহান সম্রাট, মেধা ও প্রতিভার অমূল্য রতন আজ মাটির নীচে বিশ্রাম করছেন। আমার

কারারুদ্ধ জীবনে হযরতের প্রণীত গ্রন্থ ‘ফয়জুল বারী’ আমার সঙ্গী হয়। আমার এই অভিযোগ ঐ কিতাব খণ্ডন করে দেয় যে, সবাই আমার কাছেই পাঠ গ্রহণ করছে, কিন্তু আমাকে পাঠদানকারী কেউ নেই। গাঙ্গুহতে যাই। সেখানে দ্বিতীয় ইমাম আবূ হানীফা, কুতবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)এর মাযারে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। কবর সংলগ্ন মসজিদে নামায আদায় করি, মন ও মগজ হযরতের ইলমী, রূহানী ও জিহাদী কৃতিত্বে সুরভিত হয়। আমি ভারতে এমন অনেক কিছুই দেখছিলাম। কিছু কাজও করছিলাম কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভূখণ্ড (কাশ্মীর) থেকে আলমে ইসলামের এক হাস্যমুখর মুজাহিদ, নির্ভীক সিংহ, এ যুগের ‘জররার’ (সাহাবী জররার বিন আযওয়ার) (সাজ্জাদ আফগানী) আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, আর তা হলো কিছুদিন পূর্বে তার আহবানের উত্তরে (কাশ্মীর উপস্থিতির) যে প্রতিশ্রুতি আমি তাকে দিয়েছিলাম।

কাশ্মীর সফরের প্রস্তুতি ভারতের এই সফরের কিছুদিন পূর্বে আমি একটি আরব রাষ্ট্রে অবস্থান করছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে টেলিফোনে আমার কমাণ্ডার সাজ্জাদ খানের সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ হয়। আমাদের উভয়ের সম্পর্ক ছিল বহু

পুরাতন ও উষ্ণতাপূর্ণ। তিনি সবিস্তারে কাশ্মীরের বেদনাপূর্ণ আলেখ্য, নতুন পরিস্থিতি, ঘটনাবলী এবং পর্যবেক্ষণের ফলাফল আমাকে শোনান। তিনি পূনরায় এই অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রীয় নেতাগণ রণাঙ্গনে আসেন না কেন? জিহাদের দাওয়াত কি শুধু কর্মীদের জন্যই? জিহাদের ময়দানের সুখ-দুঃখ কেন্দ্রীয় নেতাদের জন্য নয় কি? পদ ও নেতৃত্বের রশি, গলার ফাঁদ এবং রণাঙ্গনের পথের প্রতিবন্ধক হয় কেন? তার অভিযোগ ছিল যথার্থ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি গোলাগুলির বজ্রধ্বনি থেকে দূরে ফাইল আর মিটিং নিয়ে জড়িয়ে থাকে, তখন ভীরুতা, দুনিয়াপ্রীতি ও অলসতা তাদের শিরা-উপশিরায় বিস্তার লাভ করে। আল্লাহর সিংহ তখন পরিবেশের আঘাতে খরগোশে পরিণত হয়। তখন পদে পদে অতীতের জিহাদ এবং বিগত দিনের সামরিক অভিজ্ঞতাকে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে, মান বাঁচানোর জন্য এবং খ্যাতি লাভ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। পুরাতন পদক ও পুরস্কার দেখিয়ে এবং পুরাতন যুদ্ধের ঘটনাবলী শুনিয়ে বিশ্বাস করানো হয় যে, আমিও এক সময় রক্তপায়ী যুদ্ধবাজ ছিলাম। সামরিক কর্মকাণ্ড আমাদের গৃহদাসী আর যুদ্ধ পরিচালনা আমাদেরই কর্ম ছিল। কিন্তু আমরা যদি পূনরায় রণাঙ্গনে চলে যাই, তাহলে মুজাহিদদের নেতৃত্ব দেবে কে?

খরগোশ হৃদয় এসব দিশারী যখন সিংহ হৃদয় মুজাহিদদের নেতৃত্ব দান করে, তখন জিহাদকে বিদ্রুপ করা হয়, আন্দোলন বন্ধ্যা হয়ে যায় এবং মুজাহিদগণ ক্রমেই উন্নত গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

আল্লাহর সিংহ কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান টেলিফোনে আমাকে কাশ্মীরের রণাঙ্গনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান আর তার উপকারিতা তুলে ধরেন। আমাদের এই কথোপকথন দীর্ঘদিনের বন্ধু আবরার হক্কানীর সম্মুখে হচ্ছিল। আমার জানা নেই, বর্তমানে তিনি কোথায় আছেন। সে সময় তিনি মুজাহিদদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে একটি আরব রাষ্ট্রে কাজ করছিলেন। কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান তার সঙ্গেও কথা বলেন। আমার ভাল মতই স্মরণ আছে, আমি কমাণ্ডার সাহেবের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি একান্ত সত্য প্রতিশ্রুতি ছিল। আমি বলেছিলাম, ইনশাআল্লাহ আমি অবশ্যই কাশ্মীরে উপস্থিত হব। রণাঙ্গন প্রত্যক্ষ করব। সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে মোলাকাত হবে এবং কাশ্মীরের ব্যথা আমি কাছে থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পাব। সেই কথাবার্তার পর তার দাওয়াতকে হৃদয়ে বহন করে আমি দেশে দেশে নগরে নগরে সফর করতে থাকি। কাশ্মীর যাওয়ার জন্য আমার সামনে পথ ছিল কয়েকটি। খোদ কমাণ্ডার সাজ্জাদ খানকে দ্বিতীয় বার কাশ্মীর যাওয়ার জন্য

আমি নিজে অপর একটি দেশ হয়ে ভারতের বর্ডার পর্যন্ত ছেড়ে আসি। সে বর্ডার এখনো উন্মুক্ত আছে এবং ইনশাআল্লাহ জালেমরা ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে।

ইতিমধ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় সেই ঐতিহাসিক বৈঠক হয় এবং আমার কাশ্মীর যাওয়ার আরেকটি পথ খুলে যায়। ভারতে এসে কমাণ্ডার সাজ্জাদ খানের সঙ্গে ফোনে কথা হয়। তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভূখণ্ডে ইসলামী গায়রতের সুউচ্চ বৃক্ষ ছিলেন। সে সময়েই তিনি ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীর সত্ত্বর কর্নেল হবে এমন একজন মেজর—মেজর ভূপেন্দ্র সিংকে অপহরণ করে ভারত সরকারের নিকট দাবী জানান যে, কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ মানসূর লেংড়িয়ালকে মুক্ত করে দাও। সে সময় আমি দিল্লীতে অবস্থান করছিলাম। কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান আর ইণ্ডিয়ান আর্মীর মধ্যে ইসলামাবাদ (অনন্তনাগ) অঞ্চলে সংঘর্ষ চলছিল। সরকার কমাণ্ডার সাজ্জাদ খানকে জীবিত বা মৃত ধরে দেওয়ার বিনিময়ে বিরাট অংকের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। আমি দিল্লী থাকা অবস্থায় ভূপেন্দ্র সিং মুজাহিদদের হাতে মারা পড়ে। সরকার তার খুনের জন্য সাজ্জাদ খানকে দায়ী করে। আমী, বিএসএফ, আইবি, সিআইএ এবং গোয়েন্দা কর্মীরা কমাণ্ডার সাজ্জাদ খানকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল।

ওদিকে কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান স্বভাবসুলভ অতি প্রশান্তির সঙ্গে শ্রীনগর, ইসলামাবাদ (অনন্তনাগ) ও অন্যান্য অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছিল। গাড়ী হাঁকিয়ে কোপওয়াড়া থেকে শুরু করে হিন্দুওয়াড়া পর্যন্ত তার অধীনস্ত মুজাহিদদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। আমি দিল্লী পৌছায় তার মধ্যে এক নতুন উত্তেজনা কাজ করে। প্রথমে তিনি নিজেই আমাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিল্লী সফর করার সংকল্প করেন, কিন্তু একনিষ্ঠ বন্ধুগণ তার এই সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করে এবং পরিস্থিতির জটিলতার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সাজ্জাদ খান ছিলেন দৃঢ় সংকল্পী এবং কাজে আপোষহীন। মুখ থেকে বের হওয়া কোন কথা থেকে পিছু হটা তার জন্য পর্বত বহন করার মতই জটিল ছিল। তার উপর তার আত্মাভিমানী যুদ্ধবাজ কবিলার ব্যাপক প্রভাব ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অপূর্ব গুণাবলীর অধিকারী। ইসলাম বা শরীয়াতের নাম আসলেই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে বসতেন। অথচ সে জন্যে তাকে ভিতরে ভিতরে তীব্র মুজাহাদা করতে হত। যার লক্ষণ তার নূরানী চেহারায় ভেসে উঠত। এ সময়ও সঙ্গীরা অতি কষ্টে দিল্লীর সফর থেকে বিরত থাকার জন্য তাকে সম্মত করায়। আমাকে দিয়েও এ ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করানো হয়।

পরিশেষে তিনি মেনে নেন যে, তিনি শ্রীনগরে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন, আর আমি অপর একজন পথপ্রদর্শকের সঙ্গে সেখানে যাব। আমার পথপ্রদর্শক সফরের প্রস্তুতি শুরু করেন। সে সময় অধিকৃত কাশ্মীরের কয়েকজন সম্মানিত লোক দিল্লী এসেছিলেন। তাদের কেউ কেউ আমার কাশ্মীর যাওয়াটা সমীচীন মনে করছিলেন না। তারা একে একটি বিপদজনক পদক্ষেপ মনে করছিলেন। অপরদিকে কেউ কেউ এই সফরের জোরাল সমর্থক ছিলেন। মুজাহিদদের আহার-বিহারের সঙ্গী সম্মানিত এই পৃষ্ঠপোষকগণ আমার সফরের বিস্তারিত কর্মসূচীর ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। প্রস্তুতির কাজও সহজে সম্পন্ন হয়। কাশ্মীর জিহাদ চালু আছে বিধায় এ সম্পর্কে সবিস্তারে বলতে আমি অপারগ। রাতে আমাকে জানানো হয় যে, কাল সফর হবে। দুপুরে যাত্রা করা হবে। শ্রীনগর যাওয়ার পথে জম্মুতে সংক্ষিপ্ত অবস্থান হবে।

রাতে আমি হোটেলের কক্ষে রুমাল বিছিয়ে সেই মালিকের দরবারে কল্যাণ কামনার (ইস্তেখারার) উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারিত করি, যাঁর অনুকম্পা, অনুদান, নেয়ামতরাশি আর আমার ত্রুটি ও বিচ্যুতি দেখে সর্বদা লজ্জার উদ্রেক হয়, অনুতাপ হয় এবং ভয়ও পাই। দ্বীনী কাজের ব্যস্ততার ওজর দেখিয়ে আমরা তাঁর স্মরণ থেকে কত গাফেল হয়ে থাকি। তারপরও প্রতি সংকটে তিনিই রাস্তা খুলে

দেন। তাঁরই সাহায্য লাভ করি। হে আল্লাহ আপনার সঙ্গে যেন বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততা পোক্ত হয়। প্রতিটি বাস তাঁর স্মরণে সুরভিত হোক , তাহলে বিষাদগ্রস্ত এই হৃদয় শান্তি লাভ করবে। কারাপ্রকোষ্ঠে বসে আমার এই অবস্থাই নিচের এই কবিতায় চিত্রিত করেছি।

اس کی □مت دیکھتا □وں کچھ سنبھل جاتا □وں میں
نا امیدی منہ□ چھپا کر بھاگتی ہے دور دور
پھر نظر جب خود پہ□ پڑتی ہے تڑپ جاتا □وں میں
ہائے منزل مجھ س□ ن□ تھی اس قدر تو دور دور
হেরে তব করুণারাশি সাহসে দাঁড়িয়ে যাই ,
নিরাশা হারিয়ে যায় দূরে বহু দূরে।
দেখে মম পাপরাশি অস্থিরতায় হারিয়ে যাই।
হায় ! গন্তব্য ছিল না তো , দূরে এত দূরে।

হোটেল কক্ষ ছিল আধো অন্ধকার , আমি হাত প্রসারিত করে বার বার ইস্তেখারার দুআ পাঠ করছিলাম। আমার প্রিয় রব মহান আল্লাহর নিকট তার ইলম , কুদরত ও অসীম রহমতের উসীলা দিয়ে তারই সমীপে কল্যাণ কামনা করছিলাম। যে কল্যাণের আমি মুহতাজ , তিনি সেই কল্যাণের স্রষ্টা। আমি আল্লাহ তাআলাকে তাঁর বিশাল অনুগ্রহের উসীলা দিয়ে অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছিলাম। সে অনিষ্ট , যা থেকে বাঁচার আমি মুখাপেক্ষী আর তিনি তা প্রতিহতকারী।

দুনিয়ার প্রতিটি কাজ , প্রতিটি উদ্দেশ্য , প্রত্যেক আবাস-প্রবাস এবং প্রত্যেক

পরিস্থিতি ও অবস্থা, কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে ঝুলন্ত থাকে। একমাত্র আল্লাহর মহান সত্ত্বাই কল্যাণ দান করতে পারেন, আর অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে পারেন। কল্যাণ একটি নেয়ামত, একটি জরূরত। সেই তা লাভ করে, যে তা লাভ করতে চায়। যে নিজে কল্যাণকামিতা ও কল্যাণ সন্ধানের আবেগে মত্ত থাকে এবং প্রতি পদে শুধুমাত্র কল্যাণের সন্ধানকারী হয় এবং কল্যাণ বিতরণকারী হয়। ইস্তেখারার অর্থও কল্যাণ চাওয়া, কল্যাণ কামনা করা, আর কল্যাণ তালাশ করা। আমি দুআ করছিলাম—হে আমার রব! আমার সফরকে আমার জন্য, মুজাহিদদের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য, দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণকর বানাও।

সফর ছিল মাত্র তিনদিনের। দুআ করা হয়েছে অতি বড়। মাত্র তিন দিনে নিজের জন্য, মুজাহিদদের জন্য এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ সঞ্চয় করা নিশ্চয় একটি দুরূহ কাজ। এমন সার্বিক কল্যাণ তো বছরের পর বছর সাধনা করে, মুজাহাদা করে, আর পরিশ্রম করেই লাভ করা যায়। কিন্তু দুআ করার সময় আমার এদিকে লক্ষ্য ছিল না। হৃদয়ের আকুতি মুখ দিয়ে বের হতে থাকে। আর আমার সংক্ষিপ্ত সফর দীর্ঘ করার ব্যবস্থা হয়ে যায়। রাত পার হয়ে যায়। পরদিন জোহর নামাযের পর তৈরী হই। পোশাকের সামান্য পরিবর্তন হিন্দুস্তানী পাকিস্তানীর

পার্থক্য একেবারে মিটিয়ে দেয়। খায়বার থেকে পেশওয়ার, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং অটাক দরিয়া থেকে আমু দরিয়া এ সম্পূর্ণ অঞ্চল এক সময় মুসলিম বিজয়ীদের অভিযান আর মুসলমান শহীদদের রক্তের বিনিময়ে একক ভূখণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পুরা অঞ্চল ইসলামের রঙ্গে রঙ্গীন হয়। পরবর্তীতে এ অঞ্চল ভেঙ্গে চুরে বান্দরের ভাগাভাগির শিকার হয়। কিন্তু প্রবাহিত পানির উপর দাগ কাটলে তা যেমন স্থায়ী হয় না, এমনিভাবে মাটি আর নদীর জখমও স্থায়ী হয় না। তা দ্রুত ভরে যায়। ইনশাআল্লাহ, এ সমস্ত অঞ্চল পূনরায় পবিত্র হবে। এরা পূনরায় ইসলামের সৌন্দর্যমালার সমুজ্জ্বল মুক্তা হবে। আমি ঘর থেকে বের হচ্ছি এমন সময় একজন কাশ্মীরী বুযুর্গ আমাকে জড়িয়ে ধরেন। বুকের সাথে বুক লাগান। তার নয়ন যুগলের অশ্রুধারা তার শশ্রুসিক্ত করছিল। সে ফুপিয়ে ফুপিয়ে বলছিল—আল্লাহ হিফাজত করুন। আপনার মর্জী, কিন্তু আমার পরামর্শ এখনো এই যে, আপনি এই সফরের ব্যাপারে পূনরায় ভেবে দেখুন।

দিল্লী বিমান বন্দরে
মুজাহিদদের নির্ভীক সহযোগী সেই কাশ্মীরী বুযুর্গ জোরাজোরি করেননি ঠিক, কিন্তু স্পষ্টভাষায় আমাকে কাশ্মীর যেতে বারণ করেছেন। তার তখন হজ্জের সফরের ইরাদা ছিল।

তার স্ত্রীর জিহাদী কর্মকাণ্ডের বৃত্তান্ত আমি শুনেছিলাম। আমি সেই মহিয়সী নারীর নির্ভীকতা ও বীরত্বের কথা স্বীকার করতাম। পরিবারটি তাদের সফল বাণিজ্যের বদৌলতে যথেষ্ট বিত্তশালী ছিল। তাদের সকল সম্পদ মুজাহিদদের খিদমতে ওয়াকফ ছিল। ভারতীয় বাহিনী তাদের দিকে কয়েকবার সন্দেহের অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কয়েকবার বাড়ী ঘেরাও করে তল্লাশী চালায়, কিন্তু মহিলার কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার কারণে মুজাহিদদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি গোপনই রয়ে যায়। আমার নিকট সেই বুযুর্গের পীড়াপীড়ির গুরুত্ব ছিল অনেক। কিন্তু সফর মুলতবী করা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেই এবং বুঝাই যে, এখন শুধুমাত্র দুআ করার সময়, আর কিছু করার নেই। তারপর আমি তাকে আশান্বিত করার জন্য কিছু ফযীলত ও গুরুত্বের কথা শুনাই। আমার কথা শুনে তিনি নীরব হয়ে যান এবং অসংখ্য দুআ তার মুখ থেকে ফুয়ারার ন্যায় বের হতে থাকে।

ইনি হলেন দ্বিতীয় বুযুর্গ, যিনি আগত বিপদের জন্য সময়ের পূর্বেই অশ্রু বর্ষণ করেন। ইতিপূর্বে হযরতে আকদাস মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)এর কবরে একজন বুযুর্গের সাক্ষাৎ পাই। সম্ভবত তিনি কবরস্থান দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করি, তখন তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে জোরে জোরে কাঁদতে থাকেন। আমরা কেউই তার কান্নার কারণ বুঝতে পারিনি। সে বারবার আমার মুখ দেখছিল আর সমবেদনা ও ভালবাসার আবেগ বিগলিত হয়ে তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি দু চার বার কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তার শব্দ গলায় আটকে যাচ্ছিল। সময়ের সংকীর্ণতার কারণে আমরা অন্যত্র যাত্রা করি। আমরা গাড়ীতে উঠে বসার পর আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সে দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে আর যার যার হয়ে কাঁদছে। আমি বন্দী হওয়ার পর তো অনেক মানুষই কেঁদেছে এবং আকাবিরদের সম্পর্কেও জানতে পেরেছি যে, তাঁরাও অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। কিন্তু বন্দী হওয়ার পূর্বে এই দুই বুযুর্গ কেঁদেছিলেন, যাদের আলোচনা নিঃসংকোচে আমি উল্লেখ করলাম। আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর বিশেষ ভালবাসা দান করুন।

ঘর থেকে বের হয়ে আমরা দিল্লীর বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা করি। আমি আমার সফরসঙ্গীর নিকট থেকে বিমান বন্দরের অবস্থা অবগত হতে থাকি। তিনি বললেন— ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে কেউ চিনতে পারবেনা। প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা খুব উৎকৃষ্টমানের। বিমান বন্দর পৌঁছে আমি ওয়েটিং রুমে বসে থাকি। আমার সফরসঙ্গী

বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহের জন্য কাউন্টারে চলে যান। বিমান বন্দরের অভ্যন্তরাংশে জনসমাগম ও তাদের হৈচৈয়ের কারণে মাছের বাজারের দৃশ্য বিরাজ করছিল। মদের আধিক্য সমগ্র ভারতকে দুর্গন্ধময় করে রেখেছে। এখানেও এই নাপাকীর ব্যবহার চলছিল। সরকারী লোকেরা সর্বদা মদের তালাশে বা তার মত্ততায় বিভোর থাকে। কেউ তা পাওয়ার চিন্তায় লেগে থাকে, আর যে পেয়ে যায়, সে এই পরিমাণ পান করে যে, তার আর হুঁশ থাকে না। সকল পাপের মূল এই মদের শিকার মানুষ বিমান বন্দরে প্রচুর পরিমাণে ছিল। আল্লাহ তাআলা ইসলামী দেশসমূহ এবং মুসলমানদেরকে এই অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন। মদ ও এইডস ভারতকে ভিতর থেকে একেবারে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলেছে।

বিমান বন্দরের এই হৈহুল্লোড়ের মধ্যে আমি একটি সোফায় বসে চিন্তার জগতে হারিয়ে যাই। সে সময় আমি আমার নিজের বাড়ী থেকে বহুদূরে, দুশমনের একটি বিমান বন্দরে নিরস্ত্র অবস্থায় রণাঙ্গনের দিকে চলছি। আমি কাশ্মীরের সেই ভূখণ্ডের দিকে যাত্রা করছি, যেখানে দুশমনের লাখ লাখ সৈন্য মওজুদ রয়েছে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার জন্য আমার নাম ও আমার কণ্ঠস্বর অপরিচিত ছিল না। তবে তারা আমার আকৃতি ও চেহারার ব্যাপারে অবশ্যই অনবহিত ছিল। একে কাজে লাগিয়ে আমি এই বিপদজনক সফরের জন্য অগ্রসর হই।

পোশাকের সামান্য পরিবর্তন আমাকে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে একাকার করে দেয়। কিন্তু আমার অন্তর পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ছিল না। একজন মুজাহিদের জন্য নিরস্ত্র হয়ে দুশমনের ভূখণ্ডে চলাফেরা করা সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া আমার মুখমণ্ডলের পূর্ণ ও ঘন দাড়ি যে কোন সচেতন সরকারী লোককে আমার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। উপরন্তু এ বিষয়টি আমার বোধগম্য হচ্ছিল না যে, লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বর্তমানে মুজাহিদদের সঙ্গে কিভাবে মোলাকাত হবে। শ্রীনগর বিমান বন্দর থেকে বাইরে বের হওয়া কিরূপে সম্ভব হবে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে মুজাহিদদের ঠিকানায় কি করে পৌঁছা যাবে। শ্রীনগরে অবস্থানরত মুজাহিদগণ আমাকে বলেছিলেন যে, এ সবকিছুই সম্ভব।

সীমিত সংখ্যক পর্যটকদের যাতায়াত চালু থাকার কারণে বিমান বন্দর সংরক্ষিত রয়েছে। লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্যদের উপস্থিতিতে আল্লাহর সাহায্যকে সঙ্গে করে মুজাহিদরা সর্বত্র চলাফেরা করে থাকে। তবে জটিলতাও রয়েছে। কিন্তু ইসরাইলের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ভারত এখনো পর্যন্ত মুজাহিদদেরকে নিরস্ত্র করতে পারেনি। সেনাবাহিনী ও বিএসএফ এর কেন্দ্রসমূহ পর্যন্ত মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়। পরিস্থিতি এমন যে, কারো

অন্তরে বক্রতা থাকলে সে নির্দ্বিধায় বলে ফেলবে যে, আল্লাহ না করুন মুজাহিদরা দুশমনদের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। অন্যথায় যে শহরের প্রত্যেক চৌরাস্তায় সেনা বাঙ্কার, প্রত্যেক মহল্লায় সেনা ক্যাম্প, প্রত্যেক গলিতে সেনা টহল এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনা পাহারা বিদ্যমান, মুজাহিদগণ সেখানে আক্রমণের পরিকল্পনা করা তো দূরের কথা, সেখানে তো পাখির ডানা ঝাপ্টানোও কল্পনা করা যায় না। আজ যেমন সংকীর্ণমনা কিছু মানুষের এ কথা বুঝে আসে না যে, দুশমনের কারাগারে বসে একজন মুসলমান কি করে কিতাব লিখতে পারে। এমনিভাবে কিছু মানুষের শ্রীনগর ও অন্যান্য শহরে মুজাহিদদের দৃঢ় কর্মতৎপরতাও বোধগম্য হয় না! বিমান বন্দরে আমি নিজেও এ বিষয়টি ভাবছিলাম। কিন্তু আল্লাহর শক্তি এবং মুজাহিদদের সততার উপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। তাই আমি ভয়ের চেয়ে অধিক বিস্ময় অনুভব করছিলাম। বিমান বন্দরে দুশমনের গাফলতির সুযোগে আরো বেশি কিছু করার পরিকল্পনা করছিলাম।

জানি না কতক্ষণ আমি বাস্তব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কল্পনার জগতে হারিয়ে ছিলাম। অকস্মাৎ আমার কানে ‘মাওলানা’ শব্দ বাড়ি খায়। আমি ঘাবড়ে গিয়ে ডানে বামে দেখতে থাকি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছে তা বুঝতে পারি। আমি

দেখি যে, দুইজন তরুণ দূর থেকে আমাকে ডাকতে ডাকতে পাগলের ন্যায় অগ্রসর হচ্ছে। তারা কাছে আসলে আমি দাঁড়িয়ে যাই। উভয়ে পালাক্রমে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। তারা এখনো জোরে জোরে কথা বলছিল, আমি তাদের একজনের হাতে চাপ দিয়ে একদিকে সরিয়ে নিয়ে বলি, এখানে আমি মাওলানা নই। আপনারা জোরে কথা বলবেন না। কারো কাছে পরিচয়ও প্রকাশ করবেন না। তরুণদ্বয় বৃটেন থেকে এসেছে। এখন তারা দিল্লীর আহমদাবাদ যাচ্ছে। তারা বৃটেনে সরাসরি আমার বয়ান শুনেছে। আমার নিবেদনের পর তারা পরিস্থিতি অনুধাবন করে এবং দ্রুত ডানে বামে সরে পড়ে। এ ঘটনায় আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ি। আমি বুঝতে পারি যে, আমাকে এখনো চেনা যাচ্ছে।

উদাস আকাশ
আমার এই সফর ছিল ‘জিহাদ’-এর উদ্দেশ্যে। আর ‘জিহাদের সফর ক্ষুদ্র বিপদ ও আশংকার দরুন ব্যর্থ হতে পারে না। এ ধরনের সফরের দৃশ্যসমূহ আকর্ষণীয় এবং জটিলতাসমূহ ভাবপূর্ণ হয়। বিমান বন্দরে যে দুই বন্ধু আমাকে চিনে ফেলে, এতক্ষণে তারা দূরে চলে গেছে। আমি আমার আসন ছেড়ে ডানে বামে হাঁটাহাটি করে অন্য একটি চেয়ারে গিয়ে বসি। কিছুক্ষণ পর আমার সফরসঙ্গী বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ফিরে আসে। আমরা আমাদের হাত ব্যাগ তুলে নেই এবং তল্লাশীর পর অপর একটি

হলকক্ষে যাই। ইতিমধ্যে জম্মু ও শ্রীনগরগামী বিমানে যাত্রী আরোহণের ঘোষণা হয়। আমরা একটি বাসে করে ফোকার জাতীয় একটি বিমানের নিকট পৌছি। বিমানের সিট ছিল খুব ছোট, কিন্তু ভীড় না থাকার কারণে যাত্রীরা আয়েশ করে বসেছিল। আমি খালি হাতে (নিরস্ত্র) এয়ার ইণ্ডিয়ার এই বিমানে আরোহণ করি। আমি জানতাম, যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। মুখে দুআ পাঠ করছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় যে, দুশমনের বিমানে চড়ে আমি যখন রণাঙ্গনে যাচ্ছি, তখন আমার মুখে সেসব আয়াত পঠিত হচ্ছে, যেগুলো হিফাজতের জন্য পাঠ করা হয়। আর যখন আমি দুশমনের বিমানে চড়ে মুক্তির জন্য কান্দাহারে আসছিলাম, তখন আমার মুখ সেসব আয়াত পাঠে ব্যস্ত ছিল যেগুলো বিপদ থেকে মুক্তিলাভকালে শুকরিয়া স্বরূপ পাঠ করা হয়। নিঃসন্দেহে এমন সকল দুআই কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছে, যা একজন মানুষের জন্য ইহ-পরকালে প্রয়োজন হতে পারে।

বিমান তার সফরের প্রথম পর্যায় শেষ করে জম্মু অবতরণ করে। জম্মুর যাত্রীরা বিমান থেকে নেমে যায়। নতুন কিছু যাত্রী শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে আরোহণ করে। বিমানের জানালা দিয়ে জম্মুর ছোট বিমান বন্দরটি দেখা যাচ্ছিল। আজ আমার চোখ খোলা ছিল। আর আমি চতুর্পাশ্বের দৃশ্য ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম (এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে,

মানুষের জন্য তার মুক্ত হাতকে মূল্যায়ন করা উচিত এবং মুক্ত হাত দ্বারা তাড়াতাড়ি উত্তম ও সুশৃংখল কাজ সম্পাদন করা উচিত। কারণ, কখন হাত বাঁধা পড়ে যায়, তা তো জানা নেই।) কিন্তু এই সফরের তিন বছর পর আমাকে যখন দিল্লীর তিহার কারাগার থেকে জম্মুতে আনা হয়, সে সময় বিমানে আমার চোখ ও হাত ছিল বাঁধা। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। এমনিভাবে মুক্তি লাভের দিন যখন আমাকে ‘কোট ভলওয়াল’ কারাগার থেকে জম্মু বিমান বন্দরে আনা হয়, সে সময়ও আমার চোখ হাত বাঁধা ছিল। স্বাধীন অবস্থায় খোলা চোখে জম্মুর এই দৃশ্য আমি শাবান মাসের শেষ দিনগুলোতে অবলোকন করছিলাম। অপর দিকে চোখ বন্ধ অবস্থায় জম্মু বিমান বন্দরে দুইবারই আসা হয়েছিল পবিত্র রামাযান মাসে।

প্রায় বিশ মিনিট বিমান জম্মু বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকে। সে সময় আমি ঘুনাক্ষরেও একথা কল্পনা করিনি যে, আমার জীবনের আগামী কয়েকটি বছর এই শহরের একটি কারাগারে অতিবাহিত করতে হবে। বিমান জম্মু থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে উড়ে চলল, আমি সাধারণভাবে বিমানের যাত্রীদেরকে পর্যবেক্ষণ করি। বিমানের বেশির ভাগ যাত্রী জম্মুতে নেমে গেছে। এখন বিমানটিতে একদল বিদেশী পর্যটক, কয়েকজন বয়স্ক কাশ্মীরী ও আমরা দু’ সাথী বসেছিলাম। বিমান

থেকে দেখা পৃথিবীর দৃশ্য ছিল অপূর্ব এবং নজরকাড়া।

দুধের মত স্বচ্ছ জলপ্রপাতসমূহ, সবুজ চাদর পরিহিত উচু উঁচু পাহাড়, সুদূর বিস্তৃত সবুজ শ্যামল প্রান্তর এবং জায়গায় জায়গায় তুষার স্থূপ অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এই সফরের কয়েক দিন আগের একটি সফরে আমাদের বিমান যখন নেপালের কাঠমুণ্ডু শহরে অবস্থিত বিশ্বের উচ্চতম চূড়ার নিকট পৌঁছে, তখন বিমানের বেশির ভাগ যাত্রী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানালায় মাথা লাগিয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল। তাদের মধ্যে থেকে যে বরফাচ্ছাদিত সুউচ্চ চূড়াটি দেখতে পাচ্ছিল, সে পুলকিত হয়ে অন্যকে দেখানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু আজকের এই সফরে নেপালের চেয়ে অধিক সুন্দর কাশ্মীরের বরফাচ্ছাদিত চূড়া দেখার জন্য কেউই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে না। আর কেউই এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করে উল্লাস প্রকাশ করছে না।

জ্বি হ্যাঁ, কাশ্মীরের অলিতে গলিতে জুলুম ও বর্বরতার যে ভয়ংকর খেল খেলা হচ্ছে, তা কাশ্মীরের জমিনকে তো বটেই আকাশকে পর্যন্ত বিমর্ষ ও ভারী করে দিয়েছে। এখন এখানকার প্রত্যেককে দেখা যায় সন্ত্রস্ত। মানুষের দৃষ্টি সুন্দর দৃশ্যের পরিবর্তে সুন্দরের এই লীলাভূমিতে সৃষ্ট সেই ভয়ংকর

আগুনের উপর নিবদ্ধ, যার লেলিহান শিখা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে গ্রাস করে চলছে।

শ্রীনগরের একটি বাড়ীতে বিমান ইতিমধ্যে শ্রীনগরের বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। জানালার মধ্য দিয়ে বিমানবন্দরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় আর্মিদের বাংকার ও চেকপোস্টসমূহ শহরটির বিপদগ্রস্ত হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। অনেক লোক সাদা উর্দি পরে ঘোরাফেরা করছে। বিমানে সিড়ি লাগানো হলে যাত্রীরা নামতে শুরু করে। সাদা উর্দি পরিহিত দু’জন লোক সিড়ির ডানে ও বামে দাঁড়াল। অবতরণকারী প্রতিটি যাত্রীকে তারা গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে। আমি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ধাক্কা তীব্রভাবে অনুভব করি। কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রনে রেখে নির্বিঘ্নে তাদেরকে অতিক্রম করে যাই।

আমরা বিমানবন্দরের লাউঞ্জে পৌছে দেখি সেখানেও সাধারণ লোকের চেয়ে সৈন্যের সংখ্যাই বেশি। লাউঞ্জের মধ্যেও অনেকগুলো বাংকার তৈরী করা হয়েছে। আমরা আমাদের সামানাপত্র হাতে নিয়ে বিমানবন্দরের বাইরে পা রাখি। মনে হচ্ছিল যেন আমরা শ্রীনগরে নয়, বরং কোন সেনা ছাউনিতে

এসেছি। সড়কের জায়গায় জায়গায় সেনা বাংকার। সৈনিকদের গাড়ীর সংখ্যা সাধারণ গাড়ীর চেয়ে বেশি। সর্বত্র প্রচুর সৈন্যের আনাগোনা ও ব্যস্ততা। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারলাম যে, ভারত সরকার কাশ্মীরের সুদৃশ্য রাজধানী শ্রীনগরকে মুজাহিদদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইসরাইলের দক্ষ সমরবিদদের সহযোগিতা নিয়েছে। তারা তেল আবিবের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনুকরণে শ্রীনগরেও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। একথা সত্য যে, বাহ্যিক চোখে শ্রীনগরকে কেউ দেখে একথা বিশ্বাস করতে পারবে না যে, শত শত মুজাহিদ এখানে সর্বদা অবস্থান করে। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করে। ওয়ারলেইস সেটের মাধ্যমে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মুতে অবস্থিত মুজাহিদদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। প্রায়শই বাংকারের এই নিবিড় জালসমূহ অতিক্রম করে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সেনাছাউনিসমূহে আক্রমণও করে। অভিযান চালিয়ে তারা নিরাপদে নিজেদের নিরাপদ ঘাটিতে প্রত্যাবর্তনও করে।

আমার সঙ্গী বিমানবন্দরের বাইরে এসে একজন ট্যাক্সীওয়ালার সঙ্গে কাশ্মীরী ভাষায় কথা বলে। এরপর আমরা উভয়ে সেই ট্যাক্সীতে আরোহন করি। শ্রীনগরের সড়কসমূহে ট্রাফিকদের এবং ফুটপাথসমূহে সাধারণ

লোকদের কর্মচাঞ্চল্য বিরাজ করছিল। শহরের বেশির ভাগ দোকান ছিল উন্মুক্ত। আর্মি, বিএসএফ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যরা দলে দলে চতুর্দিকে সদম্ভে ঘোরাফেরা করছিল। প্রধান প্রধান সড়কসমূহে জায়গায় জায়গায় সেনা বাংকার বানানো হয়েছে। লোহার জালে আবৃত গাড়ীসমূহ বিভিন্ন স্থানে পাহারা দিচ্ছে। সড়কের উভয় পাশে কিছু দূর পরপর সেনাবাহিনীর সদা সতর্ক সদস্যগণ বন্দুকের ট্রিগারে নিজ নিজ আঙ্গুল রেখে দণ্ডায়মান। মনে হচ্ছিল এটি যেন সৈন্যদেরই একটি শহর, যেখানে স্থানীয় লোকেরা অস্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পেয়েছে। আমি আমার অবস্থানকেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছার মধ্যবর্তী এই পথে শ্রীনগরে যত সৈন্য দেখতে পেয়েছি, তাদের দেখে আমি চরম বিস্ময়াভিভূত ছিলাম যে, এমন নিচ্ছিদ্র বেষ্টনীর মধ্যেও মুজাহিদরা কি করে শ্রীনগরে কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের অভিষ্ট স্থানে পৌঁছে আমার সফরসঙ্গী ট্যাক্সী ড্রাইভারকে ভাড়া দিয়ে বিদায় করে। আমরা একটি বাড়ীতে প্রবেশ করি। দিল্লী থেকে যাত্রাকালে সেখানকার আবহাওয়া ছিল স্বাভাবিক। ফলে শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য অতিরিক্ত সামানা আমি সাথে আনিনি। শ্রীনগর পৌছে নিজের ভুল তীব্রভাবে উপলব্ধি করি। কারণ,

এখানে হাড়কাঁপানো শীত। আমার মনে হচ্ছিল যেন, হাড়ির মজ্জা জমে যাচ্ছে। অভিষ্ট গৃহে আমরা প্রবেশ করতেই মেজবানগণ আমার অবস্থা বুঝে আমাকে উত্তমভাবে কম্বল ও লেপ দিয়ে ঢেকে দেয়। তখন বেলা তৃতীয় প্রহরে পৌঁছেছে। কিন্তু গাঢ় কুয়াশার কারণে মনে হচ্ছিল যেন মাগরিবের আযান হয়ে গেছে। লেপ ও কম্বলে উত্তমভাবে প্যাকেটজাত হওয়া সত্ত্বেও আমি তখনও শীতে কাঁপছিলাম। আমার এ অবস্থা দেখে মেজবানগণ জ্বলন্ত অঙ্গারের একটি কাংড়ী আমাকে দেয়। ইতিপূর্বে আমি কাংড়ীর ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। আমার সফরসঙ্গী আমাকে শীত সংহারক কাশ্মীরী এই অস্ত্র ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়। আমি তার দিক নির্দেশনা মোতাবেক কাংড়িটি আমার ও কম্বলের মাঝখানে রাখি। ফলে আমি এ পরিমাণ প্রশান্তি লাভ করি যে, বসা অবস্থায়ই আমি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি। এমতাবস্থায় আমার কম্বলের এক অংশ পুড়ে যায়। আল্লাহ পাকের দয়ায় যথাসময়ে আমি বুঝতে পারি, ফলে কম্বলের আগুন আর বাড়তে পারেনি।

কাশ্মীরের সংগ্রাম সমস্ত কাশ্মীরবাসীকে সাবধানতায় অভ্যস্ত করেছে। সুতরাং আমি লক্ষ্য করি যে, আমার কক্ষে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি খুব সতর্কভাবে প্রবেশ করছে। আমার সফরসঙ্গী তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু বলত। তারপর তারা আমার সাথে

সাক্ষাত করত। কক্ষে উপস্থিত প্রত্যেকে অপরের সঙ্গে মুখে কম এবং ইঙ্গিতে অধিক কথা বলছিল। ধীরে ধীরে কক্ষটি আগমনকারীদের দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে। এরই মাঝে কাশ্মীরী বুযুর্গদের পোশাক পরিহিত এক যুবক কক্ষে প্রবেশ করে। তিনি আমার সফরসঙ্গীর সঙ্গে মোলাকাতের পর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আমার সঙ্গে মোসাফাহা করেন এবং দোজানু হয়ে বসে পড়েন। আমার সফরসঙ্গী আমার নিকট এসে নিম্নস্বরে বলেন যে, এ যুবক স্বাধীন কাশ্মীরের একজন কমাণ্ডার। বর্তমানে ইনি হরকাতুল আনসারের উপপ্রধান সেনাপতি (ডেপুটি চিফ)রূপে কর্মরত আছেন। আমি সেই যুবকের নিকট সেখানকার বিভিন্ন পরিস্থিতি জানতে চাই। তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে ও ধীরস্থিরে আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দেন।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন বুযুর্গ ও কয়েকজন মুজাহিদ কক্ষে প্রবেশ করেন। আমি তাদের কাউকেই চিনতাম না। অকস্মাৎ এক অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য শুরু হয়। আমি সুদর্শন, সুঠামদেহী ও অস্ত্রে সজ্জিত কয়েকজন মুজাহিদকে এদিক ওদিক আনাগোনা করতে দেখি। ইতিমধ্যেই চার- পাঁচজন লোক একত্রে কক্ষে প্রবেশ করেন। আমি মাথা উঁচু করে তাদেরকে দেখি। আমার চিনতে কষ্ট হয়নি। হাঁ, এসময় আমার পুরাতন বন্ধু ও সহচর, হরকাতুল আনসারের কমাণ্ডার-ইন-চীপ, কমাণ্ডার

সাজ্জাদ আফগানী তার দেহরক্ষী সমভিব্যাহারে কক্ষে প্রবেশ করেন।

কাশ্মীরী ফার্ন ও কাংড়ী
কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান অতি উষ্ণভাবে আমার সঙ্গে মিলিত হন। দীর্ঘ এক বছর পর তার সঙ্গে আমার এ সাক্ষাত। তাঁর অধিকৃত কাশ্মীরে আগমন এক বছর পার হয়ে গেছে। এতগুলো দেহরক্ষী সহ শ্রীনগরে অবস্থান করা এবং আমার অবস্থান কেন্দ্র পর্যন্ত তাঁর পৌছা আমার নিকট বড় বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। কারণ বাইরে সর্বত্র উর্দি পরিহিত নিরাপত্তা বাহিনীর বেষ্টনী রয়েছে। কিন্তু জিহাদ সর্বাবস্থায় তার প্রভাব দেখিয়ে থাকে এবং প্রতিটি বস্তু থেকে স্বীয় শক্তির স্বীকৃতি আদায় করে থাকে।

সাজ্জাদ সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় আফগানিস্তানের এক রণাঙ্গনে। আমরা দুই জিহাদী বন্ধু আজ শ্রীনগরের রণাঙ্গনে একটি কক্ষে একত্রে বসে পরস্পর কথোপকথনে লিপ্ত। এ সময় আমি শহীদ সাজ্জাদ খানের মুখমণ্ডলে বেদনার লক্ষণ অনুভব করি। জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, কিছুদিন ধরে তিনি কোমরের ব্যথায় ভুগছেন। এখনও তিনি তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত। আমি কিছু মাসনূন দুআ পড়ে তাঁকে দম করি। ফলে তাৎক্ষণিক তিনি উন্নতি

উপলব্ধি করেন বলে আমাকে জানান। তারপর আমরা উভয়ে নিজেদের সফরসূচী তৈরীর কাজে লিপ্ত হই। তাঁকে আমি বলি, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি দিল্লী ফিরে গিয়ে আরো কিছু কাজ সারতে হবে। তাছাড়া হিন্দুস্তানের কয়েকটি প্রদেশ ও শহরে কয়েকজন বন্ধু আমার প্রতীক্ষায় আছেন। বিধায় কাশ্মীরে আমার অবস্থান হবে মাত্র দুদিন। আমি ১২ই ফেব্রুয়ারীর ফিরতি টিকিট সঙ্গে এনেছি।

সাজ্জাদ সাহেবের সঙ্গে আমার এ কথা হচ্ছিল ২৭শে শাবান ১৪১৪ হিজরী, মোতাবেক ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ঈসায়ী বুধবারে। তিনি দুদিনের অবস্থান যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ করেন এবং আরো দু' একদিন অবস্থান করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। আমার সংক্ষিপ্ত এই অবস্থানকে মূল্যবান করার জন্য সাজ্জাদ সাহেব এভাবে প্রোগ্রাম তৈরী করেন, আগামীকাল আমরা ইসলামাবাদ (অনন্তনাগ) যাত্রা করব। সেখানে রাতে মুজাহিদীনে কেরামের সাথে সাক্ষাত হবে। তারপর জুমুআর দিন ভোরে ইসলামাবাদ শহরের জামে মসজিদে বয়ান হবে। অতঃপর শ্রীনগরে ফিরে এসে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল, উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট সহযোগীদের সঙ্গে বৈঠক হবে।

প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার পর আমরা সেখানে রাত্রি যাপন করি এবং পরদিনের সফরের জন্য তৈরী হই। সাজ্জাদ

সাহেব আমার জন্য কাশ্মীরী পোশাক আনিয়েছিলেন। তিনি নিজেও তার পোশাকে কিছু পরিবর্তন করেন। ফলে তাকে কাশ্মীরের স্থানীয় বুযুর্গ বলে মনে হচ্ছিল। অস্ত্র ও দেহরক্ষী সহকারে যাওয়াই আমাদের জন্য ভাল ছিল। কিন্তু সাজ্জাদ সাহেব অস্ত্র ও দেহরক্ষী ব্যতিরেকে সফর করাই অধিক সতর্কতা মনে করেন। আমার জন্য কাশ্মীরের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ নতুন। তাই আমি সফরের পুরো ব্যবস্থাপনা সাজ্জাদ সাহেবের হাতে ন্যস্ত করি। তিনি বিগত চার বছর যাবত রক্তপায়ী এই উপত্যকায় চলাফেরা করছেন এবং অতীব দৃঢ়তার সঙ্গে জিহাদের কাজ করছেন। নিজের মেহমানের হেফাজত ও নিরাপত্তার জন্য সাধারণ বেসামরিক লোকের বেশে সফর করতে এবং অস্ত্র সঙ্গে না নিতে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে বাধ্য করছিল। কারণ, অস্ত্র থাকা অবস্থায় দ্বন্দ্ব সংঘাতের আশংকা থাকে অধিক। আর তিনি তার মেহমানকে এ অবস্থায় কোন ঝামেলা ও যুদ্ধে জড়াতে চাচ্ছিলেন না। তাছাড়া একজন বণিকের বেশে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরে চলাফেরা করছেন।

তিনি স্থানীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে গাড়ীতে রক্ষিত ব্যবসার মালরূপে গালিচাসমূহ এবং কাশ্মীরী ভাষার উপর পূর্ণ দখল থাকার কারণে ভারতের সেনাবাহিনীর লোকদেরকে বুঝ দিয়ে চলাফেরা করার বিস্তর

অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সাজ্জাদ সাহেব ও তার সঙ্গী সফরের প্রোগ্রাম তৈরী করতে থাকেন। আর আমি তাদের পরামর্শে অংশ না নিয়ে সফরের ঘোষণার অপেক্ষা করতে থাকি। ফেব্রুয়ারীর ঝিমিয়ে পড়া সেই বিকালটি সময় হওয়ার অনেক পূর্বেই শ্রীনগরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই রাতের তুষারপূর্ণ শীতল বায়ু ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চতুর্দিকে জেকে বসে। শ্রীনগরের মেজবানগণ পালাক্রমে কোলাকুলি (আলিঙ্গন) করে আমাকে বিদায় করেন। সম্ভবত এই শহরে প্রত্যেক মুসাফিরকে শেষ বিদায়ের আঙ্গিকে বিদায় করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

আমি সাবানদানীর আদলে ভারতের তৈরী এম্বেসেডার গাড়ীর সামনের সিটে দেশী গড়নের কম্বলে আবৃত হয়ে বসে যাই। সাজ্জাদ সাহেব ড্রাইভিং সিট অধিকার করেন। আরেকজন সঙ্গী গাড়ীর পেছনের সিটে গিয়ে বসেন। আমাদের গাড়ী ইসলামাবাদ (অনন্তনাগ) অভিমুখে যাত্রা করে। আমরা সামান্য অগ্রসর হওয়া মাত্র জোৎস্না বঞ্চিত ও মেঘে আচ্ছন্ন রাতের অন্ধকার চতুর্দিকে পূর্ণরূপে ছেয়ে যায়। চল্লিশ মিনিটের বাহ্যিক নিরাপত্তাপূর্ণ সফরের পর একটি মঞ্জিলে আমরা যাত্রাবিরতী করি। মাগরিবের নামায আদায় করে আমি আমার অযীফাহ পাঠে লিপ্ত হই। সাজ্জাদ সাহেব তার ওয়ারলেইস

দ্বারা বাড়ির আঙ্গিনা থেকে তার এক সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

কিছু সময় পর তাদের যোগাযোগের ফলাফল আমাদের সামনে প্রকাশ পায়। শরীয়তসম্মত পূর্ণাঙ্গ শ্মশ্রুমণ্ডিত সুদর্শন চেহারা, ছোট গঠন ও চপল দেহের অধিকারী একজন মুজাহিদ আমাদের কাছে চলে আসেন। আমি তার সঙ্গে কোলাকুলি করে বুঝতে পারি যে, সে পরিপূর্ণরূপে অস্ত্র সজ্জিত। কাশ্মীরী ফার্ন (বিশেষ ধরনের জুব্বা সদৃশ ঢোলা ও গরম পোশাক)এর নীচে সে রাইফেল, গ্রেনেড, গানপোচ, ওয়ারলেইস, ম্যাগজিন বেঁধে রেখেছে। কাশ্মীরী ফার্ন মুজাহিদদের জন্য কুদরতী রহমত। ঢিলেঢালা ও বৃহদাকার এই জুব্বার নীচে লুকিয়ে রাখা কোন বস্তুই বাহির থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। মুজাহিদগণ তাদের যাবতীয় অস্ত্র এর মধ্যে লুকিয়ে নিরাপদে চলাফেরা করে থাকে এবং বিপদের সময় ফার্নের ভিতর থেকেই ক্লাসিনকোভ বা পিস্তল তাক করে ফায়ার করে। এভাবে ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত কাশ্মীরীদের প্রিয় এই পোশাক তাদের জিহাদের সহযোগী হয়ে যায়। তবে কোন কোন সময় এই পোশাকের কারণে কিছু জটিলতারও সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তার উপকারিতা তার ক্ষতির তুলনায় সর্বাবস্থায় অনেক বেশী।

কোন কোন কাশ্মীরী মুজাহিদের ধারণা এই যে, শত্রুরা কাশ্মীরীদেরকে অলস বানানোর জন্য এসব ফার্ন ও কাংড়ীর ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়েছে, যেন তারা হাতে কাংড়ী নিয়ে ফার্নের মধ্যে জমে বসে থাকে। আর দুশমনরা তাদের উপর শাসন চালাতে থাকে। কিন্তু তাদের এই ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ, ফার্ন পদাসম্মত সুদৃশ্য ও ঢিলেঢালা একটি পোশাক। আরবদের পোশাকের সঙ্গে এর হুবহু মিল রয়েছে। তাছাড়া কাংড়ীও এক ধরনের হাতে ব্যবহৃত বস্তু। তুষারপূর্ণ অঞ্চলে শীত থেকে বাঁচার জন্য এ জাতীয় জিনিস ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। বিধায় ফার্ন ও কাংড়ীকে শত্রুর চক্রান্ত সাব্যস্ত করা কোনভাবেই সঠিক মনে হয় না।

তবে ডোগরারাজের জালেমী যুগে শক্তিবলে কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর কোন কোন বস্তু চাপিয়ে দেয়া হয়। বর্তমানে সেসব বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও প্রকৃতির অংশে পরিণত হয়েছে অথচ কাশ্মীরী জাতির সেসব জিনিস থেকে মুক্ত হওয়া অতীব প্রয়োজনীয় বলে উপলব্ধি হয়। কেননা এসব বস্তুই দাসত্বের শিকল হয়ে গেছে। যেমন, কাশ্মীরের কয়েকটি পুকুর ও ঝর্ণায় উন্নত জাতের মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু কাশ্মীরের মুসলমানগণ আল্লাহ প্রদত্ত মূল্যবান ও সুস্বাদু এই নিআমত দ্বারা উপকৃত হয় না। এটি তাদের আকীদার রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, এসব মৎস্য

শিকার করা এবং খাওয়া এমন এক অপরাধ, যার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব নেমে আসবে।

কাশ্মীরীদের সংশোধনযোগ্য এই চিন্তাধারার প্রেক্ষাপট এই বলা হয় যে, কাশ্মীরের পণ্ডিতেরা মুসলমানদেরকে মৎস্য দ্বারা উপকৃত হতে দেখে হিংসাবশত জ্বলতে থাকে। দরিদ্র মুসলমান ভাল খাদ্য ব্যবহার করবে তা তাদের সহ্য হয় না। সুতরাং পণ্ডিতদের বড় একজন ধর্মীয় নেতা মহারাজার নিকট গিয়ে বলে যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আপনার পিতা মৎস্যাকারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন। আমি আশংকা করছি যে, মুসলমানরা আপনার পিতাকে ধরে খেয়ে ফেলতে পারে। এ কথা শুনতেই অলীক ও কল্পনার পূজারী মহারাজা মৎস্য শিকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে সাথে পণ্ডিতেরা নানারকম ভিত্তিহীন কথাও প্রচার করে। এভাবেই কাশ্মীরের মজলুম মুসলমানদেরকে আরো একটি নিআমত থেকে বঞ্চিত করা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! এখন অনেক মুসলমানের মন থেকে এ কুসংস্কারটি মুছে গেছে। এতদসত্ত্বেও বেশ কয়েকটি পুকুর ও ঝর্ণার উপর এই অলীক পূজার ছায়া এখনো বিস্তার করে আছে। সেখানকার মুসলমানগণ এসব মাছকে বিশেষ সৃষ্টি এবং সম্মানিত আত্মা মনে করে তা শিকার করা থেকে বিরত থাকে। বরং কোন মুজাহিদ যদি সে সব পুকুর থেকে মাছ ধরে,

তাহলে সেখানকার লোকেরা তার উপর খুব ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যেসব পাত্রে এই মাছ রান্না করা হয় সেগুলো ফেলে দেয় এবং আযাবের ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে।

এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে যে, কাশ্মীরের সকল হিন্দু অধিবাসীকেই পণ্ডিত বলা হয়। আর হিন্দুদের ধর্মীয় নেতাকে যেমন পণ্ডিত বলা হয়, তেমনি ব্রাহ্মণদের একটি জাতিকেও পণ্ডিত বলা হয়। কাশ্মীরের হিন্দুরা এ জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমি যদিও কাশ্মীরী পণ্ডিতদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো না, তবুও পাঠকদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এ কথাটুকু অবশ্যই বলব যে, কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা বিশ্বের চরম নোংরা ও নিকৃষ্টতম জাতিসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা কাশ্মীরী পণ্ডিতদেরকে সুন্দর রূপ ও গঠন ও উন্নততর মস্তিষ্ক দান করেছেন বটে, কিন্তু হতভাগা এই জাতি যাবতীয় ভাল কাজ থেকে দূরে থাকে এবং যাবতীয় মন্দকাজে অভ্যস্ত। মিথ্যা বলা এ জাতির রক্তে মিশে গিয়েছে। সুতরাং খোদ হিন্দুরাই বলে থাকে যে, কোন কাশ্মীরী পণ্ডিত একশ'টি কথা বললে তার মধ্যে কমপক্ষে নিরানব্বইটি অবশ্যই মিথ্যা হবে। মিথ্যার মত স্বার্থপূজাও এই জাতির স্বভাবে পরিণত হয়েছে। সুতরাং নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা কাউকেই

ধোকা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বরং একে তারা নিজেদের এক শৈল্পিক দক্ষতা মনে করে থাকে।

বেহায়াপনা ও আত্মমর্যাদাহীনতাও ঐ জাতির খাছলতে পরিণত হয়েছে। বরং সত্য কথা এই যে, পণ্ডিতদের নির্লজ্জতা ও ব্যক্তিত্বহীনতা দেখে হয়ত বা কুত্তাও লজ্জাবোধ করে। এমনিভাবে প্রতারণা, বাচালতা ও তোষামোদী করাও পণ্ডিতদের স্বতন্ত্র অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এখানে এ কথাটিও স্মরণীয় যে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কাশ্মীরী পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজ পিতৃদেশ কাশ্মীরকে মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ইংরেজের সাথে একাত্ম হয়ে সেই ষড়যন্ত্র করেন, যার পরিণতি আজ পর্যন্ত মুসলমানরা ভুগছে। আর এটি কোন গোপনীয় কথা নয় যে, হিন্দুস্থানের সর্বশেষ ভাইসরয় (Viceroy-রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি) লর্ড মাউন্ট বেটন ও তার পরিবারবর্গ এবং জওহর লাল নেহেরু ও তার পরিবারবর্গ পরস্পর জৈবিক ও দৈহিক নোংরামীতে খোলামেলাভাবে লিপ্ত ছিল। সুতরাং জওহর লাল নেহেরু বেটনকে হিন্দুস্থানের প্রথম গভর্নর জেনারেল বানায়। আর বেটন কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়ার স্বীকৃতি দেয়। জওহর লাল নেহেরুর মত তার পুত্রী ইন্দিরাগান্ধীও কাশ্মীরের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়। জওহর লাল নেহেরু,

ইন্দিরা গান্ধী এবং পরবর্তীতে রাজীব গান্ধীর মধ্যে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের উপরোক্ত যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

মূলত কাশ্মীরী পণ্ডিতরা কাশ্মীরীদের সমস্যার মূল অপরাধী এবং সকল গণ্ডগোলের শিকড়। মহারাজার শাসনকালে এসব পণ্ডিতেরা কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর যেই নিপীড়ন চালিয়েছে, তা পাঠ করে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মনেই পণ্ডিতদের নাম শুনলে ও চেহারা দেখলে ঘেন্না হয়। তবে একথা সত্য যে, জুলুমের রাত বেশী দীর্ঘ হয় না।

১৯৯০ ঈসায়ীতে কাশ্মীর যখন জিহাদের শ্লোগানে গুঞ্জরিত হতে থাকে এবং মৃত আলোচনার স্থলে জীবিত বন্দুক গর্জে উঠতে আরম্ভ করে, তখন কাশ্মীরের জালেম পণ্ডিতদের দুর্দিন এ দুনিয়াতেই তাদের উপর চেপে বসে। তাদের ধ্বংসের রসদ তাদেরই স্বজাতি জগমোহনের হাতে জন্ম নেয়। জগমোহন কাশ্মীরের গভর্নর হওয়ার পর পণ্ডিতদেরকে বলে—আমি কাশ্মীরী মুসলমানদেরকে একদম খতম করে ছাড়ব। তাই কিছুদিনের জন্য তোমরা কাশ্মীর ছেড়ে চলে যাও। আমি যখন জিহাদের এ আন্দোলনকে পূর্ণরূপে মাটিতে মিশিয়ে দেব, তখন তোমরা বিজয়ীর বেশে ফিরে এসো। পণ্ডিতরা একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়

এবং লাখ লাখ পণ্ডিত কাশ্মীর ছেড়ে জম্মু ও দিল্লীতে গিয়ে বসতি স্থাপন করে।

এদিকে জগমোহন তার কুট সংকল্পে চরমভাবে বিফল হয় এবং যেসব পণ্ডিত কিছুদিনের জন্য পলাতকদের ক্যাম্পে অবস্থান নিয়েছিল, তারা শিক্ষণীয় নিদর্শন হয়ে দিবস-রজনী অশ্রু ঝরাতে থাকে। নিজের ভাগ্যকে তারা অভিশম্পাত করতে থাকে। আজ জম্মু ও দিল্লীতে কাশ্মীরের পণ্ডিত পরিবারগুলাের উপর অন্যান্য হিন্দুদের দ্বারা যা কিছু ঘটছে, তা দেখে প্রত্যেক জালেমের যে খারাপ পরিণতি হয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

দুটি মুরগী
এখানে প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন ঝর্ণার মাছের যে আলোচনা এসেছে, এতদ্ব্যতীত পরাধীনতার আরো অনেক নিদর্শন কাশ্মীরে বর্তমান রয়েছে।
যে কোন অবস্থায় সেগুলোর সংশোধন জরুরী। আলহামদুলিল্লাহ, জিহাদের বরকতে সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। কোন জাতির মধ্যে অব্যাহত দাসত্বের ফলে যেসকল ব্যাধি জন্ম নেয়, তার তালিকা অতি দীর্ঘ। উদাহরণস্বরূপ—

১- উন্মাদনার পর্যায়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাপকতা।

২-কাউকে ভালবাসতে অথবা ঘৃণা করতে সীমাহীন বাড়াবাড়ি (অর্থাৎ ভারসাম্য

হারিয়ে ফেলা)।

৩-হীনমন্যতা ও তার ফলশ্রুতিতে মারাত্মক পর্যায়ের অহংকার।

৪-আপনজনদের তুলনায় পরদের উপর অধিক আস্থা পোষণ।

৫-কাজে দুর্বল হওয়া ও কথা বেশী বলা।

৬-শক্তির (তা যত অল্পই হোক না কেন) অপব্যবহার।

৭-মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও জৈবিক ভ্রষ্টতা।

৮- সীমাতিরিক্ত স্বার্থ পূজা।

৯-মিথ্যা বলা।

১০-ভীরুতা এবং নিজের মতকে চূড়ান্ত মনে করা, প্রভৃতি।

বর্তমানে সমগ্র উম্মতে মুসলিমাহ ব্যাপকভাবে এবং তার কয়েকটি শ্ৰেণী বিশেষভাবে দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ। তাদের মধ্যে দাসত্বের রোগসমূহ দিন দিন দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। দুআ করি আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে আযাদী দান করেন এবং তাদেরকে সেসব উন্নত গুণাবলী নসীব করেন, যা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। কাশ্মীরী ফার্ন সম্পর্কে কথা চলছিল। কথা

অনেক দূর গড়িয়েছে। সাজ্জাদ সাহেব নব আগন্তুক মুজাহিদের পরিচয় দিয়ে বললেন— ইনি ইসলামাবাদ (অনন্তনাগ)এর অধিবাসী। আমাদের মুজাহিদ সাথী—ভাই রইস সাহেব। দীর্ঘদিন তিনি সংগঠনের জেলা কমাণ্ডারও ছিলেন। বর্তমানে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। ইনি আমার বিশেষ বাহিনীর একজন সদস্যও। এই বাহিনী মুজাহিদদের নীতি ও কর্মের উপর নজরদারী করে থাকে, যেন তারা ভুলপথের শিকার না হয়। পরিচয় লাভের পর তার সঙ্গে অধিক মুহাব্বত হয়ে যায়। ফলে জিজ্ঞাসা করে তার সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানতে পারি। তিনি হরকাতুল আনসারের জেলা কমাণ্ডার ভাই সেকান্দার (জাবেদ আহমাদ জাবরা)এর দক্ষিণ হস্ত। যিনি ইণ্ডিয়ান আর্মীর বিরুদ্ধে কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। তার হাতে ইণ্ডিয়ান আর্মী থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কার্বাইন রাইফেলও ছিল। আমি খুব তাড়াতাড়ি তার কাছ থেকে এর ব্যবহার শিখে নেই। রইস ভাই এই সফরে কিছু সময় আমাদের সঙ্গে থাকেন।

আমার বন্দী হওয়ার পর কোট ভলওয়াল কারাগারে যে চিঠি পাই, তাতে তিনি আমাদের সঙ্গে তার অফুরন্ত ভালবাসা, হৃদ্যতার উল্লেখ ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং লেখেন যে, “আমার জীবনের সর্বশেষ বাসনা এই যে, আমি মাওলানার (লেখকের) পিছনে ইকতেদা করে একটি নামায আদায় করব, তারপর শহীদ হব।”

কারাগারে তার পত্রপাঠে তার ভালবাসা ও স্মৃতিসমূহ জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারপর আমি ‘ তিহার কারাগারে অবস্থানকালে রইস ভাইয়ের শহীদ হওয়ার সংবাদ পাই। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

সাজ্জাদ সাহেব এবং রইস ভাই পরবর্তী সফরের প্রোগ্রাম তৈরী করতে থাকেন। রইস ভাই কমাণ্ডার সেকান্দারকেও আমার কথা অবগত করেন। আমারও সেকান্দার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আন্তরিক বাসনা ছিল। তার সাথে ছিল বহুদিনের পুরাতন সম্পর্ক। তার অকৃত্রিম ব্যবহার ও কৃতিত্ব আমার হৃদয়ে তার ভক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। রইস ভাই ওয়ারলেইসে তার সাথে যোগাযোগ করতে সফল হন। তিনি বলেন, সেকান্দার সাহেব এখান থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। তার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। তিনি আমাদের পরবর্তী মঞ্জিলে পৌছতে পূর্ণ চেষ্টা করবেন। কিন্তু তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া আমার ভাগ্যে ছিল না। আমরা পরের দিন তার সাথে দেখা হওয়ার পূর্বেই গ্রেফতার হই। পরে আমরা যখন টর্চারিং সেন্টার পেরিয়ে জেলে পৌছি, তখন সিকান্দার ভাইয়ের বিস্তারিত পত্র পাই। তাতে তিনি সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণসমূহ উল্লেখ করেছিলেন। তার সংক্ষিপ্তসার এই—

তিনি আমাদের পৌছার সংবাদ পাওয়া মাত্র অন্যান্য মুজাহিদদেরকে সেখানে রেখেই সফর শুরু করেন। রাত হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি

এখানে আসার মত বাহন পাননি। ফলে একজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে বাতিহীন একটি মটর সাইকেলযোগে তিনি যাত্রা করেন। সঙ্গীটি টর্চ হাতে নিয়ে সামনে আলো ফেলছিল, আর সিকান্দার ভাই দ্রুতগতিতে মটর সাইকেল চালাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি দুই তিনবার মাটিতে পড়ে আঘাতও পান। তবুও সফর অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তিনি এসে পৌছার পূর্বে পরবর্তী মঞ্জিল থেকেও আমরা রওনা হয়ে যাই। বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি রইস ভাইয়ের ওয়ার্লেসে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পান যে, বুযুর্গ গ্রেফতার হয়েছেন। সংবাদ শুনে সিকান্দার ভাই তার সকল মুজাহিদকে একত্রিত করে পনের দিন পর্যন্ত পাগলের মত শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ করতে থাকেন। শত্রুপক্ষ আমাদেরকে আটকে রাখতে পারে এমন সম্ভাব্য ক্যাম্পগুলোকে তারা টার্গেট বানান।
পনের দিনের রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর দুঃখ ও হতাশা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তবুও যে কোন উপায়ে আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য তারা চেষ্টা করতে থাকেন। পরে আমাদের বন্দী হওয়ার তিন মাস পর তাঁরা বৃটেনের দুইজন নাগরিককে অপহরণ করে তাদের বিনিময়ে আমাদেরকে মুক্তির দাবী জানান। ভারত সরকার এই দাবীর মুখে অনেকটা অবনত হয়েছে, এমতাবস্থায় হরকাতুল আনসারের নেতৃত্ব সিকান্দার ভাইয়ের উপর বৃটিশ

নাগরিকদ্বয়কে ছেড়ে দেওয়ার হুকুম জারী করে।

এ ছিল কমাণ্ডার সাজ্জাদ সাহেবের নামে কোট ভলওয়াল কারাগারে সিকান্দার ভাইয়ের প্রেরিত দীর্ঘ পত্রের সারাংশ। পত্রে তিনি হরকাতুল আনসারের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছু অভিযোগও করেছিলেন এবং এ সংকল্পও জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের বন্দী সাথীদের মুক্ত করতে কোন প্রকার কুরবানী করতে কুণ্ঠিত হবেন না। ভালবাসা ও সান্ত্বনার এই পত্রটি ছিল আমাদের ক্ষতস্থানে প্রলেপের ন্যায়। পরবর্তীতে আমাদেরকে যখন তিহার কারাগারে স্থানান্তর করা হয়, তখন সেখানে সংবাদ পাই যে, সিকান্দার ভাইকে বর্তমানে হরকাতুল আনসারের চীফ কমাণ্ডার বানানো হয়েছে। কমাণ্ডার সাজ্জাদ সাহেব তাঁর কাশ্মীরের সাথীদের ব্যাপারে খুব বেশি চিন্তিত থাকতেন। এ সংবাদ শুনে তিনি খুব আনন্দিত হন। তিনি বলেন যে, এবার আমানত তার হকদারের নিকট পৌঁছেছে। সাজ্জাদ সাহেব সিকান্দার ভাইয়ের বীরত্ব, সুব্যবস্থাপনা ও গ্রহণযোগ্যতার কথা খুব বেশী স্বীকার করতেন। তিনি প্রায়শই তার আলোচনা করতেন, কিন্তু কারাগারে থাকতেই আমরা সিকান্দার ভাইয়ের শহীদ হওয়ার সংবাদও শুনতে পাই। নিঃসন্দেহে এই সংবাদ আমাদের জন্য সীমাহীন বেদনাদায়ক এবং দুঃখজনক ছিল। কিন্তু

কমাণ্ডার সিকান্দার শহীদ (রহঃ)কে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখা, তার বিচ্ছেদে ধৈর্যধারণ করা এবং তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির দুআ করা ছাড়া আমাদের আর কিইবা করার ছিল?

এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, কাশ্মীরের ইসলামাবাদে (অনন্তনাগ) প্রবেশ করার পর নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমরা যদিও সিকান্দার ভাইয়ের মেহমান ছিলাম, কিন্তু আমরা আমাদের মেজবানের সঙ্গে মোলাকাত করতে পারিনি।

কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান (রহঃ) রইস ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করার পর সম্মুখের সফরের জন্য গাড়ী পরিবর্তন করার ইচ্ছা করেন। সুতরাং আমরা তিনজনই রাতের আঁধারে আগের গাড়ী আমাদের মেজবানের নিকট ছেড়ে আরেকটি গাড়ীতে আরোহণ করি। গাড়ীতে আরোহণ করার পূর্বে সেখানে উপস্থিত অপর একজন কাশ্মীরী মুজাহিদ তার ফার্ন খুলে আমাকে পরিয়ে দেয় এবং কোলাকুলি করে উষ্ণভাবে আমাদেরকে বিদায় জানায়। সাজ্জাদ সাহেব (রহঃ) কারো মাধ্যমে দুটি মুরগীও আনিয়েছিলেন। তিনি জবাইকৃত মুরগী দুটিকে গাড়ীর ব্যাক ডালায় রেখে দেন। ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে কর্মরত মুজাহিদগণ শহরে থাকাকালীন সময়ে তাদের সহযোগীদের গৃহে অবস্থান করে থাকেন এবং সেখানেই আহার করে থাকেন।

কাশ্মীরের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানগণ মুজাহিদদের থাকা খাওয়াকে

নিজেদের জন্য বোঝা মনে করেন না। বরং পরম আনন্দে নিজেদের সামর্থ্যের অধিক মুজাহিদদের খেদমত করে থাকেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন কোন মুজাহিদ আপ্রাণ চেষ্টা করেন যুদ্ধাক্রান্ত কাশ্মীরী ভাইদের উপর কোন প্রকার অসহনীয় বোঝা যেন না চাপে। সাজ্জাদ সাহেবও ছিলেন সে সকল মুজাহিদদের অন্যতম। তিনি পরবর্তী মঞ্জিলে তার মেহমান (লেখক)কে ভাল খাবার খাওয়াতে চাচ্ছিলেন। সাথে সাথে খাবারের বোঝা মেজবানের কাঁধে না ফেলারও চেষ্টা করছিলেন। তাই তিনি দুটি মুরগী জবাই করে গাড়ীর ব্যাক ডালায় রেখে দেন। আমাদের তিন সদস্যের কাফেলা ইসলামাবাদ থেকে দূরবর্তী একটি পাহাড়ী গাঁয়ের দিকে যাত্রা করে। সেখানে কমাণ্ডার আবূ গাজী ও আরো অনেক মুজাহিদের সাথে আমাদের মোলাকাত করার প্রয়োজন ছিল।

গাজীদের সাক্ষাৎ লাভ ফেব্রুয়ারী মাসের হিমশীতল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এই নিশিতে আমরা তিনজন যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম। কমাণ্ডার সাজ্জাদ শহীদ (রহঃ) গাড়ী চালাচ্ছিলেন।

পিছনের ছিটে শহীদ রইস ভাই উপবেশন করেছিলেন। আর আমি সামনের সিটে আমার ফার্ন ও গরম চাদরে আবৃত হয়ে বসেছিলাম।

পথিমধ্যে এক জায়গায় গাড়ী খারাপ হয়ে যায়। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই এমন অন্ধকার হয়ে যায় যে, নিজের হাতও দেখা যাচ্ছিল না। সাজ্জাদ খান ও রইস ভাই গাড়ী থেকে নেমে পড়েন। তারা সড়কের ডানে বামে দেখে অনুমান করে বুঝতে পারেন যে, আমরা ইণ্ডিয়ান আমীর একটি ক্যাম্পের নিকট এসে পৌঁছেছি। গাড়ী খারাপ না হলে আমরা ক্যাম্পের দরজায় অথবা তার বেষ্টনী পর্যন্ত পৌঁছে যেতাম। তাই গাড়ী খারাপ হওয়া যেন আমাদের জন্য খোদায়ৗ সাহায্য ছিল। তারা উভয়ে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে করতে গাড়ীর নিকট ফিরে এসে ধাক্কা দিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে নেন এবং কিছুদূর গিয়ে ধাক্কা দিয়ে গাড়ী ষ্টার্ট করেন। এখন আমরা ছোট একটি সড়কের উপর দিয়ে যাচ্ছি। সড়কের উভয় দিকে বৃক্ষ, লতা ও অরণ্য। কোথাও কোথাও কোন বাড়ীও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। পথের নির্জনতা ও অন্ধকারের প্রভাব গাড়ীর ভিতরও অনুভূত হতে থাকে। সফরসঙ্গী সকলে নীরব। গাড়ীর ভিতর নিস্তব্ধতা ছেয়ে আছে। আমরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর সড়ক ছেড়ে একটি বাড়ীর দিকে ঘুরে যাই। কাঠের তৈরী সাদামাটা এই দোতলা গৃহ তার অভ্যন্তরে জীবনের নিদর্শন ধারণ করে দাঁড়িয়েছিল।

গৃহাভ্যন্তরে ক্ষীণ আলো জ্বলছিল। একজন তরুণ যুবক ভিতর থেকে বের হয়ে আমাদেরকে

স্বাগত জানায়। তার পথপ্রদর্শনে আমরা সিড়ি অতিক্রম করে একটি কক্ষে প্রবেশ করি। আমরা পৌছার অল্প পরে সেই গৃহে সশস্ত্র মুজাহিদদের আগমন শুরু হয়। সুশ্রী মুখাবয়ব, দীর্ঘ কেশ, কাঁধে ঝুলানো ক্লাসিকভ, বক্ষস্থিত গ্রেনেড ও ম্যাগজিনে সজ্জিত পোচ, ‘কেমোফ্লাজ’ রং এর পোশাক, নয়ন যুগলে ঈমানী আত্মমর্যাদা ও জীবনের উজ্জ্বলতা, মুখমণ্ডলে প্রশান্তি ও ললাটে বীরত্বের ঝলক নিয়ে আল্লাহর সিপাহীগণ কক্ষে প্রবেশ করে পরম ভালবাসা নিয়ে মিলিত হচ্ছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চৌদ্দ। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা আবূ গাজী (রহঃ) তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আবূ গাজী (রহঃ) সে সময় অধিকৃত কাশ্মীরের ইসলামাবাদ জেলায় অবস্থিত মুজাহিদদের একটি পাহাড়ী ক্যাম্পে দায়িত্বশীল ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মুজাহিদদের কমাণ্ডার-ইন-চীফ হন। শ্রীনগরে টাস্ক ফোর্সের হাতে তিনি শহীদ হন। কারাগারে আমরা আমাদের যে সকল নিকটতম সঙ্গীর শহীদ হওয়ার সংবাদ পাই, আবূ গাজী (রহঃ) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। আফগানিস্তানে জিহাদের সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। তিনি দীর্ঘদিন মুজাহিদদের প্রশিক্ষকও ছিলেন।

যাই হোক, আবূ গাজী (রহঃ) সকল মুজাহিদদের পরিচয় তুলে ধরেন। অধিক তথ্য জানানোর জন্য তিনি বলেন যে, এখান থেকে পদব্রজে

দেড় ঘন্টার পথ অতিক্রম করে একটি পাহাড়ী অরণ্যে আমাদের ক্যাম্প। ক্যাম্পের মুজাহিদদের সংখ্যা ষাটের মত। সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট সংরক্ষিত স্থানে এই ক্যাম্প অবস্থিত। ফলে ভারতীয় সৈন্য কোন দিক থেকেই আমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাতে পারবে না। তারা যখনই আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে অনেক দূর থেকেই তারা আমাদের প্রহরীদের দৃষ্টির আওতায় চলে আসবে। তিনি বলেন যে, আজই পনের সদস্য বিশিষ্ট একটি মুজাহিদ দল উস্তাদ আহমদ আলীর নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যের একটি ক্যাম্প নিরীক্ষণের কাজে মাঠে নেমেছে। দলটি দুই একদিনের মধ্যে নিরীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করে আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী করবে। তারপর অবশিষ্ট মুজাহিদগণ সেই পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণ করবে।

উস্তাদ আহমাদ আলীর নাম আমার অপরিচিত ছিল না। সীমান্ত প্রদেশের কার্ক অঞ্চলের অধিবাসী সুঠামদেহী, সুযোগ্য ও পরহেজগার এই যুবক আমাদের ট্রেনিং সেন্টারের গৌরবময় একজন প্রশিক্ষক ছিলেন। অনেক দিন ধরে তিনি কাশ্মীরে উৎসর্গপ্রাণ মুজাহিদ বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন। আমরা কারাগার থেকেই উস্তাদ আহমদ আলীর শাহাদত বরণের সংবাদ পাই। কমাণ্ডার আবূ গাজী (রহঃ) বলেন-আমরা চৌদ্দজন সাথী আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ক্যাম্প থেকে এসেছি। রাতেই

আমাদেরকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। আমাদের কিছু সঙ্গী ক্যাম্পে রয়েছেন। তারাও আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা রাখে। কিন্তু পালা অনুযায়ী তাদেরকে ক্যাম্পে থেকে যেতে হয়। আবূ গাজী শহীদ (রহঃ) তার সঙ্গে আগত যেসব মুজাহিদের পরিচয় দিলেন, তাদের সকলেই ছিল আমার অপরিচিত। তবে তাদের বেশীর ভাগই আমার সম্পর্কে জানত। এরা সবাই আমাকে বেষ্টন করে বসে পড়ল। তাদের বাসনা আমার থেকে কিছু কথা শুনবে। আর আমি নিজেও ইসলামের এই উৎসর্গিতপ্রাণ বীরকেশরীদের সঙ্গে কথা বলা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করছি।

আমি অনুচ্চস্বরে অনেকক্ষণ বক্তৃতা দান করি। তারা অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে ও একাগ্রমনে তা শুনতে থাকে। আমার মনে পড়ছে যে, আমি সেই বক্তৃতায় শহীদের খুন এবং কাফেরের রক্তের মাঝের পার্থক্য তুলে ধরি এবং এও বলি যে, পৃথিবীর জন্য উভয় রক্তেরই প্রয়োজন পড়ে। ইসলামের শত্রু-কাফেরের রক্ত জৈব সারের কাজ করে। আর শহীদের খুন বীজের কাজ দেয়। এতদুভয়ের সমন্বয়ে পৃথিবীতে ইসলামের চারা সবুজ শ্যামল হয়। যার ফল ভোগ করে সমগ্র মানবগোষ্ঠী। বক্তৃতা শেষে শহীদ কমাণ্ডার আবূ গাজীকে আমি কিছু হাদিয়া দিয়ে বলি যে, এগুলো আপনার সকল সাথীর জন্য। তিনি নোটের

বাণ্ডিল নিয়ে অপর এক সঙ্গীর হাতে দিয়ে দেন।

ইতিমধ্যে পাহাড়ের উপর ক্যাম্পে অবস্থিত সাথীরা ওয়ার্লেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে এবং কথা বলার বাসনা জানায়। আমি কয়েক মিনিট ওয়ার্লেসে তাদের সাথে কথা বলি। আমার কথা শেষ হলে কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান তাদেরকে কয়েকটি দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় আমাদের আসর অল্পক্ষণের জন্য উৎফুল্লতা ও হাস্যরসের দিকে মোড় নেয়। শত্রু বেষ্টনীতে উপবেশন করে এ কয়জন মুজাহিদ সর্বপ্রকার ভীতি ও আশংকার ঊর্ধ্বে উঠে পরস্পরকে হাসাতে থাকে। আসরের এ অবস্থা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। তারপর আবার গম্ভীরতা ছেয়ে যায়। কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান এসব সাথীদের মধ্যকার নব আগন্তুকদেরকে কিছু মূলনীতি বুঝিয়ে দেন। তাদেরকে নিয়ম শৃংখলা, সংযম ও সবরের সাথে কালাতিপাত করার উপদেশ দান করেন। এ সময় কয়েকজন মুজাহিদ তার কাছে অভিযোগের সুরে বলেন যে, ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে দ্রুত এ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না কেন? সাজ্জাদ খান (রহঃ) তাদের অভিযোগের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে, প্রত্যেক দিন আক্রমণ চালানো উপকারী নয়, বরং ক্ষতিকর হয়ে থাকে। তারপর আমাদের এই ঐতিহাসিক বৈঠক সমাপ্ত হয়। আমাদের মেজবান খানা তৈরী হওয়ার সংবাদ জানান। ইসলামাবাদ

থেকে আনা মুরগী দুইটির একটি তখন রান্না হয়েছিল।

নিদ্রার প্রতীক্ষায় কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান, রইস ভাই ও আমি খানা খাওয়ার জন্য দস্তরখান সম্মুখে নিয়ে বসি। মেজবান পরিবারের একজন দস্তরখানে খাবার এনে রাখছিলেন। সাজ্জাদ সাহেব তাকে বললেন- “রাতের বেলায় আমরা আপনাদেরকে কষ্ট দিচ্ছি। উত্তরে সে বলল— “জ্বি না। আজ তো আমরা পরিবারের সকলে ‘শব’ উদযাপন করছি।” শব উদযাপন শব্দটি আমার জন্য ছিল নতুন। তাই সাজ্জাদ সাহেব এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাশ্মীরের লোকেরা বৃহস্পতিবার রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে জাগ্রত থাকাকে ‘শব’ উদযাপন করা বলে। যে বৃহস্পতিবার রাতে তারা শব উদযাপন করে, সে রাতে পরিবারের সকলে জেগে থাকে। তাদের কেউ ইবাদতে লিপ্ত থাকে, আর কেউ হালুয়া রান্না করে। এভাবে তাদের সারারাত নামায পড়তে, তেলাওয়াত করতে, হালুয়া রান্না তে এবং তা খেতে কেটে যায়।

আমাদের মেজবানও আজ রাতে শব উদযাপন করছিলেন। ফলে দস্তরখানে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যের সমাহার হয়। তার মধ্যে ফল-ফ্রুটে ভরা হালুয়াও ছিল। খাওয়া শুরু করার পূর্বে আমরা মুজাহিদ সাথীদেরকে এতে

অংশগ্রহণের দাওয়াত দেই। তারা আপত্তি জানিয়ে বলেন, আমরা ক্যাম্প থেকে খানা খেয়ে এসেছি। তাদের মধ্য থেকে একজন তার গানপোচের ভিতর হতে আচারের ছোট একটি বোতল বের করে আমাদের দস্তরখানের উপর রাখেন। আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে অবগত হই যে, তিনি করাচীর অধিবাসী ভাই অলীদ সাহেব। আমি বললাম, করাচীর মুজাহিদরা চরম বিপদজনক অবস্থাতেও আচার ও চাটনী সংগ্রহ করতে ভুলে না। আমার কথা শুনে সকল মুজাহিদ হাসতে থাকে। অলীদ সাহেব লজ্জা পান।

আমি গ্রেফতার হওয়ার এক দেড় বছর পর এই অলীদ ভাইও গ্রেফতার হন এবং কোট ভলওয়াল জেলে কয়েক বছর পর্যন্ত আমার সাথে থাকেন। তাঁর আসল নাম মুহাম্মাদ আরে রাজপুত। হযরত আকদাস মুফতী রশীদ আহমাদ সাহেব (দাঃ বাঃ)এর হাতে তিনি বাইয়াত হয়েছেন। তিনি উন্নততর ব্যবস্থাপনা, যোগ্যতা ও দ্বীনী মেজাযের ধারক ছিলেন। বন্দী থাকাকালীন সময় তিনি কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেন। অন্যান্য ধর্মীয় কেতাবাদিও পাঠ করেন। বর্তমানে তিনি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কলকাতার এক কারাগারে রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সসম্মানে ও নিরাপদে মুক্তি দান করুন।

আমরা তিনজন আহার করছিলাম আর অবশিষ্ট মুজাহিদগণ আমাদেরকে বেষ্টন করে বসেছিলেন। সেদিনের খাবার কয়েক দিক থেকে

স্মরণীয় ছিল বলে এত বিশদভাবে এর উল্লেখ করলাম। আমার সাথে এই খাবারে শরীক কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান ও রইস ভাই উভয়েই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। খানা খাওয়ার সময় আমাদের চতুর্দিকে উপবিষ্ট মুজাহিদদের মধ্য হতে বেশির ভাগই শাহাদতের মদিরা পান করেছেন। সম্ভবত আমি সহ চারজন এমন রয়েছি, যারা এখনো ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের বাস গ্রহণ করছি। বন্দী হওয়ার পূর্বে মুক্ত অবস্থায় আমার এটিই শেষ খাবার ছিল। কারণ ভোরবেলায় আমি কোন নাস্তা খাইনি, তবে চা পান করেছিলাম। আর পরদিন দুপুরের পূর্বেই আমরা বন্দী হই।

স্মরণীয় এই খাবারের মজলিস থেকে ফারেগ হওয়ার পর বিশ্রামের প্রোগ্রাম করা হয়। কয়েকজন মুজাহিদ পাহারা রত থাকেন। আর কিছু মুজাহিদ প্রাচীরে ঠেস দিয়ে ঝিমুতে থাকেন। কক্ষ ছিল সংকীর্ণ, আর লোক ছিল বেশি, ফলে আমরা ছাড়া আর কারো শোওয়ার জায়গা হয়নি। তবে বসে বসে ঘুমানোর সুবিধা কয়েকজনই পেয়ে যান। আমি এই সুযোগকে গনীমত মনে করে পাহারা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করি। উপস্থিত সময়ে সংক্ষিপ্ত এই সফরে জিহাদী আমলের ফযীলত লাভ করার এই একটি ব্যবস্থাই আমার কাছে ছিল। মুজাহিদগণ সামান্য আপত্তির পর আমার কথা মেনে নেন। সম্ভবত তারা আমাকে কোনরূপ বিপদের মুখে ফেলতে চাচ্ছিলেন না। একজন মুজাহিদের হাত

থেকে ক্লাশিনকভ নিয়ে আমি সিড়ি দিয়ে নামতে থাকি। সিড়ির উপরেই আমি লক খুলে ক্লাশিন নিরীক্ষণ করে দেখি, ওটি লোড করা আছে। অর্থাৎ ভারতের মুশরিকদের সাথে মুকাবিলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। আমার সাথে গমনকারী মুজাহিদ আমাকে বলেন যে, এখানে আমরা চব্বিশ ঘন্টা রাইফেল লোড করে রাখি। যাতে করে যে কোন অকস্মাৎ বিপদে মুকাবেলা করতে সক্ষম হই।

বাড়ীর বাইরের সড়কে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার ছেয়ে আছে। আমি এখানে দীর্ঘ সময় পাহারা দিতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পার হওয়ার পর মুজাহিদগণ আমাকে বলেন যে, আপনার পাহারার সময় শেষ হয়েছে। আমি অধিক সময় অবস্থান করার কথা বললে তারা বলেন যে, আপনি সওয়াব পেয়েছেন। এতটুকুই যথেষ্ট। ফেব্রুয়ারীর অন্ধকার ও হিমশীতল রাতের এই কয়েকটি মুহূর্ত ছিল আমার জন্য বিশেষ এক ধরনের পুলক ও ভাবে পরিপূর্ণ। জ্বি হাঁ, ভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সেই পুলক আর ভারতের যুদ্ধে পাহারা দেওয়ার সেই ভাব, যার মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাযওয়ায়ে হিন্দ (ভারত অভিযান) সম্পর্কে তার অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হাদীস এরশাদ করেছেন। এ হাদীসে তিনি ভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য জাহান্নাম থেকে

মুক্তির সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং এর শহীদদেরকে ‘আফযালুশ শুহাদা’ (শ্রেষ্ঠ শহীদ) আখ্যা দিয়েছেন। হে আল্লাহ! তোমার দেওয়া তাওফীকেই আমি অধম এই সৌভাগ্য লাভ করেছি। স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তুমিই এ মুহূর্ত কয়টি কবুল করে আমাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দান কর। সারাটি জীবন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর নিআমত দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান কর।

আমি মুজাহিদদের হাতে ক্লাশনিকভ দিয়ে দেই এবং কক্ষাভ্যন্তরে এসে ঘুমানোর চেষ্টা করি। এ বিষয়টি বিস্ময়করভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, বড় বড় ঘটনার প্রতিচ্ছবি মানব প্রকৃতি ও স্বভাবকে অনেক আগে থেকে প্রভাবিত করতে থাকে। আগামী দিন ছিল আমার গ্রেফতারীর দিন। যার প্রভাব রাতের অস্থিরতা ও অনিদ্রারূপে আমার উপর সওয়ার হয়। বারবার পার্শ্ব পরিবর্তন ও দুআ দরূদ পাঠ করি এবং ঘুমানোর পরিপূর্ণ চেষ্টা করি, কিন্তু ঘুম আসে না কোনভাবেই। আমার ডানে বামে ও সম্মুখে কয়েকজন উৎসর্গপ্রাণ মুজাহিদ কোলে ক্লাশিনকভ রেখে বসে বসে ঘুমাচ্ছে। কক্ষমাঝে হালকা হালকা নাক ডাকার শব্দও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আর আমি জেগে জেগে ঘুমের অপেক্ষা করছি।

ভারতীয় সৈন্যের বেষ্টনীতে আমার জীবনের বেশ কিছু রজনী এমনই অস্থিরতার মধ্যে নিদ্রার অপেক্ষায় অতিবাহিত হয়েছে। বন্দী হওয়ার পূর্ব রজনীও সেসব রজনীর অন্যতম। রাতের নিদ্রা আল্লাহ পাকের এমন এক নি'আমত, যার কোন বিকল্প নেই। বাল্যকালে এই নি'আমত আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ লাভ করেছি। পরে যখন মাদ্রাসায় ছাত্র জীবনের সূচনা হয়, তখন রাত এগারোটায় রাত শুরু হতে থাকে। কারণ, রাত এগারোটা পর্যন্ত তাকরার ও অধ্যয়ন করা ছিল মাদরাসার কানুনের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দিকে তো এগারোটা পর্যন্ত জাগ্রত থাকার প্রতি যত্ন নেই, কিন্তু কয়েক মাস পর যখন ইলমের স্বাদ পেতে থাকি, তখন ১২/১টা বাজার পর রাত আরম্ভ হত। তাছাড়া তের বছর বয়স থেকেই আমার জীবনের রাত সংকুচিত হতে থাকে। ছাত্র জীবনের শেষ কয়েক বছরে একটি মসজিদের ইমামতি ও খতীবের দায়িত্ব কাঁধে আসে। তখন অন্তরঙ্গ মুক্তাদীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত দ্বীনী মজলিসসমূহ রাতের সিংহ ভাগ সময়কে হরণ করতে থাকে।

শিক্ষা সমাপনের পর শিক্ষাদান ও জিহাদের ব্যস্ততা রাতকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করে। এমনকি অনেক রাত দিনে পরিণত হয়ে যায়।
অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, আমি সারারাত ঘুমিয়েছি, এমন রাত আমার এই জীবনে অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজেও দৃষ্টিগোচর হয় না।

হাঁ, আমার এমন অনেক রাতের কথা স্মরণ আছে, যেগুলোতে একেবারেই ঘুমানোর সুযোগ হয়নি।

সারকথা এই যে, রাতের বেশি অংশ জাগ্রত থাকা আমার এমন অভ্যাসে পরিণত হয় যে, তা খুব কমই বাদ যায়। তবে কতক রাতে কোনরূপ ব্যস্ততা ছাড়াই জাগ্রত থাকার উপাখ্যান সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ধরনের। আমার খুব ভালভাবে স্মরণ আছে যে, আল্লাহ তায়ালা যেদিন আমাকে ভারতের কারাগার থেকে মুক্তিদান করেন, তার পূর্বের রাতটিও বিস্ময়কর এক অস্থিরতা ও অনিদ্রার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। সে রাতের আলোচনা তো পরে আসবে ইনশাআল্লাহ। আজকের আলোচনায় চলছে বন্দী হওয়ার পূর্বের রাতের কথা। দুআ পাঠ করতে করতে ও পার্শ্ব পরিবর্তন করতে করতে রাতের শেষ ভাগে এক সময় কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু অল্প পরেই মুজাহিদগণ নামায পড়ার জন্য উঠতে আরম্ভ করে। আমি উঠে উযু করি, ফজর নামায ঐ কামরাতেই আমরা জামাআতের সাথে আদায় করি। সে সময়ের মুজাহিদ ও পরবর্তীতে সম্মানিত শহীদদের সম্মিলিত এই জামাআতের ইমামতির মর্যাদা আমি লাভ করি। নামায ও আমল পুরা করে পুনর্বার শুয়ে পড়ি, এ সময় খুব তাড়াতাড়ি নিদ্রা আমাকে আক্রান্ত করে।

সকাল নয়টার কাছাকাছি সময় আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলা হয় যে, সফরের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। রইস ভাই আমাকে বাড়ী থেকে বাইরে

এনে নিকটবর্তী একটি মসজিদে নিয়ে যান। সেখানে টয়লেট ও গরম পানির ব্যবস্থা ছিল। পবিত্র জুমুআর দিন হওয়ার কারণে স্থানীয় কয়েকজন বর্ষিয়ান বুযুর্গ ভোর থেকেই মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তারা মসজিদে পানি গরম করার চুলার পাশে বসে উষ্ণতা লাভ করছিলেন। কাশ্মীরের লোকেরা শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষভাবে যত্ন নিয়ে থাকে। অন্যান্য এলাকার লোকদের তুলনায় তারা নিজেদেরকে উষ্ণ রাখার অধিক ফিকির করে। উযু ও অন্যান্য কাজ থেকে অবসর হয়ে আমরা গাড়ীতে উঠে বসি। সাজ্জাদ সাহেব গাড়ী ষ্টার্ট করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি বিফল হন। আশপাশ দিয়ে অতিক্রমকারী কয়েকজন লোক অনেক দূর পর্যন্ত গাড়ী ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেলে ইঞ্জিন ষ্টার্ট হয়।

আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হব এমন সময় আমাদের পুরাতন এক মুজাহিদ সাথী মুহাম্মাদ শফিক সাহেব (স্বাধীন কাশ্মীরের অধিবাসী) বুড়া মানুষের মত হাতে লাঠি নিয়ে বের হয়ে আসেন। তিনি আফগানিস্তানের জিহাদে তার বীরত্ব, নির্ভীকতা ও খিদমতের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বর্তমানে কাশ্মীরের মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিছুদিন পূর্বে আহত হওয়ার কারণে তার চলাফেরা করতে লাঠির উপর ভর দিয়ে চলতে হয়। উষ্ণ তবে সংক্ষিপ্ত মোলাকাতের পর তিনি আমাদের

থেকে বিদায় নেন। বিদায়কালে তিনি আমাকে একটি তাসবীহ এবং একটি আতরের শিশি দেন। গ্রেফতার হওয়ার সময় তা গাড়ীতেই রয়ে যায়। অপরাপর অনেক সঙ্গীর মত শফিক ভাইয়ের সঙ্গে এই সাক্ষাতও শেষ সাক্ষাত প্রমাণিত হয়। তার শাহাদতের সংবাদও আমরা কারাগারে থাকা অবস্থায় পাই।

আমাদের গাড়ী ইসলামাবাদ অভিমুখে যাত্রা করে। গাড়ী ধাক্কা দিয়ে অনুগ্রহকারীরা উভয় হাত উঠিয়ে আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানান। আমরাও চলন্ত গাড়ী থেকে হাত নেড়ে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ক্ষুদ্র এই গ্রাম অতিক্রম করি। মুহতারাম সাজ্জাদ খান সাহেব বললেন, আমাদের পরবর্তী মঞ্জিল ইসলামাবাদের জামে মসজিদ। যে মসজিদে দক্ষিণ কাশ্মীরের মীর ওয়ায়েয জনাব কাযী নিছার সাহেব খতীবের দায়িত্ব পালন করতেন। মুজাহিদদের সঙ্গে কাযী নিছার সাহেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার মসজিদে মুজাহিদদের অবিরত আনাগোনা চলত। সাজ্জাদ সাহেব সেই মসজিদে আমার দ্বারা বক্তব্য প্রদান করাতে চাচ্ছেন। সম্ভবত তিনি কাযী সাহেবের নিকটও এ সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন। ছয় লাখ ভারতীয় সৈন্যের বেষ্টনকৃত কাশ্মীরের কেন্দ্রীয় একটি জামে মসজিদে একজন মুজাহিদ মেহমানের বক্তৃতা প্রদান করা কিভাব সম্ভব হতে পারে তা আমার বুঝে আসছিল না। কিন্তু মুজাহিদরা

সুদূর পরাহত এ কাজকেও বিভিন্ন পন্থায় সম্ভব করেছিলেন। ইসলামাবাদ তো পরের কথা খোদ শ্রীনগরের জামে মসজিদ এবং হযরত বাল দরগাহ মসজিদেও মুজাহিদদের বয়ান হত। বয়ান শেষে মুজাহিদগণ নিরাপদে যার যার গৃহে ফিরেও যেতেন।

আমরা পরস্পর কথাবার্তা বলতে বলতে ধীরগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমি কাযী নেছার সাহেবের নাম এই সফরে প্রথম শুনি। তিনি আমার অপরিচিত তবে কারাগারে গিয়ে তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। তার কিছু রচনা পাঠ করারও সুযোগ হয়। কাযী সাহেবও আযাদী আন্দোলনে সহযোগিতার অপরাধে কারাবরণ করেন। তিনি কারাগারে নামাযের মাসআলা সংক্রান্ত একটি পুস্তিকাও সংকলন করেন। যার মধ্যে এতদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালাসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। কারাগারে থাকা অবস্থায় আমি কাযী সাহেবের শাহাদতবরণের সংবাদও শুনতে পাই। এটি ছিল আমার জন্য বড় বেদনাদায়ক একটি সংবাদ। কিন্তু সেই অদৃশ্য হাত সম্পর্কে এখনো কিছুই জানা যায়নি যা (রহস্যজনকভাবে) কাজী সাহেবকে শহীদ করে দেয়।

এ সম্পর্কে মৌখিক কিছু তথ্য আমরা জানতে পারি। সেই তথ্য নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক ছিল। আমরা সবেমাত্র আধা ঘন্টার পথ অতিক্রম করেছি এমন সময় আমাদের গাড়ী

হোচট খেয়ে খেয়ে অবশেষে বন্ধ হয়ে গেল। সাজ্জাদ সাহেব ও রইস ভাই গাড়ী ষ্টার্ট করানোর অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সাজ্জাদ সাহেব গাড়ী ধাক্কা দেওয়ার কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য আমাকে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে দেন। আর নিজে রইস ভাইয়ের সাথে ধাক্কা দিতে থাকেন। অনেক কষ্টের পর গাড়ী ষ্টার্ট নেয়।

আমি আট দশ মিনিট পর্যন্ত খুব দ্রুত গাড়ী চালাই এবং বন্দী হওয়া থেকে কয়েকবার রক্ষা করি। কিন্তু গাড়ী পূনরায় খারাপ হয়ে যায়। এবার ধাক্কা সহ অন্যসব ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয়। আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে তারা উভয়ে অন্য বাহনের খোঁজে বের হন। অনেক তালাশ করার পর একটি অটো রিক্সা পেয়ে যাই। যাকে কাশ্মীরে থ্রী হুইলার বলা হয়। সাজ্জাদ সাহেব ও আমি পিছনের সিটে বসি, আর রইস ভাই ড্রাইভারের পাশে বসেন। জুমুআর দিনের আমল মোতাবেক আমি রিক্সায় বসে সূরায়ে ইয়াছিন, এক মঞ্জিল কুরআন মাজিদ এবং সূরায়ে কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করি। চলতে চলতে আমি অনুভব করি যে, সাজ্জাদ সাহেব অত্যন্ত অস্থির। তিনি বারবার অগ্র-পশ্চাতে ও ডানে বামে তাকাচ্ছিলেন। রিক্সাওয়ালা একটি বাঁক অতিক্রম করতেই সম্মুখে একটি সিভিলিয়ান ট্রাক দৃষ্টিগোচর হয়। রিক্সাওয়ালা পরিস্থিতি উপলব্ধি করে

উচ্চ স্বরে বলে উঠে ‘আর্মি’। সাজ্জাদ সাহেব ইন্নালিল্লাহ..... পাঠ করেন। আমি তাদের আওয়াজ শুনে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি যে, দৃশ্যই অন্যরকম। আমরা চতুর্দিক থেকে ভারতীয় সৈন্যের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি।

বন্দী হলাম
একটি রিক্সায় আরোহণকারী চারজন লোক এক সঙ্গে বিপদে পড়ে গেছি। কয়েক মুহূর্তের সেই জটিল পরিস্থিতি এমন ভয়ংকর ছিল যে, তার প্রকৃত অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। রিক্সা তো প্রাণহীন, তার কাছে স্বাধীনতা আর পরাধীনতা এক সমান। রিক্সার ড্রাইভার যথেষ্ট নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ সে বিশেষ কোন অপরাধী নয়।.... এও সম্ভব যে, তার মিশন পূর্ণ হয়েছে, সে এখন বড় অংকের পুরস্কারের যোগ্য হয়েছে। তবে এটা অবশ্য একটি সম্ভাবনা মাত্র। রিক্সা ড্রাইভারের সঙ্গে উপবিষ্ট মুজাহিদ সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র সজ্জিত। তাই সেও মোকাবেলা করে সহজেই শাহাদতবরণ বা মুক্তিলাভ করতে পারে। কিন্তু পিছনের সিটে উপবেশনকারী ব্যক্তিদ্বয় অকস্মাৎ এই বিপদে মারাত্মকভাবে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। একদিকে তারা মুজাহিদদের দায়িত্বশীল এবং একটি জিহাদী সংগঠনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য। অপরদিকে তারা নিরস্ত্র।

রিক্সার সকল আরোহী যদি অস্ত্রে সজ্জিত হত, তাহলে বিষয়টি এত বিপদজনক ছিল না। তখন সম্মুখস্থ মুজাহিদ তার অস্ত্র দিয়ে মুকাবিলা করে রিক্সার নিকটস্থ সৈন্যদেরকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে কিংবা পলায়ন করতে বা পিছু হটতে বাধ্য করত। আর এই অবকাশে পশ্চাতে উপবিষ্ট মুজাহিদদের সামলে উঠতে, রিক্সা থেকে অবতরণ করতে এবং অনুকুল নীচু জায়গায় গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ মিলত। এমনইভাবে যদি সকল মুজাহিদই নিরস্ত্র হত, তাহলেও বিষয়টি অনেকটা কম বিপদজনক হত। কারণ, এরূপ প্রকট সম্ভাবনা ছিল যে,তল্লাশী করে সেনাবাহিনীর লোকেরা যখন কিছুই না পেত, তখন সাধারণ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিত।

সাধারণ এই জিজ্ঞাসাবাদের জবাব কমাণ্ডার সাজ্জাদ খানের নিকট সবসময় প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তিনজন মুজাহিদের মধ্য থেকে একজন সশস্ত্র আর দুইজন একেবারেই নিরস্ত্র। ভারতীয় একজন সৈন্য ড্রাইভারকে রিক্সা থামানোর জন্য ইঙ্গিত করে। এই ইঙ্গিত দানের কোনই কারণ ছিল না। কারণ, সংকীর্ণ পাহাড়ী পথের মোড় এবং সড়কের উপর দণ্ডায়মান সৈন্যের কারণে রিক্সা আগে থেকেই থেমে ছিল। একজন সৈন্য রইস ভাইকে নীচে নামতে বলে। তিনি পিছন দিক ফিরে সাজ্জাদ সাহেবের দিকে তাকান। চোখের ইঙ্গিতেই সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। রইস ভাই

নিশ্চিন্তে নীচে নামেন। তার যাবতীয় অস্ত্র ফার্নের (কাশ্মীরী পরিধেয়) নীচে লুকানো ছিল। সৈন্যটি উভয় হাত উচু করে দাঁড়াতে বললো যাতে সে তল্লাশী চালাতে পারে। তখন তিনি চিতার ন্যায় দ্রুত সৈন্যটিকে শূন্যে উঠিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেন। আর অপরাপর সৈন্যের দিকে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে জোরে লাফ দিয়ে প্রাণান্তকর দৌড় শুরু করেন। ভারতীয় সৈন্য এই অকস্মাৎ পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাদের সামলে উঠতে কিছু সময় ব্যয় হয়। তারপর তারা রইস ভাইয়ের দিকে মুষলধারে ফায়ারিং করতে থাকে।

আমরা অটো রিক্সায় বসে এ সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখছিলাম। আর্মি অফিসার ও সৈনিকরা বিভিন্ন পজিশন থেকে ফায়ার করছিল আর রইস ভাই বামদিকে অবস্থিত বাড়ীগুলোর দিকে অতি দ্রুত দৌড়াচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি তার চেষ্টায় সফল হন এবং বাড়ীর ভীড়ে হারিয়ে যান। ডজন ডজন সৈন্যের ফায়ারিংয়ের মধ্য থেকে তার এভাবে বেঁচে যাওয়া এমনই এক ঘটনা, যা মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করে। রইস ভাইয়ের শাহাদতের নির্ধারিত মুহূর্তটি আসতে এখনো দেড় দুই বছর বাকী ছিল, বিধায় গুলি তার আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমনিভাবে অস্ত্রের বরকতে তিনি গ্রেফতার হওয়া থেকেও বেঁচে যান।

জিহাদের অস্ত্র নিঃসন্দেহে বিরাট বড় বরকত ও হিফাজতের উপকরণ। এ কারণেই ইসলামের শত্রুদের সর্বদা এ চেষ্টা থাকে যে মুসলমানগণ যেন অস্ত্র থেকে দূরে থাকে। কারণ জিহাদের নিয়তে অস্ত্র ধারণকারীগণ কস্মিনকালেও দাসত্বকে মেনে নেয় না এবং দাসত্বের জিঞ্জির তাদের গলায় পরানো যায় না। এই মূলনীতির অতি দীর্ঘ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা কাফেরদের রয়েছে। আজ তাই তারা মুসলমানদের অস্ত্রের মুকাবেলা করার পরিবর্তে মুনাফিকদের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে নিরস্ত্র করার পাকাপোক্ত ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেন এবং মুসলমানদেরকে জিহাদী অস্ত্রের মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবনের তাওফীক দান করেন। আজ আমাদের সম্মুখে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে, যেগুলো দেখে আমরা খুব ভালভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জিহাদী অস্ত্র মুসলমানদের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের চেয়েও অধিক জরুরী।

ইংরেজরা ভারতের মুসলমানদেরকে নিরস্ত্র করেছিল, ফলে আজ সমগ্র উপমহাদেশে মুসলমানদের কুশল জিজ্ঞাসা করারও কেউ নেই। বাংলাদেশ কুফরী ও ধর্মান্তরের আক্রমণে প্রকম্পিত, কাশ্মীরে মুসলমানদের খুন পানির মত সস্তা করে দেওয়া হয়েছে। আর

ভারতের মুসলমানরা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান রক্ষার ব্যাপারে পর্যন্ত আশংকা করছে। কিন্তু আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের আফগানী ভাইয়েরা জিহাদের অস্ত্রকে প্রাণের মত ভালবেসেছে। ফল এই হয়েছে যে, ইংরেজদের থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়নের রক্তপায়ী হিংস্র সৈন্য বাহিনী পর্যন্ত কেউই তাদেরকে নত করতে পারেনি এবং কেউই আফগানীদেরকে গোলাম বানানোর সুযোগ পায়নি।

পরিশেষে, আল্লাহ তাআলা জিহাদী এই অস্ত্রের বদৌলতেই আফগানীদেরকে ইসলামী ইমারাত এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার মত এমন সব নি'আমত দান করেছেন, যেগুলো থেকে হারামাইনের (মক্কা-মদীনা) পাশে বসবাসকারী আরবরা পর্যন্ত আজ বঞ্চিত। আজ আফগানীদের নিকট ইসলাম সংরক্ষিত। তারাই ইসলামের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আল্লাহ তাআলা আফগানীদেরকে ইসলামের মাধ্যমে এবং ইসলামকে আফগানীদের মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন। সুতরাং বর্তমানে বিশ্বের জালেম ও কাফেরদের ব্যবস্থাপনা থেকে কেউ মুক্ত থাকলে একমাত্র আফগানই রয়েছে। পাকিস্তানও যেটুকু নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা লাভ করে থাকে, তাও এই মুজাহিদদের কারণে ও জিহাদী অস্ত্রের বরকতে। এ জন্যই বিশ্বের তাবৎ ইসলাম দুশমন দেশগুলোর অন্তরে পাকিস্তানের মুজাহিদ

এবং তাঁদের হাতের ছোটখাট অস্ত্র চরমভাবে বিধে থাকে। তারা আরব দেশগুলোর মত পাকিস্তানকেও তাদের কলোনী বানাতে চায়। কিন্তু পাকিস্তানের আলেম ও মুজাহিদগণ তাদের পথের প্রতিবন্ধক। সুতরাং এখন তারা তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে যে কোনভাবে পাকিস্তানের মুজাহিদদের গলা টিপে ধরার কাজ শুরু করেছে।

অতি সম্প্রতি বৃটেনের পক্ষ থেকে কয়েকটি জিহাদী সংগঠনের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আক্রমণাত্মক বিবৃতি এবং তথাকথিত মুনাফেক চরিত্রের বুদ্ধিজীবিদের পত্রপত্রিকায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রচারিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ, হতভাগ্য এ উদ্যোগেরই অংশ। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দেন। কেননা আল্লাহ না করুন, যদি এই উদ্যোগ সফল হয় এবং পাকিস্তানে বিদ্যমান জিহাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বিফল হয়, তাহলে এইদেশ মারাত্মক ধরনের গৃহযুদ্ধের শিকার হবে এবং শত্রুরা এই দেশকে পূর্ণরূপে হস্তগত করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

কথা অনেক দূর চলে গেছে। রইস ভাইয়ের কথা বলছিলাম যে, তিনি তাঁর জিহাদী অস্ত্রের বরকতে শত শত শত্রু সৈন্যের মধ্য হতে নিজেকে বের করে নিতে সফল হলেন। শত্রু বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য তার পশ্চাতে বাড়ীগুলোর দিকে অগ্রসর হল। কয়েকজন সৈন্য

ওয়ারলেস অন করে চতুর্দিকে তার পালানোর সংবাদ দিল। আর অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য মারাত্মকভাবে অটো রিক্সাটিকে ঘিরে ফেলে। তারা সকলে নিজেদের ব্যর্থতার কারণে চরম ক্রুদ্ধ ছিল। আর আমরা তিনজন মানবরূপী নিরস্ত্র শিকার তাদের হাতে ছিলাম। তারা আমাদেরকে অটোরিক্সা থেকে নামিয়ে তল্লাশী শুরু করে। আমাদের তিনজনের হায়াত তখনও অবশিষ্ট ছিল। বিধায় রইস ভাইয়ের নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডও ফাটেনি এবং ভারতীয় সৈন্যের অভ্যাস মত নিজেদের পরাজয়ের ঝাল মিটানোর জন্য তারা আমাদের উপর গুলিও চালায়নি। বন্দী হওয়ার পর একজন শিখ ক্যাপ্টেন এ বিষয়ে খোলামেলাভাবে বিস্ময় প্রকাশ করে। সে আমাদেরকে বলে যে, তোমাদের ভাগ্য ভাল। তোমাদের সঙ্গীর নিক্ষিপ্ত গ্রেনেড যদি ফেটে যেত এবং আমাদের সৈন্যের কোন ক্ষতি হত, তাহলে আমরা তোমাদেরকে তৎক্ষণাৎ খতম করে দিতাম। শিখ অফিসারটি ঠিকই বলেছিল।

অতীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, ভারতীয় সৈন্য তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য অনেকবার নিরস্ত্র লোকদেরকে গুলি করে অথবা পুড়িয়ে মেরেছে। কয়েকজন সৈন্য অত্যন্ত কঠোরভাবে আমাদের তল্লাশী করে, কিন্তু তারা আপত্তিকর কোনকিছুই পায়নি। আমার পকেটে আমার সফরের কাগজপত্র ও টাকা-পয়সা ছিল। আর সাজ্জাদ খান সাহেবের পকেটে তার

এমন কিছু কাগজ ছিল, যেগুলো তিনি ইণ্ডিয়ান আর্মিদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সর্বদা সাথে রাখতেন। সেনাবাহিনীর লোকেরা আমাদের নিকট পলাতক মুজাহিদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমরা সকলে একই কথা বললাম যে, আমরা ইসলামাবাদ (অনন্তনাগ) যাওয়ার পথে এ লোকটি রাস্তা থেকে জোরপূর্বক আমাদের সাথে উঠে বসে। কাশ্মীরী ভাষার উপর সাজ্জাদ সাহেবের যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি সৈন্যদেরকে বলেন যে, তিনি গান্দরবেলের অধিবাসী একজন ব্যবসায়ী। গালিচার ব্যবসা উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় সফর করে থাকেন। আমার সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইনি একজন পীর সাহেব। মুরীদদের সাথে দেখা করার জন্য কাশ্মীর এসেছেন।

সৈন্যরা তল্লাশী ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এবং আমাদের কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্যে একজন কাশ্মীরী গুপ্তচরকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। সে কাশ্মীরী ভাষায় সাজ্জাদ সাহেবকে কয়েকটি প্রশ্ন করে, সেগুলোর সন্তোষজনক উত্তর তাকে দেওয়া হয়। এ সামগ্রিক অবস্থা দেখে সৈন্যরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। তাদের একজন অফিসার আমাদেরকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়। আমরা রিক্সায় উঠে মাত্র বসেছি, এসময় অন্য একজন অফিসার আমাদেরকে থামিয়ে দিয়ে তার পিছে পিছে যেতে বলে। আমাদের

রিক্সা সেনাবাহিনীর গাড়ীর বহরের মাঝখানে ছিল। কিছু গাড়ী ছিল আমাদের সম্মুখে আর কিছু ছিল আমাদের পিছনে। গাড়ীর সৈন্যদের ছোট বড় রাইফেলের মুখ আমাদের দিকে তাক করা ছিল। কিছু দূর গিয়ে তারা গাড়ী দাঁড় করায় এবং আমাদেরকে অটো রিক্সা থেকে নামিয়ে হাত বেঁধে তাদের একটি গাড়ীতে তুলে নেয়। তখন আমাদের গ্রেফতারীর প্রথম ধাপ পুরা হয়ে যায়। আমাদের হাত বেঁধে ফেলা হয়েছিল। গাড়ীগুলো সেনা ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছিল। আমাদের আশেপাশে উপবিষ্ট সৈন্যরা আমাদেরকে অশ্লীল ভাষায় বকাবকি করার সাথে সাথে ভীতিও প্রদর্শন করে। আর আমরা অসহায় ও অপারগতার এই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার যিকির করছিলাম। আমাদের রসনায় জারী □□□-

لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

গালি বর্ষণ

পথিমধ্যে একবার গাড়ী থামিয়ে আমাদের খারাপ গাড়িটি তল্লাশী করা হয়। কমাণ্ডার সাজ্জাদ খান তাদেরকে বলেছিলেন —আমরা আমাদের নিজস্ব গাড়ীতে সফর করছিলাম। পথে তা খারাপ হয়ে যাওয়ায় অটো রিক্সা নেই। ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা গাড়ী কোন স্থানে খারাপ হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করলে সাজ্জাদ সাহেব সঠিক জায়গার কথা বলে দেন। সুতরাং তারা ফেরার পথে পুরা কনভয় দাঁড় করিয়ে

গাড়ীটি তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করে। তারপর সেটিকে একটি ট্রাকের পিছে বেঁধে নেয়।
এখান থেকে রওয়ানাকালে তারা আমাদের দু’জনকে ভিন্ন ভিন্ন গাড়ীতে উঠিয়ে নেয়। সম্ভবত তাদের সন্দেহ ধীরে ধীরে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছিল। আর তার সাথে সাথে তাদের আচরণও নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হচ্ছিল। আমার জন্য এটি ছিল জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতা। আমি ইতিপূর্বে জীবনের এই মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো এক মিনিটের জন্যও বন্দী হইনি। অনেক বারই পুলিশের মুখোমুখী হয়েছি, কিন্তু কখনো বন্দী হতে হয়নি। অনেক জায়গায় বন্দীত্বের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও মুক্তি নসীব হয়েছে। বিস্ময়কর হলো—পুলিশ ও সৈনিকদের প্রকৃত রূপ গ্রেফতার হওয়ার পরই দেখা যায়। অন্যথায় সাধারণত তারা সম্মানিত জনদের সঙ্গে শালীন ও ভদ্র আচরণ করে থাকে। তবে একই মজলিসে যদি সে সম্মানিত লোকটিকে গ্রেফতার করার সুযোগ পায়, তখন তাদের ভদ্রতা মুহূর্তের মধ্যে তিক্ততা ও অভদ্রতায় পরিণত হয়। তখন তারা এমন অসভ্য হয়ে যায় যে, তারা যে কখনো কারো সাথে ভদ্র আচরণ করেছে এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

আমি ইতিপূর্বে কখনো গ্রেফতার হইনি, বিধায় পুলিশ ও সেনা অফিসারদের সর্বদা

ভদ্রভাবেই কথা বলতে ও আচরণ করতে দেখেছি। কিন্তু এ ঘটনার পর থেকে যখন আমার গ্রেফতারীর ধারা চলতে থাকে, তখন আমার পুলিশ ও সেনা অফিসারদের এই বিপরীতধর্মী আচরণ বারংবার দেখার সুযোগ হয়েছে। এরা যখন কোন লোককে সম্মানের সাথে চেয়ারে বসিয়ে কথাবার্তা বলে, তখন তাদের কথাবার্তায় ভদ্রতা ভালবাসা ও সৌজন্যের মধুরতা ভরা থাকে। কিন্তু তার কথামতে কাজ না হলে অথবা উপরওয়ালাদের পক্ষ হতে এ লোকের ব্যাপারে স্বাধীনতা পেয়ে গেলে, সাথে সাথে চেয়ার থেকে নামিয়ে গালাগাল শুরু করে দেয়। এবং এ কারণেও কষ্ট দেয় যে, একটু পূর্বে তুমি চেয়ারে বসেছিলে কেন।

উপমহাদেশে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইংরেজ প্রবর্তিত। এই ব্যবস্থা মানুষকে নিজের থেকে শক্তিধরের তোষামোদ করা, আর নিজের চেয়ে দুর্বলের উপর জুলুম করার সবক শিক্ষা দেয়। কপটতা ও ‘ঝোপ বুঝে কোপ মারা’ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকেরা ঠেকলে ভদ্র, আর সাধারণ অবস্থায় অত্যাচারী ও অসভ্য। এরা অন্যকে অসম্মান করা নিজেদের কর্তব্য মনে করে। অথচ তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন তাদের এসব বদস্বভাব ও দুর্নীতির কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে

পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া তাদের ললাটের লিখনে পরিণত হয়।

উপরোস্থ অফিসারদের চক্ষু বন্ধ করে আদেশ দেওয়া, আর অধীনস্থদের তাদের প্রত্যেক কথায় ‘ইয়েস স্যার’ বলা, তাদের ভিতর থেকে মানবতার উৎকর্ষতা ও উদার মনোবৃত্তি এভাবে শেষ করে দেয় যে, তাদের অন্তত থেকে ‘পদ’ ছাড়া অন্য সব জিনিসের মর্যাদা বের হয়ে যায়। ফলে নিজের উপরোস্থ কর্মকর্তার সর্বপ্রকার বুদ্ধি ও যুক্তিহীন মতামত, নির্দেশ ও কর্মকাণ্ড সহ্য করা ও মেনে নেওয়া, আর জুনিয়ারদের প্রত্যেক উপকারী কথাকেও প্রত্যাখ্যান ও প্রতিবাদ করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়। বড় অফিসার গালি দিলেও বা ক্ষতিকর কথা বললেও ‘জ্বি স্যার’ বলে তা মেনে নেয়। আর জুনিয়ার লোক যদি তাকে আবে হায়াতের (অনন্ত জীবনের) পথও প্রদর্শন করে তবুও ‘শাটাপ’ বলে তার কথা প্রত্যাখান করে।

ইংরেজের অমানবিক ও অনর্থক ব্যবস্থাপনার এই প্রতিক্রিয়া পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ অফিসারই গ্রহণ করে থাকে। তবে কিছু কিছু সৌভাগ্যবান নিজের জন্মগত বা খানদানী গুণের কারণে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া থেকে কিছুটা মুক্ত থাকে।

ইণ্ডিয়ান আর্মী অফিসার ও সাধারণ সৈন্যরা মন খুলে ও অবাধে আমাদের উপর গালি বর্ষণ করছিল। আর আমি মহান আল্লাহর ‘তাসবীহ’ পাঠে

রত ছিলাম। জিহাদের পথে গ্রেফতারী কোন অবাক করার বা নতুন কোন বিষয় নয়। তবে অতীতে আমি ঘটনাচক্রে এ ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করিনি। বিধায় সৈনিকদের গালাগালিতে তীব্র মনোবেদনা হচ্ছিল। এমন ভাষা আমি ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি। বাল্যকালে বাড়ীর পরিবেশ ছিল গালি থেকে পবিত্র। সম্মানিতা মায়ের পরিচর্যা গালি দেওয়া ও শোনার ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, তাকেই গালি শুনতে হয়, যে কিনা গালি দেওয়ায় অভ্যস্ত। চেতনা ও বুদ্ধির প্রথম প্রহরগুলোতে পারিবারিক পরিবেশের বরকতে গালাগালি থেকে মুক্ত থাকি। বার বছর বয়সে জামেয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া করাচীতে আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলামী পরিবেশ দান করেন, সেখানকার তৎকালীন উস্তাদগণ যুগের ইমাম ও ইসলামী আখলাকের ছাঁচে গড়া ছিলেন। আমাদের শিক্ষাজীবনের প্রথম বছরেই শিক্ষা পাই যে, নিজের কোন সঙ্গীকেও ‘তুই’, ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করবে না। বরং সকলকে আপনি বলে ডাকবে। এই নৈতিক শিক্ষার উপর আমল করার এই বরকত লাভ করি যে, আমি অন্যদেরকে ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করায় আমাকেও কারো থেকে ‘তুই’ ‘তুমি’ শব্দ শুনতে হয়নি। আমাদের সকল সহপাঠী পরস্পরকে আপনি বলে সম্বোধন করতো। তাছাড়া আমাদের সম্মানিত উস্তাদগণ ছাত্রদেরও একইভাবে সম্বোধন করতেন। মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা

সমাপনের পর জিহাদের ও দাওয়াতের পরিবেশ পাই। তখনও ‘তুই’, ‘তুমি’ শব্দ ব্যবহারের প্রশ্নই ছিল না। করাচীতে অনেকবার পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বাক বিতণ্ডা হয়েছে, কিন্তু গ্রেফতার হয়নি বলে তাদেরকে ভদ্রভাবেই কথা বলতে শুনেছি। গ্রেফতারের পূর্বে তারা সাধারণত যেমন বলে থাকে।

আল্লাহ প্রদত্ত অতীতের এসকল নিআমত ও দান আমার প্রকৃতি ও স্বভাবকে কিছুটা নাজুক করে দেয়। তাই মুশরিকদের গালিও আমার অন্তরে গুলির মত বিধছিল। দুঃখ বেদনায় অন্তর ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু এ সবই ছিল আমার ভাগ্যের লিখন। যা আমাকে পরবর্তীতেও দীর্ঘদিন সইতে হচ্ছে। আমি জানিনা এগুলো আমার প্রশিক্ষণ ছিল, না গুনাহর কাফফারা। আমার মেজাযের সংশোধন ছিল, নাকি আমার পাপের পরিণতি। যাই হোক না কেন, যা কিছু হচ্ছে সব মালিকের পক্ষ থেকেই হচ্ছে। তিনি এমন মালিক যে, তিনি বান্দার উপর কখনো জুলুম করেন না। তাঁর কোন কাজই হিকমত থেকে খালি থাকে না।

শিশুকালে ও বাল্যকালে বেশির ভাগ মানুষ ঝগড়া বিবাদ করে থাকে। পরস্পর ভালমন্দ বলে থাকে। চড়-থাপ্পড় বর্ষণ করে। ফলে তাদের প্রকৃতি এ সবের জন্য কিছুটা যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার ব্যাপারে এমন ঘটল যে, আমি ঝগড়া বিবাদের সুযোগ শিশুকাল ও বাল্যকালেও খুব একটা পাইনি। যখন থেকে

আমার চেতনার চক্ষু খুলেছে, তখন থেকে আমার মুখমণ্ডল চড় থাপ্পড় থেকে এবং আমার শ্রবণেন্দ্রীয় গালি শোনা থেকে অনেকটাই হেফাজতে থাকে। বন্দী হওয়ার দিন পর্যন্ত বাল্যকালের সাধারণ দুই একটি ঝগড়া বিবাদ ছাড়া কখনই আমার ঝগড়া বিবাদের সুযোগ হয়নি। বাড়ীতে সহোদর বড় ভাইয়ের সঙ্গে সংঘটিত কুস্তি লড়াই-এর কথা অবশ্য ভিন্ন। কারণ, সেগুলোতে ক্রোধ ও প্রতিশোধের স্থলে ভালবাসা ও হৃদ্যতার দিক প্রবল থাকে। একদিকে হলো এ অবস্থা, আর অপরদিকে আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন জিহাদের অংশ। সেখানে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ'ই (আল্লাহর পথে সশস্ত্র সংগ্রাম) মূল ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যেন কুদরত আমাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ছোট খাটো লড়াই থেকে বাঁচিয়ে সম্মিলিত পর্যায়ের বড় লড়াইয়ের জন্য দাঁড় করে দিয়েছেন। সেই লড়াই, যা দুনিয়াতে শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতার সম্মান প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। ইসলাম ও মানবতার খাতিরে উৎসর্গিত সম্মিলিত এসব লড়াই অর্থাৎ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ’র জন্য প্রকৃতি ও স্বভাব সুদৃঢ় হওয়া জরুরী। আর সম্ভবত তারই প্রশিক্ষণের জন্য আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সেনা কনভয় ইসলামাবাদের (অনন্তনাগ) একটি সেনা ক্যাম্পের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। গালি ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি আমার

উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বর্ষিত হচ্ছিল। আমার হাত ছিল বাঁধা। আমার সফরসঙ্গী কমাণ্ডার সাজ্জাদ সাহেব কোথায় তাও আমার জানা ছিল না। এ অবস্থায় হঠাৎ আমাদের গাড়ী ঝাকি খেয়ে থেমে যায়। কয়েকজন সৈন্য আমাকে ধরে উঠায় এবং গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে কয়েকটি গাড়ী অতিক্রম করে তুলনামূলক ছোট একটি সেনা- গাড়ীর সম্মুখে নিয়ে যায়। আমি দেখলাম, কমাণ্ডার সাজ্জাদ সাহেব ঐ গাড়ীতে সৈন্যদের মধ্যে উপবিষ্ট। তিনি সৈন্যদেরকে বলছেন, তোমাদের অফিসারকে ডেকে আন, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করব।

কমাণ্ডার সাজ্জাদ (রহঃ)এর আদর্শ কুরবানী দৃশ্যটি ছিল বড়ই বিস্ময়কর। কমাণ্ডার সাজ্জাদ খানের সিংহের মত স্ফটিক স্বচ্ছ নয়নযুগল জ্বলজ্বল করছিল। তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রকৃতির অধিকারী ব্যক্তি। মনের অবস্থা গোপন করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তবে আবেগপূর্ণ কতক স্থানে তার চোখ জ্বলজ্বল করত এবং তার প্রভা বৃদ্ধি পেত। দৃষ্টির এই ঔজ্জ্বল্য তার মনের অবস্থা ব্যক্ত করত। আমি আমার জীবনে অনেকবারই তার দৃষ্টির এই ঔজ্জল্য প্রত্যক্ষ করেছি। অনেক সময় অশ্রু তার চোখের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে ক্ষীণ করে

দিত। তবে তিনি মানুষের সম্মুখে খুব কমই কাঁদতেন। খুব কম সময়ই তার অশ্রু চোখের বাইরে আসত। ইসলামের ইতিহাসে আত্মত্যাগ ও অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার ঘটনাবলীর অভাব নেই।

প্রত্যেক যুগে আল্লাহর একনিষ্ঠ ও দৃঢ় সংকল্প বান্দাগণ আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য মৃত্যুকে চুম্বন করেছে। অন্যের মাথাকে ফাঁদ মুক্ত করে আপন গলায় ফাঁদ পরিধান করেছে। ইতিহাসের পাতায় সংকল্পের মিনারে দণ্ডায়মান এ সকল প্রেমিকের উপাখ্যান সংরক্ষিত রয়েছে। তারা অন্যের মুখে পানি তুলে দিয়ে নিজেরা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেছেন। কিন্তু তাদের সেই তৃষ্ণা আজও স্বার্থপরতার ব্যাধিতে আক্রান্ত পৃথিবীর অসংখ্য মুসলমানকে ত্যাগ ও কুরবানীর অমীয় সুধা পান করিয়ে থাকে।

২৮শে শাবান ১৪১৫ হিজরী মোতাবেক ১১ এপ্রিল ১৯৯৪ ঈসায়ী জুমআবারে দুপুরের পূর্ব মুহূর্তে সাড়ে এগারটায় কমাণ্ডার সাজ্জাদ শহীদ (রহঃ) ও ইসলামের এ সকল আত্মত্যাগী প্রেমিকদের তালিকায় আপন নাম লিখিয়ে নেন। তার এই কীর্তি ও আত্মত্যাগের এই মুহূর্ত ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত এক উজ্জ্বল আদর্শরূপে মুজাহিদদেরকে পথ প্রদর্শন করতে থাকবে। তিনি কয়েকজন আর্মিকে বলছিলেন, তোমাদের

অফিসারকে ডেকে আন। আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করব। ইণ্ডিয়ান সৈন্য, যারা সর্বদা কাশ্মীরের মুজাহিদদের তীব্র চাপের মুখে থাকে, তারা এরূপ প্রস্তাবে খুবই খুশী হয়। কারণ, সাধারণত এ ধরনের প্রস্তাব নিজের মুক্তির বিনিময়ে বড় কোন মুজাহিদকে গ্রেফতার করানোর বা অস্ত্রের বড় কোন ভাণ্ডারের তথ্য দেওয়ার জন্য দেয়া হয়। সাজ্জাদ সাহেব কাশ্মীরে দীর্ঘ রণ অভিজ্ঞতা রাখার কারণে ইণ্ডিয়ান আর্মীদের প্রকৃতি ভালরূপে অবগত ছিলেন। এ কথা শুনতেই সৈনিকরা তাদের কমাণ্ডিং অফিসারকে ডেকে আনে। এসব দৃশ্য দেখে আমি খুবই বিস্ময়াভিভূত ছিলাম। আমার বুঝে আসছিল না যে, কি হচ্ছে। এক মিনিটের মধ্যেই কমাণ্ডিং অফিসার আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

মধ্যম গড়নের, স্বাস্থ্যবান ও গোল শ্যামল চেহারার বর্ষিয়ান এক কর্নেল। স্বীয় মস্তকে লাল তিলক লাগানো (হিন্দু মুশরিকরা তাদের মন্তকে ফোটা বা লম্বা রেখার আকৃতিতে যে রং লাগায় তাকে তিলক বলে, তারা একে খুবই কল্যাণকর একটি ইবাদত মনে করে)। সে আগমন করতেই সাজ্জাদ সাহেব উচ্চ স্বরে বললেন, ‘অফিসার সাহেব, মুবারক হোক। আজ আপনি বড় ধরনের একটি সাফল্য লাভ করেছেন। আমি হরকাতুল আনসারের প্রধান কমাণ্ডার সাজ্জাদ আফগানী। আপনারা আমাকে ধরতে

পেরেছেন, কিন্তু আমার সাথে যে বুযুর্গ লোকটি আছেন, মুজাহিদদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। ইনি বহিরাগত একজন পীর সাহেব। আমি তাঁকে অপহরণ করেছিলাম। সম্ভবত তারই বদদুআ লেগেছে বলে, আপনারা আমাকে গ্রেফতার করতে পেরেছেন। অন্যথায় আমাকে গ্রেফতার করা আপনাদের জন্য সহজসাধ্য নয়।’

সাজ্জাদ সাহেবের এ কথা শোনামাত্র কর্নেলের মুখ হাঁ হয়ে যায়। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্যালুট করে করমর্দনের জন্য গাড়ীর ভিতর হাত বাড়িয়ে দেয়। আর অন্যান্য সকল সৈন্য পরস্পরকে মুবারকবাদ দিতে থাকে। এরই মাঝে সাজ্জাদ সাহেব আমাকে সম্বোধন করে বলেন, আমাকে মাফ করে দিন। আমি আপনার সাথে বেআদবী করেছি, যার ফল আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে। আমাকে মাফ করে দিন।

তারপর তিনি কর্নেলকে বললেন, আপনারা এই পীর সাহেবকে ছেড়ে দিন। আমাকে গ্রেফতার করে আপনারা বিরাট বড় সাফল্য লাভ করেছেন।

উত্তরে কর্নেল বলল, “আমরা একে ছেড়ে দেব।”

সামান্য কথাবার্তার পর সৈন্যরা আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে একটি গাড়ীর সামনের সিটে বসিয়ে দেয়। ইণ্ডিয়ান আমীর একজন শিখ মেজর আমার পাশে বসে। কনভয় পূনরায় সেনা ক্যাম্পের দিকে চলতে থাকে। (পরে জানতে পেরেছি, ক্যাম্পটির নাম ছিল

খন্দরো ক্যাম্প) কমাণ্ডার সাজ্জাদ সাহেব স্বীয় দোস্ত এবং মেহমানের মুক্তির জন্য তার এই অসহায় অবস্থায় যতটুকু সামর্থ্য ছিল তার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালান। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালার দরবারে সওয়াব লাভ করা ছাড়াও স্বীয় মেহমানকে হেফাজত করতে না পারার যে বেদনা তার অন্তরে সৃষ্টি হয়, তা দূর করার উদ্দেশ্যেও তিনি এই ব্যবস্থা নেন। সাজ্জাদ সাহেব দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরে যুদ্ধরত ছিলেন। ইণ্ডিয়ান আমীর স্থানীয় অনেক গুপ্তচর তার অবয়ব চিনত। গ্রেফতার হওয়ার পর ক্যাম্পে অবস্থানকারী গুপ্তচররা তাঁকে চিনে ফেলার জোরালো সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি গুপ্তচরের মধ্যস্থতায় পরিচয় উদঘাটনের পূর্বেই আত্মপরিচয় প্রকাশ করে দেন। আর তা তিনি করেছিলেন আমাকে মুক্ত করার জন্য।

এই ঘোষণা দানের পর দুই দিন পর্যন্ত তিনি তাদের তীব্র চাপ সহ্য করেও স্বীয় ঘোষণায় অটল থাকেন। অবশেষে অন্যান্য সূত্রে ইণ্ডিয়ান আর্মী আমাকেও চিনে ফেলে। সাজ্জাদ সাহেবের এই ঘোষণা ইণ্ডিয়ান আর্মীদের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বরং তাদের মধ্যে আরো সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, যে ব্যক্তির জন্য হরকাতুল আনসারের মহান সিপাহসালার ত্যাগ স্বীকার করছেন, নিশ্চয় তিনি তাঁর থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন

ব্যক্তি হবেন। সুতরাং তারা আমার পরিচয় উদঘাটনের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এতে তারা সফল হয়। সাজ্জাদ সাহেব তার এই ঘোষণা দ্বারা যে উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাচ্ছিলেন, সে উদ্দেশ্য তো পুরা হয়নি, তবে তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে এর বিনিময়ে যথার্থ মর্যাদা লাভ করেছেন। এই কীর্তির মাধ্যমে তিনি সকল মুসলমানকে সাধারণভাবে এবং মুজাহিদদেরকে বিশেষভাবে আত্মত্যাগ ও কুরবানীর এমন শিক্ষা দিয়েছেন, যা কখনোই বিস্মৃত হওয়ার মত নয়। আজ যারা নিজের স্বার্থে অন্যকে বিপদে ও উৎকণ্ঠায় নিক্ষেপ করতে নিরস্ত হয় না, তারা যেন সাজ্জাদ সাহেবের এই আমল দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে যে, তিনি অপরের জন্য নিজেকে বিপদে ফেলেছেন এবং নিজের মুক্তির সামান্য সম্ভাবনাকেও খতম করে দিয়েছেন।

সাজ্জাদ সাহেবের এই দুঃসাহসিকতা, অপরকে প্রাধান্য দান ও আত্মত্যাগ আমার অন্তরে তার মর্যাদা ও গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় আরো অনেক বৃদ্ধি করে। সেদিন থেকে আমাদের উভয়ের উপর জুলুম ও বর্বরতার যে কালো রাত সওয়ার হয়, তা আমরা পরস্পরকে অবলম্বন করে অতিবাহিত করি। খন্দরো ক্যাম্পের জুলুম, শরীফাবাদ বড়গাম ক্যাম্পের বর্বরতা, বাদামীবাগের টর্চারিং সেন্টার, কোট ভলওয়ালের সামান্য মুক্ত পরিবেশ, সুড়ং

তৈরীর পরিশ্রম এবং ‘তালাবতালু’ এর নির্যাতন কক্ষে কঠিন শাস্তির মধ্যে আমরা উভয়ে একসাথে থাকি।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের মাঝে কখনও মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব হওয়া তো দূরের কথা, পরস্পরের ভক্তি শ্রদ্ধার মধ্যেও কোনরূপ ত্রুটি দেখা দেয়নি। আমাদের আদর্শ, ভালবাসা এবং প্রেমপূর্ণ সম্পর্কের এ ধারা আমাদের উভয়ের পাকিস্তানে অবস্থানরত সাথীদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবিচল থাকে। কিন্তু তিহার কারাগারে পৌঁছে আমাদের উভয়কে পৃথক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। (তিহার কারাগারে পৃথক পৃথক পাঁচটি কারাগার রয়েছে।) সাত মাস বিচ্ছিন্ন থাকার পর এক নং কারাগারে আমরা পূনরায় একত্র হই। অন্তরঙ্গ ভালবাসার ধারা তখন পূনরায় তরঙ্গায়িত হতে থাকে, অপরাপর সঙ্গীরা একে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

তারা এতে বিস্মিত হত যে, পাষাণতুল্য কঠিন ও শুষ্ক প্রকৃতির কমাণ্ডার সাজ্জাদ এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোমের মত বিগলিত হয় কি করে? তবে পরবর্তীতে এই সম্পর্কের উপর ‘বদনজর’ লাগে। তিহার কারাগারে অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে যখন আমাদের উভয়ের পাকিস্তানের সাথীদের সাথে যোগাযোগ হয়, তখন কিছু ভুল বুঝাবুঝি দমকা বাতাসের মত দেখা দেয়। সে বাতাস এই ঈমানী সম্পর্ককে

বসন্ত থেকে শীতে পৌঁছে দেয়। দুনিয়ায় এমন হয়েই থাকে, আর কারাগারের সংকীর্ণ পরিবেশে খুব বেশি এমন হয়। আমরা তো কারাগারের সংকীর্ণ পরিবেশে ছিলাম। মানুষ নিজ গৃহে সহোদর ভাই ও মাতাপিতার সাথেও বিবাদ করে থাকে। তিহার কারাগারে আমরাও এই পরিবেশের শিকার হই। অথচ আমি বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে খুবই সাবধানী। আমি খুব কম মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি। আর যার সাথে করেছি, আমি নিজে কখনো তা ভঙ্গ করিনি। কিন্তু সাজ্জাদ সাহেবের সঙ্গে আমার এই সম্পর্কে বদনজর লেগে যায়।

আমরা উভয়ে পরস্পর থেকে কিছুটা দূরে সরে যাই এই দূরত্ব উভয়ের জন্যই কষ্টের কারণ ছিল। আমি সবক পড়াতাম আর সে নীরবে এসে পড়ে চলে যেত। নামাযও পড়ত আমার কক্ষে। আছর নামাযের পরের ইসলাহী মজলিসে একত্রে যিকর করত। কিন্তু সর্বদা আমাদের উভয়ের উপর নীরবতা ও বিষন্নতা বিরাজ করত। পরস্পরের অন্তর পরস্পরের প্রতি কিছুটা নারাজ ছিল। এ সময় তিনি আমাকে কয়েকটি পত্রও লেখেন। আমিও পত্রের উত্তর দেই। আমাদের এই অসন্তোষের সংবাদে উল্লাসও প্রকাশ করা হয়। সম্ভবত উভয় পক্ষ থেকে এই ভুল বুঝাবুঝিমূলক কিছু পত্রও বাইরে প্রেরণ করা হয়। বিচ্ছেদ ও বেদনার এই সময়কাল আমি গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন করার কাজে অতিবাহিত করি। এভাবে মনের বেদনা

হালকা করার একটি মাধ্যম আল্লাহ পাক আমাকে দান করেন। বিচ্ছেদের এই সময়ে আমাদের উভয়কে অপরাপর সাথীদের সঙ্গে তিহার কারাগার থেকে জম্মুর কোট ভলওয়াল কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। তিহার কারাগারের সে দিনগুলির প্রতিক্রিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে তখনও অবশিষ্ট ছিল। আমার খুব ভাল স্মরণ আছে, আমি তখন কোট ভলওয়াল কারাগারে নয় নম্বর ব্লকের ৭ নম্বর সেলে বসে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছিলাম। তখন সেলে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এ সময় হঠাৎ সাজ্জাদ সাহেব আগমন করেন এবং সালাম করে আমার পাশে বসে পড়েন। আমি সালামের উত্তর দেই। তিনি গলা পরিষ্কার করে কথা বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন, তিহার কারাগারের সংকীর্ণ পরিবেশে যা কিছু হয়েছে আপনি তা মনে রাখবেন না। এখানে উন্মুক্ত পরিবেশে তা মনে না আনাই ভাল। আমাদের উভয়ের দূরত্বের কারণে আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমার আবেদন মেনে নিন।

তার একথা শ্রবণ করে আমার চোখে অশ্রু এসে যায়। আমি বললাম, তিহার কারাগারে কি আপনার একথা স্মরণ হয়নি? যাই হোক আমার অন্তর পরিষ্কার আছে। আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। আমাদের ঈমানী সম্পর্ক চার মাসের বিচ্ছিন্নতার পর তখন পুনস্থাপিত হল। আমি সাজ্জাদ সাহেবকে পূর্বের তুলনায় অধিক

সম্মান করতাম। কিন্তু তিনি নিজেকে নিকটতম একজন বন্ধু, সাগরেদ ও মুরীদের পূর্বস্থানে দেখার প্রত্যাশী ছিলেন। আমার অধিক সম্মান প্রদর্শন তার অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয়। কয়েক দিন ধৈর্য ধরার পর তিনি পূনরায় একবার আমার কাছে আসেন এবং মোসাফাহা করার জন্য আমার হাত ধরে বসে পড়েন। আজ পর্যন্তও আমি তার জিহাদী হাতের উষ্ণতা ও স্পর্শ অনুভব করি। এটি সেই হাত, যা অনেক মুশরিক থেকে আল্লাহর জমিনকে পাক করেছে। এই হাত কত মা-বোনের সম্মান ও সতীত্ব যে রক্ষা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সাজ্জাদ সাহেব সাধারণত এত দীর্ঘ সময় মোসাফাহা করতেন না। কিন্তু আজ যখন তিনি স্বভাববিরোধী দীর্ঘ সময় আমার হাত ধরে রাখেন, তখন আমি বুঝতে পারি যে, তিনি কিছু বলতে চান। আমি মাথা উঠিয়ে তার দিকে তাকাই। তার চক্ষুদ্বয় আজ আবার জ্বলজ্বল করছিল। সামান্য অশ্রু চক্ষুদ্বয়ের তপ্ততা হালকা করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। আমি বললাম, আদেশ করুন। তিনি বললেন, আপনি আমাকে পূর্বের মত আপনার থেকে ছোট মনে করবেন। যাবতীয় ভুলত্রুটি মাফ করবেন।

সাজ্জাদ সাহেব আমার থেকে বয়সে, মর্যাদায়, জিহাদের অভিজ্ঞতায় এবং অবস্থানের দিক থেকে অনেক বড় ছিলেন। তিনি আমার কাছে বাইয়াত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাকে নিজের শাইখ মনে করতাম। তিনি আমার

কাছে অনেক কিছুই পড়তেন, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তিনি আমার উস্তাদ ছিলেন। আমি তার একথা শুনে বললাম, আপনি এখনো আমার অনেক নিকটতম। আপনার প্রতি আমি মোটেও অসন্তুষ্ট নই। কিছু সময় আমরা উভয়ে অবনত মস্তকে পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে থাকি। আমাদের অভ্যাস ছিল যে, আমরা সাধারণত একে অপরের চোখে চোখ রেখে কথা বলতাম না। সে দিনের পর থেকে সাজ্জাদ সাহেব সবকে এবং ইসলাহী মজলিসে তার পূর্বের স্থান পেয়ে যান। আর এমনিভাবে যুগের দুর্লভ সেই মুজাহিদের অন্তরের বোঝা হালকা হয়ে যায়। আমি সাজ্জাদ সাহেবের সঙ্গে অসন্তোষের এই ঘটনা মোটেও উল্লেখ করতাম না। কিন্তু আমি শুনেছি যে, অসন্তোষের এই সময়ের কিছু স্বাক্ষর কারো কারো নিকট সংরক্ষিত আছে। তাদেরকে সঠিক অবস্থা জানানোর জন্যই এই সত্য দাস্তান সংক্ষেপে আমি লিখে দিলাম। এই ঘটনার পর থেকে শাহাদতের মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা পূর্বের মতই কারাগারের বন্ধুত্বপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করি। অসন্তোষের এই সংক্ষিপ্ত সময়কে কারো মর্যাদা বা অমর্যাদার মাপকাঠি সেই মনে করতে পারে, যে নিজের জীবনে কারো উপর কখনো অসন্তুষ্ট হয়নি। অথবা তার আমার সঙ্গে সাজ্জাদ সাহেবের আন্তরিক, আধ্যাত্মিক ও ঈমানী সম্পর্কের ব্যাপারে যথার্থ জ্ঞান নেই।

পরস্পরের সমঝোতার পর আমরা উভয়ে বেশ কিছু পত্র একত্রেও লিখেছি, সেগুলো সাজ্জাদ সাহেবের স্বাক্ষর সহ সংরক্ষিত আছে। তিনি আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিহার কারাগারের প্রথম দিনগুলোতে (যখন তিনি ১ নং কারাগারে, আর আমি ২নং কারাগারে ছিলাম) পত্রযোগে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমার সঙ্গে আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চার মাসের এই অসন্তোষও আত্মশুদ্ধিমূলক মুজাহাদার অংশ হয় এবং এতে করে তার কাছে দ্বীনী তাআল্লুকের এত অধিক মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি হয় যে, তিনি পরবর্তীতে আর কখনো এই সম্পর্ক ছিন্ন করে দূরে সরে যাননি। তিনি ছিলেন অনেক উচু মনের মানুষ। আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আমাদের উভয়কে আখেরাতে সফলতা ও মর্যাদায় ভূষিত করে মিলিত করেন। আমি তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ককে নিজের জন্য আখেরাতের সঞ্চয় মনে করি। আল্লাহর নিকট জান্নাতে তাঁর সান্নিধ্য কামনা করি।

ভারতীয় সৈন্যদের শ্লোগান ফৌজী কনভয় যখন ‘খন্দরো’ ক্যাম্পে প্রবেশ করে, তখন সেখানকার শত শত সৈন্য কনভয়কে স্বাগত জানায়। সম্ভবত তারা তাদের টহলরত এই দলের অর্জিত বিরাট সাফল্যের সংবাদ পূর্বেই জানতে পেরেছে। অধিকৃত কাশ্মীরের পাহাড়ী জেলা ইসলামাবাদে (অনন্তনাগ)

অবস্থিত এই ক্যাম্পটির ‘খন্দরো’ নামক জায়গার নামে নামকরণ করা হয়। সে সময় সেখানে রাজপুত রেজিমেন্টের সৈন্যরা অবস্থান করছিল। আমাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে মুখ ঢেকে এক দিকে বসিয়ে দেওয়া হয়। টহল দলের ইনচার্জ কর্নেল ক্যাম্পে উপস্থিত সৈনিকদের সামনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়। তাতে সে তার নগদ সাফল্যের আলোচনা অত্যন্ত গর্বভরে করে। সৈন্যদেরকে সে বলে যে, কয়েক দিন পূর্বে আমাদের রেজিমেন্টের মেজর ভূপিন্দর সিংয়ের ঘাতক সাজ্জাদ আফগানীকে আমরা গ্রেফতার করেছি। এই ঘোষণা শুনতেই সকল সৈন্য আনন্দে ‘জয় হিন্দ’এর শ্লোগান দিতে থাকে।

হিন্দুদের নিকট ‘জয়’ শব্দটি উর্দু ভাষার ‘জিন্দাবাদ’ শব্দের সমার্থক। ক্যাম্পে যখন আমি এই শ্লোগান শুনছিলাম, তখন এর অর্থ আমার পুরাপুরি জানা ছিল না। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই শব্দের অর্থ ও ব্যবহার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি। যেগুলো আমি তিহার কারাগারে বন্দী থাকাকালে লিপিবদ্ধ করেছি। বন্দী জীবনের বেদনাপূর্ণ অবস্থা বর্ণনার এই মুহূর্তে পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য লেখাটিকে এখানে তুলে ধরা যথার্থ মনে হচ্ছে। যেন ‘মুচকি হাসি’র একটি ঝলক বেদনার তীব্রতাকে হালকা করে দেয় এবং ‘মুসকারাতে

যখম’ (হাসি ঝরা ক্ষত) শব্দের অর্থও পাঠকের কিছুটা হৃদয়ঙ্গম হয়।

জয় হিন্দ
বন্দী হওয়ার বার দিন পর আমাদেরকে শ্রীনগরের বাদামীবাগ আর.আর, সেন্টারে আনা হয়। এটি ইণ্ডিয়ান আর্মীদের বিখ্যাত তদন্ত কেন্দ্র ও টর্চারিং সেন্টার। এখানে আমরা ছাড়া প্রায় দেড় শ’ কাশ্মীরী মুজাহিদ এবং আটজন পাকিস্তানী মুজাহিদ আগে থেকে বন্দী ছিল। তদন্ত কেন্দ্রে বন্দীদের থাকার জন্যে দুটি পৃথক ইমারত রয়েছে। একটি উপরে, একটি নিচে। উভয়টিতে পাঁচটি করে কক্ষ রয়েছে। ছোট ছোট আটটি সেল রয়েছে। পাকিস্তানী মুজাহিদদেরকে সেলে আর কাশ্মীরী মুজাহিদদেরকে সাধারণ কক্ষে রাখা হয়েছে। এখানে রাজপুত রেজিমেন্টের সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত নিরাপত্তা কর্মীরা পালাক্রমে পাহারা দেয় এবং প্রতি তিন ঘন্টা পর পর পাহারাদার পরিবর্তন হয়। সেন্টারের ব্যবস্থাপনা ছিল সি,এম,পি অর্থাৎ সেন্টার মিলিটারী পুলিশের হাতে। তাদের মাথায় লাল টুপি আর শিখ হলে লাল পাগড়ী দেখা যায়। সি.এম.পি, এর একজন বিরল বিস্ময়কর সুবেদার (পরবর্তীতে কখনো এর সম্পর্কে আলোচনা করব) সেন্টারের প্রধান ব্যবস্থাপক এবং সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল সিকিউরিটি ইনচার্জ ছিল। এরা উভয়ে

প্রায়ই আমাদের সাথে কথা বলে নিজেদের দাম বাড়াত।

একটি কক্ষকে এম আই রুম বলা হত। সেখানে ভোরবেলা সেনাবাহিনীর ডাক্তার অসুস্থ বন্দীদেরকে দেখত। আর সারাদিন সেখানে বন্দীদের উপর চরম অত্যাচার করা হত। তাই বন্দীরা এম,আই রুমের নাম শুনলেও আতংকিত হত। সেনাবাহিনী ও মিলিটারী পুলিশের জওয়ানরা ভীতি প্রদর্শনের জন্যে এমআই রুমের কথা উল্লেখ করত। দুটি কক্ষ তদন্তের জন্য নির্ধারিত ছিল। সেখানে সেনাবাহিনীর লোকেরা ও অপরাপর এজেন্সীর প্রতিনিধিরা সারাদিন বন্দীদেরকে তুলোধুনো করত এবং কাগজপত্র লিখত। ছোট এই সেন্টারটির বক্ষে দীর্ঘ উপাখ্যান ও ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। তা আজকের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। আজকে শুধু এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, ভারতে সেনাবাহিনী বা পুলিশের জুনিয়র লোকরা যখন সিনিয়রদের সম্মুখে যায়, তখন তার সম্মানার্থে স্যালুটের সাথে ‘জয় হিন্দ’ বলে। এমনিভাবে প্রেসিডেন্ট, যাকে ভারতে রাষ্ট্রপতি বলা হয় এবং উজিরে আযম, যাকে এখানে প্রধানমন্ত্রী বলা হয়, তাদের বক্তৃতাকালে তাদের শেষ কথা হয় ‘জয় হিন্দ’।

‘জয়’ শব্দটি ভারতে বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়, বড় বড় লিডারদেরকে

খুশী করার জন্য পাকিস্তানের ‘জিন্দাবাদের’ স্থলে ভারতে ‘জয়’ ‘জয়’ বলে শ্লোগান দেওয়া হয়। যেমন ‘ইন্দিরা গান্ধীর জয়’, ‘নরসীমা রাওয়ের জয়’ এই শ্লোগান শুনে মুশরিকরা খুশীতে আটখানা হয়ে যায়।

আমি শুনেছি যে, হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) মাল্টার জেল থেকে যখন মুক্তি পান এবং ভারত সফর করেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য আগত বিশাল জনসমাগমের মধ্যে উপস্থিত হিন্দুরা ‘শাইখুল হিন্দের জয়’ বলে শ্লোগান দেয়। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)এর কাছে তা খুবই অসহনীয় লেগেছে। কিন্তু বর্তমানে ভারতের মুসলমান লিডারদের কাছে এই শ্লোগান অসহনীয় নয়। তারাও তাদের চামচাদের দিয়ে নিজেদের জন্য ‘জয়’ এর শ্লোগান দেওয়ায়।

বাদামী বাগ ইন্ট্রোগেশন সেন্টারে কোন অফিসার বা নিম্নস্তরের কোন সান্ত্রী এলে সেনাবাহিনীর লোকেরা জুলুম অত্যাচার চালিয়ে কয়েদীদের দাঁড়িয়ে ‘জয় হিন্দ’ বলতে বাধ্য করত এবং ‘জয় হিন্দ’ই শুধু নয়, ‘জয় হিন্দ স্যার’ বলাতো। নিরুপায় বন্দীদের করার কিছুই ছিল না। রাতদিনের অবিরাম অত্যাচার তাদের দেহের প্রতিটি জোড়া পৃথক করে দিয়েছিল। তাই অনেকে তাদের আদেশ পালন করত। কিন্তু তা করত অনেক আকর্ষণীয় ঢংয়ে। তবে অনেক জেদী এ

ব্যাপারেও অটল থাকত। প্রথম কয়েক দিন বাদ দিয়ে আর কখনো তারা ‘জয় হিন্দ’ বলেনি। পাকিস্তানীরা এই অবাধ্যতায় অগ্রগামী ছিল। কিন্তু কাশ্মীরী মুজাহিদরা যাদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, তারা কৌশল ও হিকমত রূপে বিশেষ এক আঙ্গিকে এ আদেশ পালন করত। যখনই কোন অফিসার তাদের কক্ষে প্রবেশ করত তখনই তারা সকলে সোল্লাসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলত জয় হিন্দ স্যার এর স্থলে ‘জয় হিন্দ খর’। ‘জয় হিন্দ’ তো দু'চারজন বলত, কিন্তু ‘খর’ এর আওয়াজে পুরা সেন্টার গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। ফার্সী ভাষার মত কাশ্মীরী ভাষাতেও গাধাকে ‘খর’ বলে। তাই তারা আগত অফিসারকে ‘খর’ অর্থাৎ ‘গাধা’ বলত। আর তা শুনে নামের পাগল মুশরিকের চেহারায় আনন্দ ও পুলকের ঢেউ খেলে যেত। তারা হাসতে হাসতে মাথা দুলিয়ে ‘জয় হিন্দ’ ‘জয় হিন্দ’ দু’দু’ বার বলত এবং সবাইকে বসার অনুমতি দিত। আর আমরা সেলে বসে হাসতে থাকতাম।

এমনিভাবে কোন কাশ্মীরীর কোন সান্ত্রীকে ডাকতে হলে ‘খর’ ‘খর’ (গাধা, গাধা) বলে চিৎকার করে ডাকত। ডাক শুনে সান্ত্রী লোকটি একথা ভেবে খুশী হত যে, এই সন্ত্রাসী আমাকে স্যার বলেছে। এরই মাঝে পাঞ্জশীরের একজন আফগানী বন্দী হয়ে আসে। সে যখন কোন অফিসার বা সান্ত্রীকে ডাকত, তখন জোরে জোরে বলত ‘সাগ’ ‘সাগ’, (ফার্সী ভাষায় ‘সাগ’ শব্দের

অর্থ কুত্তা)। ডাক শুনে সান্ত্রী দৌড়ে আসত। এমনিভাবে ঐ আফগানী মুজাহিদকে কোন কথা জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে সে ‘জ্বি সাগ’, ‘জ্বি সাগ’, বলত। আর মুশরিকরা শিষ্টাচার পূর্ণ ঐ আফগানীর উপর খুব খুশী হত যে, তাদেরকে ‘সাগ’ অর্থাৎ ‘কুত্তা’ বলছে।

‘জয় হিন্দ’ এর আরো অনেক আকর্ষণীয় ঘটনা দেখতে পাই। একজন নির্বোধ ধরনের হাওলাদার ছিল। সকল কয়েদী তার মেজায সম্পর্কে অবগত ছিল। সে যখন আসত, তখন চতুর্দিক থেকে ‘জয় হিন্দ খর’ ‘জয় হিন্দ খর’ এর শ্লোগান শুরু হত। সে উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যেত। তখন তাকে বলা হত ‘খর’ এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন, আপনাকে ছাড়া ভালই লাগে না। একথা শুনে তার অঙ্গভঙ্গী পর্যন্ত পাল্টে যেত। তখন কয়েদীরা তার দ্বারা এমন কাজও নিত, টাকায় কেনা গোলামও, যা করে না। তার থেকে কেউ সিগারেট নিত, কেউ ম্যাচ নিত। কেউবা তার দ্বারা সান্ত্রীদেরকে ধমকাতো, কেউ অন্য সেলে গিয়ে নিজের বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করত। (বাহ্যত এ সকল বিষয় অসম্ভব বা দুষ্কর ছিল।)

একবার আমি তাকে বলি, জনাব আপনার হাত তো খুব শক্ত মনে হচ্ছে, লোহার থেকেও শক্ত। আমার একথা তার উপর প্রভাব ফেলল। সে তখন সেলের লোহার উপর জোরে জোরে আঘাত করতে থাকে। আশা করি এতে তার অনেক কষ্ট হয়ে থাকবে। এরপর যখনই সে আসত তখনই দুই হাত দ্বারা লোহায়

আঘাত করত। আমরা তখন একথা বলে তাকে আরো উৎসাহিত করতাম যে, আস্তে জনাব, আস্তে। লোহা ভেঙ্গে যেতে পারে। একথা শুনে সে আরো উত্তেজিত হত। এভাবে আমরা মুজাহিদদের উপর অত্যাচার করার সামান্য প্রতিশোধ নিতাম।

একদিন আমি তাকে বললাম, জনাব! আপনি খামাখাই সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছেন। যদি ফিল্মে কাজ করতেন, তাহলে ইণ্ডিয়ার সবচে’ ভাল ‘ব্লাক হিরো’ হতেন। সেদিনের পর থেকে সে আরো বেশি দর্পভরে চলত এবং সকলকে একত্র করে বলত, “হাঁ, বাতাও কোনছা ডায়ালগ ছোন্না হ্যায়, (বল, কোন ডায়ালগ শুনবে)।” তারপর থেকে তো তার অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্য আরো বেড়ে যায়। এ অবস্থা তারই শুধু নয়, বরং ভারতীয় প্রতিটি সৈন্য, প্রতিটি পুলিশ, প্রতিটি মুশরিক এ কাজে একজন থেকে অন্যজন অগ্রগামী। বহু বড় বড় বিপদজনক মুজাহিদও অফিসারদেরকে এ কথা বলায় অধিক মার থেকে বেঁচে যায় যে, জনাব আপনাকে তো বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। ব্যাস! অফিসার মারা বাদ দিয়ে আত্মপ্রশংসায় মুখরিত হত। এমন অসংখ্য ঘটনা আমার স্মরণে আছে, যা আপনাদেরকে শুনালে বিস্ময়াভিভূত হবেন। এমনকি একবার তিহার কারাগারে একজন নাপিতকে আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, কি বন্ধু!, দেখাই যে যায় না, খুব বুঝি ব্যস্ত? ব্যাস, একথা শুনতেই ক্ষুর কেচী ভুলে সে নিজের ব্যস্ততা ও গুরুত্বের বিস্তর আলোচনা শুরু করে দেয়।

মনে হচ্ছিল যেন সে একাই পুরা ভারতকে পরিচালনা করছে। আমাদের পরিভাষায় একে ‘পাম্প’ দেওয়া বলে। আমাদের একজন সাথী একাজে খুব দক্ষ ছিল। কোন অফিসার দ্বারা কাজ করাতে হলে আমরা তাকে আগে বাড়িয়ে দিতাম। সে বলত, জনাব! সমস্ত অফিসার যদি আপনার মত হত তাহলে চিত্রই পাল্টে যেত। ব্যাস, এতটুকু কথাতেই সে এমন আয়ত্বে এসে যেত, যেমন বাঁশি বাজালে সাপ অধীন হয়ে যায়। এ এভাবে নাচতে শুরু করত, যেভাবে ডুগডুগির সামনে বাঁদর নাচে।

থাক এসব কথা। এ এক দীর্ঘ আলোচনা। কথা চলছিল ‘জয় হিন্দ’ সম্পর্কে। কাশ্মীরের একজন প্রসিদ্ধ মুজাহিদ আমাকে এই ঘটনা শুনিয়েছিলেন যে, একবার কাশ্মীর এসেম্বলীতে একজন দ্বীনদার মুসলমান এসেম্বলী সদস্যের হাঁচি এলে উচ্চস্বরে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে। এতে একজন হিন্দু পণ্ডিত বলে, আপনি এটা কি বললেন? মুসলমান সদস্যটি উত্তর দিল, হাঁচি আসলে মস্তিস্ক পরিষ্কার হয়, তাই আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। তখন হিন্দু পণ্ডিত বিদ্রুপ করে বলে, যখন আপনার বায়ু নির্গত হয়, তখনও পেট পরিষ্কার হয়, সে সময়ও আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন। মুসলমান সদস্য উত্তরে বলেন, তখন তো আমি বলি ‘জয় হিন্দ’।

বন্দী জীবনের শুরুর দিনগুলো সৈন্যদের গর্বপূর্ণ এই সমাবেশের পর আমাদের দুজনকে পৃথক করে দেওয়া হয়। আর্মীরা আমার সম্পর্কে সঠিক তথ্য অবগত হতে না পারায় আমাকে যোহর নামায পড়ার অনুমতি দেয়। জুমুআর দিন বন্দী হওয়ার পর কয়েদী অবস্থায় এটি ছিল আমার প্রথম নামায। আর কয়েদী অবস্থায় আমার শেষ নামায ছিল, পবিত্র রমযানের ২২ তারিখের পবিত্র জুমুআবারের ফজর নামায। জম্মুর কোট ভলওয়াল কারাগারের ১৮নং ব্যারাকে সাথীদের সাথে নিয়ে জামাআতের সাথে তা আদায় করি। সেই জুমুআর দিনেই আফগানিস্তানে মুক্ত অবস্থায় আমি যোহর নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করি। সাধারণত জুমুআর দিন জুমুআর নামায পড়া হয়। কিন্তু আমি সফর ও বন্দীত্বের কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত জুমুআর দিনে যোহর নামায আদায় করি। মালিক বান্দাকে যে অবস্থায় রেখে খুশী থাকেন, সে অবস্থাতেই বান্দার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

বন্দীত্বের প্রথম দিন মাগরিব পর্যন্ত আমার উপর অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার অবস্থা বিরাজ করে। মাগরিবের পর একটি কক্ষে নিয়ে ছাদের সাথে আমাকে প্রায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেখানে বিদ্যুতে শক দেওয়ার সেই ধাপ আরম্ভ হয়, যা প্রায় এক বছর পর্যন্ত মাঝে মাঝেই চলতে থাকে। এটি ছিল শা'বানের ২৯ এবং

ফেব্রুয়ারীর ১১ তারিখ। আজ আমার জীবনে যে অভিজ্ঞতা, লাভ হল, এর আলোচনা তো বইপুস্তকে পড়েছিলাম, কিন্তু আমার উপর দিয়েও এমনটি ঘটবে, তা কখনো ভাবিনি। সে রাতটি তো কোনভাবে পার হয়ে গেল। দুশমন আমার সম্পর্কে এতটুকু জেনেছিল যে, জিহাদ ও মুজাহিদদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে। পরদিন ভোরে অনুমানের ভিত্তিতে রমযানুল মুবারকের প্রথম রোযার নিয়ত করি। কিন্তু আমাদেরকে সেই ক্যাম্প থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরের পূর্বে একজন ডাক্তারের নিকট আইনগত চেকাপ করানোর জন্য আনা হয়। ডাক্তারটি মুসলমান ছিলেন। তিনি জানালেন পবিত্র রমাযানের চাঁদ দেখা যায়নি, তাই আগামী কাল থেকে রোযা শুরু হবে। তার সংবাদ মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। আমাদের বন্দী অবস্থার প্রথম রমাযান আসতে আরো একদিন দেরী ছিল। এ সময় আমাদের উভয়কে একটি ট্রাকে উঠিয়ে শিকল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে অন্য ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কয়েক ঘন্টা চলার পর আমরা বড় একটি সেনা ক্যাম্পে পৌছি। এখানে এনে আমাদেরকে পূনরায় পৃথক করে দেওয়া হয়। প্রথম পর্বের অত্যাচারের পর, যা ইণ্ডিয়ার প্রত্যেক নতুন ক্যাম্প ও কারাগারে অবধারিত—একটি তুলনামূলক প্রশস্ত কক্ষে আমাকে আটকে রাখা হয়। পরে জানতে পারি যে, এটি ইণ্ডিয়ার গর্বের সেনা ক্যাম্প, যা শরীফাবাদ বড়গামে অবস্থিত।

এখানে হেলিকপ্টার ও জঙ্গী বিমানের উড্ডয়ন ও অবতরণের ব্যবস্থাও রয়েছে। কাশ্মীরের উপর ভারতীয় আধিপত্যের জন্য এই ক্যাম্পের গুরুত্ব মেরুদণ্ডের ন্যায়। কাশ্মীরের আযাদী আন্দোলনের বন্দী মুজাহিদদেরকে এই ক্যাম্পে আনা হয়। তার মধ্যে কিছু মুজাহিদকে এখানে শহীদ করে দেওয়া হয়। আর কিছুর চোখ ও অন্যান্য অঙ্গ নষ্ট করে দেওয়া হয়।

এই ক্যাম্পে বন্দী করে রেখে এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বন্দী মুজাহিদকে মেরে ফেলা হবে, নাকি আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের সম্মুখে পেশ করে তাকে বন্দী করার ঘোষণা দেওয়া হবে। ভারতের মাথায় পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কলঙ্কিত করার এক উন্মাদনা চেপে আছে। যে উন্মাদনায় বাধ্য হয়ে তারা নিজেদের অনেক বড় ক্ষতিও স্বীকার করে নেয়। সুতরাং এই ক্যাম্পে যতজন পাকিস্তানী মুজাহিদকে বন্দী করে আনা হয়েছে, তাদেরকে কয়েকদিন পর্যন্ত অত্যাচার ও তদন্ত করার পর প্রচার মাধ্যমসমূহের সম্মুখে পেশ করা হয়। যাতে করে পাকিস্তানের বিপক্ষে কার্যকরী প্রোপাগাণ্ডা করা যায়। আমাদেরকে এগারো দিন পর্যন্ত ঐ ক্যাম্পে বন্দী রাখা হয়। এর মধ্যে বেশ কিছু বড় ও আশ্চর্য ঘটনা

ঘটে। তার মধ্য থেকে সংক্ষেপে মাত্র দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি—

১, গ্রেফতারীর সময় আমার পকেটে অন্যান্য জিনিস ছাড়াও ছোট একটি চিরকুট ছিল। তাতে উর্দু ভাষায় দিল্লীর একটি বাড়ীর ঠিকানা লেখা ছিল। সে বাড়ীতে কয়েকজন মুজাহিদ বাস করত। খন্দরো ক্যাম্পে আমার পকেটের সব জিনিস বের করে নেওয়া হয়। ফলে আমি এজন্য সীমাহীন পেরেশান ছিলাম যে, দুশমন চিরকুটটি পড়ে ফেললে কয়েকজন মুজাহিদ ধরা পড়ে যাবে। মুজাহিদদের গ্রেফতার হওয়ার আশংকা আমার মনকে বারবার অস্থির করছিল ও সীমাহীন বিষাদগ্রস্ত করছিল। শরীফাবাদ ক্যাম্পের প্রথম রাতে ইণ্ডিয়ান আর্মীর একজন মেজর যখন আমার তদন্ত আরম্ভ করে, তখন সে কাপড়ের একটি রুমালের ভিতর থেকে আমার পকেট থেকে বের করে নেওয়া সবকিছু টেবিলের উপর রাখে। আমি দেখতে পেলাম পাসপোর্ট, টাকা, বোর্ডিং কার্ড এবং টিকিটের সাথে ছোট সেই চিরকুটটিও টেবিলের উপর আছে। কথাবার্তার সময় আল্লাহর দয়ায় মেজরটি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। ফলে সে তদন্ত কাজে খুব নম্রতা করে। সেনাবাহিনীর একজন সুবেদার, যার দায়িত্ব ছিল তদন্তের সময় অত্যাচার চালানো, তাকে কক্ষের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে আল্লাহর নুসরাত, আমি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে থাকি। মেজরটি

তদন্তের সময় টেবিলের উপর রাখা একেকটি জিনিস উঠিয়ে সে বিষয়ে আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে। আমি সেগুলোর অনেকাংশে সঠিক উত্তর দেই। ফলে সে আরো প্রভাবিত হয়। ইতিমধ্যে সে ক্ষুদ্র সেই চিরকুটটি উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এটি কি? প্রশ্ন শুনেই আমার অন্তর ঢিব ঢিব করতে থাকে। আমি নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে তাকে বললাম, আমাকে কাগজটি দেখান, তাহলে বুঝতে পারব। সে নির্দ্বিধায় কাগজটি আমার হাতে দিয়ে দেয়। আমি দীর্ঘক্ষণ চিরকুটটি দেখার পর কাগজটি মুচড়িয়ে নিচে ফেলে দেই এবং বলি যে, এটি আমার বুঝে আসছে না। আল্লাহ পাক সেই অফিসারের উপর এমন প্রভাব ফেলেন যে, সে আমার কথার আর কোন প্রতিবাদ করেনি। তবে মাটি থেকে চিরকুটটি উঠিয়ে পূনরায় টেবিলের উপর রেখে দেয়।

এ ঘটনার ৬/৭ দিন পর সেই অফিসার তার সিনিয়র এক অফিসারের সঙ্গে অগ্নিশর্মা হয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করে। সে সময় তার হাতে ছিল ঐ চিরকুটটি। সে এসেই ক্রোধভরে বলে, আমি তোমাকে ভদ্র মনে করেছিলাম, কিন্তু তুমি খুবই বিপদজনক লোক। তুমি আমাকে এই চিরকুটের ব্যাপারে প্রতারিত করেছ। এখন আমি তোমাকে গুলি করে হত্যা করে নদীতে নিক্ষেপ করব। তারপর তারা উভয়ে আমাকে লাঠি, ঘুষি ও থাপ্পড় মেরে মেরে খুব করে মনের ঝাল মিটায়। এরপর গালি দিতে দিতে

কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। মূল ঘটনা এই যে, প্রাথমিক তদন্তের ৬/৭ দিন পর উর্দু জানা ইণ্ডিয়ান একজন লোক চিরকুটটি পড়ে তদন্তকারী অফিসারদেরকে জানায় যে, চিরকুটে দিল্লীর একটি বাড়ীর ঠিকানা লেখা আছে। একথা জানতেই দিল্লীতে খবর দেওয়া হয়। তারা সে বাড়ীতে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কিন্তু মুজাহিদরা অনেক আগেই সে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ফলে ইণ্ডিয়ান সরকার তাদের কিছুই পায়নি। কিন্তু গ্রেফতারীর সাথে সাথেই যদি চিরকুটটি পড়া হত,তাহলে মুজাহিদদের বিরাট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, দিল্লীতে আমাদের গ্রেফতারীর খবর পৌছে ছিল অনেক দেরীতে।

২, এই ফৌজী ক্যাম্পের এগারো দিনের বন্দীকালীন সময়ে সে ঘটনাটিও সামনে আসে, কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ‘যরবে মুমিন’এর জন্য লিখিত একটি কলামে যার উল্লেখ করেছি। কলামটির শিরোনাম ছিল—মুশরিকদের থেকে মুক্তির পথ। মিছরী যতবারই খাওয়া হোক মিষ্টিই লাগে। সেই মতে লেখাটি আবার পড়ে নিন।

মুশরিকদের থেকে মুক্তির পথ ক্ষুদ্রকায়, খসখসা দাড়িবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ ও ভয়ংকর মুখাকৃতির সেনাবাহিনীর একজন মেজর। তার মুখাকৃতি ও

পুরো শরীরের আকৃতি এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। সম্ভবত সে ইণ্ডিয়ান আর্মীর কোন গোয়েন্দা শাখার লোক। সর্বদা সিভিল ড্রেসে আসত। কথায় কথায় বিশ্রী গালি দেওয়া, সব সময় অত্যাচার চালানো এবং কথোপকথনে অহংকারী ভঙ্গী করা তার স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। প্রথম দিকে সে খালি হাতে আসত। আর পরমুহূর্তে নির্যাতনের জন্য লাঠি প্রভৃতি আনাত। কিন্তু পরবর্তীতে বিদ্যুতের শক দেওয়ার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র সবসময় তার হাতে থাকত। প্লাষ্টিকের দুই ফুট লম্বা এই ডাণ্ডার একমাথায় লোহার দুটি কড়া ছিল। বোতামে চাপ দিলে তাতে বিদ্যুৎ আসত এবং হালকা আগুন বের হত। এই বিদ্যুৎ যন্ত্র দিয়ে সে মুজাহিদদেরকে নির্যাতন করত। আমি বন্দী হওয়ার পর সে আমার কাছে অনেক বারই এসেছে। প্রত্যেক বারই সে তার শক্তি মত খুবই অত্যাচার করেছে। মন ভরে নির্যাতন চালিয়েছে। আমিও তার জন্য মন খুলে বদ দুআ করতাম। আল্লাহর দরবারে কষ্টকর এই বিষাক্ত সাপের হাত থেকে আশ্রয় চাইতাম। বন্দী হওয়ার পর আমাকে যখন শ্রদ্ধেয় ভাই কমাণ্ডার হাফেয সাজ্জাদ খান শহীদ (রহঃ)এর সঙ্গে শরীফাবাদের (বড়গাম, অধিকৃত কাশ্মীর) একটি সেনা ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তৃতীয় ও চতুর্থ দিন সেই জালেম ও ভীরু অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রথম দিনেই সে গালাগালি ও

অত্যাচারে অন্যান্য অফিসারকে ছাড়িয়ে যায়। পীড়াদায়ক এই সাক্ষাতের পর একসপ্তাহ দুই সপ্তাহ পর পর সে দু একবার আসত। আর প্রতিবার তার আচরণ হত পূর্বের চেয়েও মারাত্মক। বিদ্যুৎ যন্ত্র ও কাঠের লাঠি দ্বারা অত্যাচার করেও যখন তার মুশরিক অন্তর পরিতৃপ্ত হত না, তখন সে নির্দ্বিধায় তার হাত ব্যবহার করতে থাকত। বাদামীবাগ টর্চারিং সেন্টারে সে সাজ্জাদ শহীদ (রহঃ)কে আমার সম্মুখে তার সেই নাপাক হাত দ্বারা থাপ্পড় মারত। আমাদের উভয়ের উপর লাঞ্ছনাকর এই নির্যাতন করার পর সে বাদামী বাগের বোমা বিস্ফোরণে মারা যায়। তার লাশের একটি টুকরাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এভাবে আমরা একজন প্রকৃত হিন্দু কালসাপের হাত থেকে মুক্তি পাই।

হায়! হিন্দুদের প্রকৃত কদাকার সেই চেহারা যদি মুসলমানরা বুঝত! তাদের দাসত্বের উপর অহংকার না করে ঐ নাপাক, কদাকার, জালেম, প্রতারক, কুচক্রী ও ভীরু জাতির হাত থেকে আযাদী লাভ করত! কারণ, মুশরিকদের দাসত্ব মুসলমানদের থেকে অনেক কিছুই ছিনিয়ে নিয়েছে এবং যা কিছু আছে তাও ছিনিয়ে নিবে। ধুকে ধুকে জীবন যাপনের অধিকার এবং সীমিত পরিসরে ধর্ম পালনের অনুমতি মক্কার মুশরিকরাও মুসলমানদেরকে দিতে প্রস্তুত ছিল। প্রত্যেক অত্যাচারী জাতি, যারা আমাদেরকে শাসন করতে চায়, তারা

এতটুকু অধিকার অবশ্যই দিবে, কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয়, শুধুমাত্র বেঁচে থাকা, সাময়িক নিরাপত্তা লাভ করা ও সীমিত আকারে দ্বীনের খেদমত করা এমন বস্তু নয়, যার বিনিময়ে মুশরিকদের আধিপত্য, তাদের রাজত্ব ও তাদের শাসন মেনে নেওয়া যেতে পারে। হায়! দাসত্ব নিয়ে গর্বকারী ও নিজেদের সীমিত বাহ্যিক নিরাপত্তা নিয়ে তুষ্ট মুসলমান এই বিষয়ে যদি চিন্তা করত এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুশরিকদের ‘দাসত্ব’ উপহার দেওয়ার স্থলে তাদের জন্য মুক্তির পথ খোঁজ করত!

নিবন্ধের শুরুতে যে মুশরিক সেনা অফিসারের আলোচনা করেছি, সে একবার রাতের বেলায় আমার সেলে আসে। গালাগালি, অত্যাচার ও ভীতি প্রদর্শনের পর সে তার পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বলে, এটি আমাকে পড়ে শোনাও। আমি পড়তে আরম্ভ করি। সেটি ছিল উর্দু হস্তাক্ষরে হিন্দি ও উর্দু ভাষার মিশ্রিত শব্দে লেখা একটি প্রবন্ধ। যাতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ও ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীর সমর্থনে অনেক কথাই লেখা ছিল। লেখাটিতে আমার পক্ষ থেকে একথার স্বীকারুক্তি ছিল যে, আমি ‘সন্ত্রাস’ সৃষ্টির জন্য ভারতে এসেছিলাম। আমি এখানে অনেকগুলো মাদরাসা পরিদর্শন করেছি।
সেগুলোতে জিহাদের উপর ভাষণ দিয়েছি।

সেখান থেকে কাশ্মীরে আসি। এখানে মুজাহিদদেরকে জনসাধারণের উপর নিপীড়ন চালাতে আর ইণ্ডিয়ান সৈন্যদেরকে কাশ্মীরী জনগণের পক্ষে কাজ করতে দেখি। এ অবস্থা দেখে মুজাহিদদের উপর আমার ঘৃণা জন্মে। মুজাহিদরা কাশ্মীরী পণ্ডিতদেরকে সেখান থেকে বের করে দিয়েছে এবং তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি সেই সৈনিক অফিসারের লাথি, ঘুষি ও গালি বর্ষণের মধ্য দিয়ে ঠক ঠেকে এই বানোয়াট কথাগুলো পড়ছিলাম। তখনো আমি ‘চিত’, জনতা’, ‘ভাষণ’ এবং এ জাতীয় হিন্দী শব্দ জানতাম না। আমি লেখাটি পড়া শেষ করলে অফিসারটি শয়তানী হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে, এসব কথা সত্য না মিথ্যা? আমি বললাম, এর বেশির ভাগই মিথ্যা। একথা শুনে সে খুবই ক্রোধান্বিত হল। আমাকে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ও দাড়ি বুট দ্বারা মাড়াতে থাকে। আর অবিরত জিজ্ঞেস করতে থাকে, এ কথাগুলো সত্য, না মিথ্যা? তোমাকে আগামীকাল ক্যামেরার সামনে যেভাবেই হোক এগুলো পাঠ করতে হবে। এরপর সে আমাকে চিন্তা করার সুযোগ দিয়ে চলে যায়।

আমার খুব ভাল স্মরণ আছে, এই রাত ছিল আমার জীবনের কঠিনতম রাত। আমি সিজদায় লুটে পড়ি এবং আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে মৃত্যু ভিক্ষা করি। আমি দুআর মধ্যে আমার

রবের নিকট ফরিয়াদ করি, হে আল্লাহ! মৃত্যুর জন্য দুআ করা জায়েয নয়, কিন্তু এখন আমি অপারগ। আমার থেকে জোরপূর্বক জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিবৃতি নেওয়া হচ্ছে। অথচ আমার জীবনের বিরাট একটি অংশ জিহাদ ও মুজাহিদদের সপক্ষে বিবৃতি দানে অতিবাহিত হয়েছে। আমি সিজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদছিলাম, আর দুআ করছিলাম। মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আশ্চর্য এই যে, মানুষ স্বভাবতই মৃত্যুকে ভয় করে, কিন্তু সে রাতে আমার মৃত্যু আসছে, একথা চিন্তা করে প্রশান্তি লাভ হচ্ছিল। এর স্বাদ অনুভব করে চক্ষু বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু মৃত্যু তখনো অনেক দূরে ছিল। মুশরিকদের অনেক জুলুম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা বাকী ছিল। কষ্টদায়ক সে রজনী অতিবাহিত হল। সকালে ক্যামেরা আনা হল, লাইট লাগানো হল এবং আমার দ্বারা এই বিবৃতি পাঠ করানোর সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই করা হল।

একজন মানুষ কতক্ষণ নির্যাতন সইতে পারে। আমার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। অস্থি অপারগ হয়ে পড়ছিল। উপরন্তু অসহায়ত্ব, দাসত্ব, অবিরাম নির্যাতন, তাচ্ছিল্য ও গালাগালি মানুষের সাহস ভেঙ্গে দেয়। একথা সেই মানুষই বুঝতে পারে, যে এ যাবতীয় দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু

বেদনাবিধূর ও নৈরাশ্যকর এই অবস্থাতেও আল্লাহ তাআলা আমার মত দুর্বল ও অসহায় বান্দাকে সাহায্য করেন। তাদের লিখিত বাক্যে ব্যবহৃত হিন্দি শব্দসমূহ এ ভয়ানক ষড়যন্ত্র খণ্ডন করার বাহ্যিক কারণ হয়।

একটু ভেবে দেখুন। আল্লাহ না করুন, টেলিভিশন ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় যদি এ বিবৃতি আমার পক্ষ থেকে প্রচারিত হত, তাহলে কেমন ক্ষতিটাই না হত। অনেক মুসলমানই বলত যে, আমি (আল্লাহ না করুন) মুশরিকদের হাতে বিক্রি হয়ে গেছি। জ্বি হাঁ, অনেক জালেম কারাগারে থেকে জিহাদ বিষয়ে লিখিত আমার কিতাবসমূহের উপর সন্দেহের অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অথচ এসব কিতাব ও প্রবন্ধ দ্বারা আল্লাহর নুসরতে জিহাদ ও মুজাহিদদের অনেক উপকারই হয়েছে। এ সকল কিতাব ও প্রবন্ধ খোদ ভারতেই ইণ্ডিয়ার অসংখ্য দুশমন জন্ম দিয়েছে। এসব কিতাব ও প্রবন্ধ—যেগুলো পাঠ করে অসংখ্য লোক পাকাপোক্ত ও খাঁটি মুসলমান ও মুজাহিদ হয়েছেন, যখন অনেক লোকের দৃষ্টিতে সেগুলো বিধছে, তাহলে উপরোক্ত বিবৃতি প্রচারিত হলে আমার কি দুর্গতিই যে তারা করত, তা আমার জানা নেই।

এমনিভাবে অনেকে এই বিবৃতিকে সামনে রেখে কাশ্মীরের জিহাদ শরীয়তসম্মত হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করত। তারা বলত যে, এখন তো অমুক মাওলানার ফতওয়া এসেছে যে,

মুজাহিদরা কাশ্মীরে জনসাধারণের বিরুদ্ধে কাজ করছে। আর ইণ্ডিয়ান সৈনিকরা মুসলমানদের সুবিধা দিচ্ছে। গালি, ডাণ্ডা আর সীমাহীন অত্যাচারের মাঝে গৃহীত এই বিবৃতিকে শরয়ী ফতওয়া মনে করা হত। যারা জিহাদ করার কসম করেছে, তারা একে দলীলরূপে ব্যবহার করত। অথচ আমি সেখানে বন্দী ছিলাম। আর ইণ্ডিয়ান জালেম শাসক সেখানকার স্থানীয় মুসলমানদেরকে এমন সন্ত্রস্ত করে রেখেছে যে, সেই অসহায় লোকগুলো জিহাদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারে না। তালেবানের সহযোগিতা পর্যন্ত করতে পারে না। জিহাদভিত্তিক সাহিত্য অধ্যয়ন করতে পারে না।

এমনিভাবে মুসলমানদের আরো অনেক আন্দোলনের পক্ষে তারা দাঁড়াতে পারে না। ভারতে হিন্দুদের এমন সন্ত্রাস বিরাজ করছে যে, কথায় কথায় মুসলমানদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। আর যে-ই সামান্য সাহসিকতা প্রকাশ করে তাকেই গ্রেফতার করে অত্যাচারের লক্ষ্য বানানো হয়। এমতাবস্থায় মুসলমানদের কি করা উচিত? একটি পন্থা তো এই যে, কারাগারের বন্দীদের মত খাদ্য, বাহ্যিক নিরাপত্তা, তথাকথিত শান্তি, আযান-নামায এবং শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের অনুমতিকে যথেষ্ট মনে করে হিন্দুদের দাসত্ব মেনে নেওয়া। অহিদুদ্দীন খানের মত দাসত্বকেই সম্মান ও

গর্বের বস্তু মনে করা। মুশরিকদেরকে কাফের বলা থেকেও নিজেদেরকে পবিত্র ঘোষণা করা। জিহাদের নামকে নিজেদের জীবন থেকে বিতাড়িত করে ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে সৌভাগ্য মনে করা এবং কুরআন মাজিদের জিহাদের আয়াতসমূহকে পুরাতন যুগের বিধান সাব্যস্ত করে এ যুগের মুজাহিদদেরকে গালি দেওয়া। মুশরিকদের থেকে স্বরচিত ইসলামী গ্রন্থসমূহের জন্য প্রশংসা ও পুরস্কার নেওয়া।

শাব্দিক বিতর্কের প্রসার ঘটানো। কিছু মুসলমানের মুশরিকদের কাছে যৎসামান্য মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী হওয়াকে ইসলামের মহত্ব ও মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার অর্থ মনে করা। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ফরয ‘জিহাদের’ অর্থ ও তাৎপর্যকে বিকৃত করা এবং নিজ সন্তানদেরকে খরগোশের ন্যায় ভীরু ও আরামপ্রিয় বানানো। ইসলামের এমন একটি নতুন পরিচয় তুলে ধরা, যাতে অংশীবাদীদের দাসত্বকে নিজের জন্য বিশাল নিআমত মনে করা হবে। এটি এমন একটি পন্থা, জাতির ধ্বংস ও বরবাদীরূপে যার ফলাফল আত্মপ্রকাশ করবে। আল্লাহ মাফ করুন, ভারতের বেশির ভাগ মুসলমান এই পন্থাকে দ্রুত অবলম্বন করে চলছে। তারা দাসত্বকে ভাগ্যের লিখন মনে করে নিজেদের অন্তরকে নিশ্চিন্ত রেখেছে। বর্তমানে তাদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের বাসনাও বিলুপ্ত। অথচ এটি এমন এক বিপদজনক

অবস্থা, যা মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। মুসলমান শুধু বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীতে আসেনি। এ জীবন তো একটি পরীক্ষা। একে প্রকৃত নি'আমত মনে করা, এর জন্য ঈমানকে বিক্রি করা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

এমনিভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার অর্থ বুঝতেও ভুল করা হয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তার অর্থ যদি এই হয় যে, আমাকে কেউ কিছু না বলুক, দ্বীনের জন্য কোন কষ্ট স্বীকার না করি, কোন পদক্ষেপ না নেই তাহলে এই শান্তি ও নিরাপত্তা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিনের জন্যও পাননি। অথচ তিনিই আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার দুআ শিখিয়েছেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এর অর্থ পরিবর্তন করা হয়েছে। কাপুরুষের স্বার্থপর জীবনের নাম রাখা হয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন। অথচ এমন নোংরা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে মুসলমানদের আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মুসলমান তাদের জীবন-মরণ, খাদ্য ও নিরাপত্তার বিষয় আল্লাহর উপর সঁপে দিবে। তারা চিন্তা করবে যে, তাদের বর্তমান জীবন নিকৃষ্টতম দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ। এই দাসত্ব তাদের দ্বীন ও ঈমানের উপর মারাত্মক আঘাত করছে।

এর ফলে তারা দ্বীনের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করতে পারছে না। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ঈমান ও ভবিষ্যত মারাত্মক বিপদের মুখে। মৌলিক এই চিন্তার উদ্ভব হলে আযাদীর পথ আপনা আপনি বের হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। কারণ, আযাদীর পথ জ্যামিতির সংখ্যা ও অংকের মত নয়। বরং এ পথ সর্বদা ফেরাউনের ভয়ংকর বাহিনী আর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসে।

পবিত্র কুরআন হযরত মূসা (আঃ)এর ঘটনাসমূহ বারবার আলোচনা করেছে। হায়! যেসব লোক বাহ্যিক উপকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আযাদীকে ব্যর্থ বলছে, তারা এ ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে ফেরাউনকে ডুবতে আর বনী ইসরাঈল কওমকে আযাদ হতে দেখবে। আযাদীর খাতিরে কিছু লোকের প্রাণ যদি যায় যাক। প্রাণ তো যাবেই, এতো থাকার বস্তু নয়। একে আল্লাহর কাছে যেতেই হবে। তবে আযাদীর এই সংগ্রামের জন্য অনেক বুনিয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অনেক বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আজ কাশ্মীরের মুসলমানগণ ভারতের হাত থেকে আযাদী লাভের সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে। এ আন্দোলন থেকে আযাদীর পথ অবগত হওয়া, এই আন্দোলনকে মর্যাদার চোখে দেখা এবং ভারতের শক্তিধর সাম্রাজ্যের সাথে টক্কর দিয়ে শাহাদত বরণকারীদেরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির

উপহার পেশ করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক।

শ্রীনগরের বাদামীবাগ টর্চারিং সেন্টার এগার দিনের জিজ্ঞাসাবাদের পর একদিন মেডিকেল চেকাপের জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে প্রচণ্ড ভীড় ছিল। কয়েকজন সৈনিক অপেক্ষমানদের কাতারে বসেছিল। আমাকেও হাতকড়া পরিয়ে তাদের কাছে বসিয়ে দেওয়া হয়। ইউ.পি, এর একজন সৈন্য আমার পাশে এসে বসে পড়ে। সৈনিকটিকে স্বভাবজাত ‘গল্পবাজ’ বলে মনে হচ্ছিল। সে আমার সঙ্গে কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে গল্প ঝাড়তে লাগল। তার অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সে জ্ঞানের উপর তার অবিচল বিশ্বাস দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম। সেদিন আমি প্রথম বুঝতে পারি যে, ভারত সরকার অন্যদের সাথে তো মিথ্যা বলেই, নিজের লোকদের সাথেও মিথ্যা বলে থাকে।

পরবর্তীতে আমার অভিজ্ঞতা যতই বাড়ছিল এই অনুমানও বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছিল। বাস্তবিকই ইণ্ডিয়া শুধু কাশ্মীরীদেরকেই নয়, নিজের সেনাবাহিনীকেও ধোকায় ফেলে রেখেছে। মনে হয় যেন ‘মিথ্যাই’ হিন্দুধর্মের ভিত্তি। এ জাতিকে আল্লাহ তাআলা মিথ্যার আযাবে আক্রান্ত করেছেন। আল্লাহ মাফ করুন। হিন্দুদের সর্বদা

মিথ্যা বলার প্রভাব ভারতের মুসলমানদের উপরেও পড়তে শুরু করেছে। আমরা কাশ্মীর বা ইণ্ডিয়ার কারাগারে মুসলমাদেরকে মিথ্যা বলা দেখলে খুব ব্যথিত হতাম। সত্য বলা মুসলমানদের প্রতীক। আর এখন কাফেরদের গোলামীর ফলে এই প্রতীকটিও মুসলমানদের থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ভারতের দ্বীনদার মুসলমানদের উচিত কদর্য এই ব্যাধি অর্থাৎ মিথ্যা বলার প্রবণতা দূরীভূত করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালানো। স্বজাতিকে গুরুত্বহীন ও অবিশ্বাস্য হওয়া থেকে রক্ষা করা দরকার।

সেই হিন্দু সৈনিকটি পানির মত গল্প করে চলছে আর আমি অসহায়ভাবে তা শুনছি। অকস্মাৎ একজন জুনিয়ার অফিসার আমার কাছে দৌড়ে আসে। সে ক্রোধভরে ধমক দিয়ে আমাকে চুপ হতে বলে। সেদিন বড় আশ্চর্যের দিন ছিল। জুলুম-অত্যাচার, মারপিট, আর ধমক প্রতি মুহূর্তে বর্ষণ করা হচ্ছিল। সেই সৈনিকটির সাথে আমি একটি কথাও বলিনি। আমি নীরবে, অসহায়ভাবে ও বাধ্য হয়ে তার কথা শুনছিলাম। কিন্তু ইণ্ডিয়ান অফিসার তার সৈন্যকে বুঝানোর পরিবর্তে আমার উপর ঝাল মিটিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। তার ধমকের প্রতিক্রিয়া গল্পবাজ সৈনিকটির উপরেও পড়ে। সে আমার কাছ থেকে উঠে অন্য জায়গায় চলে যায়।

কিছু সময়ের জন্য কক্ষটি নীরব হয়ে যায়। কিন্তু কয়েক মিনিট পর আমার পশ্চাৎ থেকে গালির শব্দ আসতে থাকে। আমি সামান্য ঘুরে দেখি একজন আহত শিখ আমাকে পাঞ্জাবী ভাষায় অবিরাম গালি দিয়ে চলছে। আর বাকী সৈন্যরা খ্যাক খ্যাক করে হাসছে। অশ্লীল গালাগালির এই পরিবেশে আমার জন্য এক মুহূর্তও বসে থাকা দুষ্কর। কিন্তু আমি অপারগ। আল্লাহর যিকির করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তাই আমি সেদিক থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে এনে যিকিরে লিপ্ত হই। ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীতে বিরাট সংখ্যক শিখ ভর্তি করা হয়েছে। ৫০৫৫ নামে গৌরবময় একটি ইণ্ডিয়ান রেজিমেন্ট সম্পূর্ণ শিখদের সমন্বয়ে গঠিত। এমনিভাবে ডোগরা রেজিমেন্টেও বিরাট সংখ্যক শিখ কর্মরত রয়েছে। কারণ, পাঞ্জাবের পর শিখদের বৃহত্তর বসতি জম্মুতে। আর জম্মুতে দীর্ঘদিন ধরে ডোগরাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত।

১৯৮০ ঈসায়ীতে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কিছু শিখ ইণ্ডিয়ার ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রাম সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে ছিল, এমতাবস্থায় তাদেরই মধ্যে হতে কতিপয় গোলামীপ্রিয় লোক সেই সংগ্রামের কণ্ঠ চেপে ধরে। এই সংগ্রাম এখনো ভিতরে ভিতরে চলছে। যদিও তার

অগ্নিশিখা বর্তমানে নিস্তেজ হয়ে আছে। শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে গাদ্দারী, বিশ্বাসঘাতকতা ও অমানবিকতা খুব বেশি।

শিখধর্মের ভিত্তি কপটতার উপর। ফলে তার অনুসারীদের রূপ পরিবর্তন করতে সময় লাগে না। ১৯৪৭ ঈসায়ীতে তারা হিন্দুদের ইঙ্গিতে বড় ঘৃণাৰ্থ কর্ম করেছে। তারা মুসলমানদের অন্তরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ১৯৮০ ঈসায়ীতে তারা প্রথমবার অনুমান করতে পারে যে, তারা তো ব্রাহ্মণাবাদী সাম্রাজ্যের ক্রীড়নক হয়ে আছে। সুতরাং তারা ভারতের বর্বরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তখন তারা মুসলমানদের থেকেই সর্বাধিক সাহায্য ও সমর্থন পায় এবং ভবিষ্যতেও যখনই তারা বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ভারত থেকে মুক্তি লাভের কথা বলবে, তখনই মুসলমানরা তাদেরকে অবশ্যই সহযোগিতা করবে। কারণ, হিন্দুত্ববাদী সাম্রাজ্য শক্তিধর থাকা কোন মানুষ বা অন্য প্রাণীর জন্যই কল্যাণকর নয়।

ইণ্ডিয়ার সেনাবাহিনীর মধ্যে বর্তমানে দুই ধরনের শিখ সৈনিক রয়েছে। এক প্রকার তারা—যারা নিজেদের দশ সহস্রাধিক তরুণের লাশ বহন করে ইণ্ডিয়ার আসল চেহারা চিনতে পেরেছে। তারা অতীতে মুসলমানদের উপর কৃত অত্যাচারের জন্য সীমাহীন অনুতপ্ত ও লজ্জিত। এসব সৈনিক কাশ্মীর আন্দোলনে

যুদ্ধরত মুজাহিদদেরকে ভিতরে ভিতরে সাহায্য করে থাকে। তারা যে কোন প্রকার সহযোগিতা করতে কুন্ঠিত হয় না। আমার ছয় বৎসরের বন্দী জীবনে এমন অনেক শিখেরই দেখা পেয়েছি, যারা নিজেদের মনের আবেগ প্রকাশ করা ছাড়াও কোন কোন জায়গায় আমাদের সহযোগিতাও করেছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীতে কর্মরত শিখদের আরেকটি দল মুসলমানদের বিপদজনক শত্রু। এরা নোংরা চরিত্রের মদ্যপ ও বদকার শিখ সৈনিক। যারা স্বজাতির স্বাধীনতা হিন্দুদের হাতে বিকিয়ে দিয়ে আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বহীনের জীবন যাপন করছে। গালিদাতা শিখটিকে সে দলেরই প্রতিনিধি মনে হচ্ছিল। তাই সে নিজের ভিতরের বিদ্বেষ গালির মাধ্যমে উদগীরণ করছিল। অল্পক্ষণ পরই আমাকে ডাক্তারের সামনে পেশ করা হয়। প্রথম দৃষ্টিতে সেনাবাহিনীর এই ডাক্তারটিকে সুশ্রী ও ভদ্র মনে হলেও পরবর্তীতে সে যখন মুখ খুলল তখন তার মুখ থেকেও কদর্য গালি বের হতে থাকে। সে চেকআপ তো কোনরকম করল, তবে জিহাদের বিরুদ্ধে গালিভরা জোরালো এক বক্তব্য ঝাড়ল। তদন্ত ও অত্যাচারের পরে মেডিকেল চেকআপের আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে কখনো কখনো এমন ডাক্তারদের মুখোমুখিও হতে হয়। এরা আমাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মুখে যা আসে বকতে থাকে। মজার ব্যাপার এই যে, তাদের বক্তৃতার সময় কয়েদীদের শরীর থেকে

বস্ত্র খুলে নেওয়া হয়, আর কিছু সৈন্য ডাণ্ডা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। যাতে করে বন্দীরা তাদের বক্তব্যের কোন তিক্ত উত্তর না দিতে পারে। গ্রেফতারীর প্রাথমিক এসব ধাপ অতিক্রম করার পর কারাগারে ইণ্ডিয়ার কিছু বীর অফিসার ও ডাক্তার যখন মুজাহিদদের সঙ্গে তর্ক করত, তখন আল্লাহর ফজলে তর্কে তাদের কুপোকাত হয়ে যেত। তাদের বক্তৃতা ও জ্ঞানের গর্ব মাটিতে মিশে যেত। কিন্তু গ্রেফতারীর প্রথম দিনগুলোতে তারা ডাণ্ডার জোরে ভাষণ শুনিয়ে দিত।

মেডিকেল চেকআপের পর আমাদেরকে একটি গাড়ীতে বসিয়ে শিকল দ্বারা বেঁধে ফেলা হয়। সেদিন প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল। ফলে মাটিতে কয়েক ফুট পুরো বরফ জমে যায়। বরফের পিচ্ছিলতা থেকে বাঁচার জন্য গাড়ীর টায়ারের নিচে শিকল বাঁধা হয়েছিল। তীব্র সেই শীত মৌসুমে বড় একটি সেনা কনভয়ের সাথে আমাদেরকে শ্রীনগর নিয়ে আসা হয়। সেখানে বাদামীবাগ হেড কোয়ার্টারের চানার ক্লাবে আমাদের উভয়কে সাংবাদিকদের সম্মুখে এনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমাদের গ্রেফতারীর ঘোষণা দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের এই প্রেস কনফারেন্সে তারা ইতিপূর্বের মিথ্যার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। তারা সাংবাদিকদের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে নির্লজ্জভাবে মিথ্যার পর মিথ্যা

উদগীরণ করছিল। আর সাংবাদিকরা তা খুব মনোযোগ দিয়ে লিখছিল এবং ক্যামেরার উদরে মিথ্যায় ভরা এই মজলিস সংরক্ষণ করছিল। এই প্রদর্শনীর পর আমাদেরকে বাদামী বাগের টর্চারিং সেন্টারে আনা হয়। সেখানে মেডিকেল রুমে প্রাথমিক কিন্তু ভয়ানক জুলুম অত্যাচারের পর আমাদেরকে পৃথক পৃথক সেলে ফেলে রাখে। সেলে পৌঁছার পর আমাদের সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল—আমরা এখানে আসার পূর্বেই যে নয়জন পাকিস্তানী মুজাহিদ এখানে বন্দী ছিলেন—তাদের সাথে মুলাকাত। নিচে তাদের নাম দেওয়া হল—
১. জনাব কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ মানসূর লেংরিয়াল,

২. সুলতান আহমাদ ময়ানা,

৩. মুহাম্মাদ সাঈদ,

৪. সাইফুল্লাহ খালেদ,

৫. রেযাউল্লাহ আওয়ান,

৬. কুদরাতুল্লাহ,

৭. যাররার বেলুচ,

৮. নাসের ইকরাম,

৯. গোলাম হায়দার।

এদের বন্দী হওয়ার বিষয়টি যদিও দুঃখজনক ছিল। কিন্তু সংকীর্ণ এই টর্চারিং সেন্টারে পরস্পর একত্রিত হওয়া এমন এক

আনন্দের বিষয় ছিল, যা এই একাকীত্ব ও তীব্র বেদনাকে হালকা করে দেয়। প্রথম দিকে আমাদের পরস্পর মিলিত হওয়া নিষেধ ছিল, কিন্তু পরে সকল সাথী সাহসিকতার সাথে পরিবেশ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। কয়েক দিন পর নাসরুল্লাহ নামক পাঞ্জশীরের একজন মুজাহিদ কয়েদীকেও আমাদের সাথে রাখা হয়। ফলে আমাদের সংখ্যা বারতে গিয়ে দাঁড়ায়। এই টর্চারিং সেন্টারে অবস্থানকালীন সাত মাস সময়ে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। সেসব ঘটনার দিকে দৃষ্টিদানের পূর্বে আসুন এই নির্যাতন কেন্দ্রের উপর একবার দৃষ্টি দেই। কারাগারে বন্দী আমার একনিষ্ঠ এক সঙ্গী কয়েক মাস পূর্বে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখে। যার সারাংশ নিম্নরূপ—

শহীদ আফাকের বোমা বিস্ফোরণের পর বর্তমানে তার অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। তাই এসব তথ্য প্রকাশ করায় কোন সমস্যা মনে করছি না। আল্লাহর পথের এক সৈনিকের কলমে অপর বন্দীর আলোচনা পাঠ করুন।

বাদামীবাগ টর্চারিং সেন্টার — আবূ হায়দার মায়ানা।

আমীরুল মুজাহিদীন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) ভারতের কয়েদ থেকে মুক্তি পেয়ে কল্যাণ ও নিরাপত্তার সাথে প্রিয়

মাতৃভূমিতে পৌঁছেছেন। পূর্বপুরুষদের আলোকজ্জ্বল পদচিহ্ন ধরে সফররত হযরতের বন্দী জীবন আকর্ষণীয় ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কারাগারে তাঁর অবস্থানের ধরনই ছিল ভিন্নরকম। বন্দীকালীন সময়ে একদিকে তিনি নিজের কারাসঙ্গীদের তালীম, তারবিয়্যাত ও আত্মশুদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। অপরদিকে তিনি লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে জাগ্রত করার দায়িত্বও সম্পাদন করতে থাকেন। লেখালেখি ও পত্র আদান প্রদানে সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি কারাগারে অবস্থান করে মুসলিম উম্মাহকে কমপক্ষে চারটি জিহাদ বিষয়ক গ্রন্থ ও শত শত প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন। অথচ কারাগার থেকে এক একটি লেখা বাহিরে প্রেরণ করা সিংহের দুধ সংগ্রহ করার মতই দুরূহ ব্যাপার ছিল। কারাগারের ভিতর কারা কর্তৃপক্ষ শত্রুদের সঙ্গে তিনি কোন প্রকার শিথিলতা বরদাস্ত করতেন না। তিনি কারাগারের ভিতর ব্যবস্থাপক শত্রুদের সাথে এমন আচরণই করতে থাকেন, যেন তিনি কারাগারে নন, বরং রণাঙ্গনে যুদ্ধরত আছেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, হযরতকে কয়েদ করে ভারত ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে।

১৯৯৪ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের ইসলামাবাদ এলাকা থেকে

হযরতকে এবং মাওলানা সাজ্জাদ খান শহীদ (রহঃ)কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপর বেশ কিছুদিন তাঁকে আর্মী ক্যাম্পে রাখা হয়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের নামে পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। সেখান থেকে তাকে শ্রীনগরের মিলিটারীদের কলংক বাদামীবাগ টর্চারিং সেন্টার, তথা বিবি ক্যাম্পে আনা হয়।

১৯৯৪ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি সেই টর্চারিং সেন্টারে বন্দী থাকেন। তারপর তাঁকে এমন এক কারাগারে নেয়া হয়, যা কাশ্মীরের মুজাহিদদেরকে বন্দী রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সেলসমূহের মধ্য হতে একটি সেলে হযরতকে বন্দী রাখা হয়। হযরতের সেল সংলগ্ন দ্বিতীয় সেলটিতেই সাজ্জাদ খান আটক ছিলেন। তিনি বেশির ভাগ সময় কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকতেন। হযরত যে সেলে ছিলেন, সেই সেলটিকে সবুজ রং করা হয়, সেলগুলোর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছয় ফিট করে। টর্চারিং সেন্টারের বিল্ডিংয়ের ছাদ ছাড়াও লোহার শিক দ্বারা এগুলোর পৃথক ছাদ বানানো হয়েছে।

মোট এই আটটি সেলে হযরতের কারাসঙ্গীদেরকে বন্দী রাখা হয়েছিল। অন্য কথায় এসব সেল ছিল মুজাহিদ মেহমানদের জন্য নির্ধারিত।

এই সেলগুলোতে আলোর কোন ব্যবস্থা ছিল না।
এখানে তিনটি বড় বড় লকাপ রয়েছে।
এগুলোতে স্থানীয় মুজাহিদদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

আর্মীদের নিয়ন্ত্রণাধীন বাদামীবাগ টর্চারিং সেন্টারে একটিমাত্র গোসলখানা। প্রায় একশ জন মুজাহিদের গোসল করা, কাপড় ধোয়া ও পাঁচ ওয়াক্ত অযু করার নিমিত্তে এটি বানানো হয়েছে। ওদিকে স্থানীয় মুজাহিদদেরকে মেহমান মুজাহিদদের থেকে পৃথক করে আটক রাখা হয়েছিল। এই গোসলখানা মুজাহিদদের জন্য মিটিং রুমের কাজ দিত। এখানেই তাদের পরস্পরের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও হত। তাছাড়া কারাগারের কয়েকটি টয়লেটের সম্মুখস্থ এই পথটিও সাক্ষাৎ কেন্দ্রের কাজ দিত।টয়লেটগুলো টর্চারিং সেন্টারের ছাদের নীচেই শুধু ছিল না, বরং হযরতকে যেই সেলে বন্দী রাখা হয়েছিল সেই সেলের সারির একেবারেই সন্নিকটে ছিল। এতদসত্ত্বেও ভীরু ও ভীতু শত্রুরা হযরতকে হাতকড়া পরিয়ে টয়লেটে নিয়ে যেত। টর্চারিং সেন্টারে অবস্থিত কারাগারের পিছনের মেডিকেল রুমটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নবাগত কয়েদীদেরকে এখানেই স্বাগত জানানো হত। এখানে মেডিকেল চেকআপের নামে সেনাবাহিনীর ডাক্তাররা তাদের উপর এমন পাশবিক জুলুম করত যে, মানবতা ডুকরে কাঁদত। কালিমূর্তির পূজারী

ডাক্তাররা এখানে তাদের হিংস্রতার পরিপূর্ণ প্রদর্শনী করত। তারা ঔষধ চাইলে লাঠি মারত। হযরতকে বাদামীবাগে এনে প্রথমে সেই মেডিকেল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর প্রহার করা হয়। হযরতের শরীরের কোন অংশই বোধ হয় সেই মার থেকে বাদ যায়নি। এ সময় লাঠির একটি আঘাত হযরতের চশমার উপরে পড়লে তা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তারপর অনেক দিন তিনি কারাগারে চশমাবিহীন কাটান।

টর্চারিং সেন্টারের চারদিকে মজবুত কাটাতারের বেড়া বিদ্যমান রয়েছে। ভিতর ও বাইরের বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ পন্থায় এটি তৈরী করা হয়। এর কাঠামো সাধারণ কাটাতারের বেড়া থেকে ভিন্ন।

কারাগারের বহিপ্রাচীরের অনেকগুলো জানালা রয়েছে, যেগুলো আলোবাতাস প্রবেশ করার কাজ ছাড়াও চিঠি প্রেরণের কাজেও ব্যবহৃত হত। টর্চারিং সেন্টারে কাগজ কলম একদম নিষিদ্ধ ছিল। চিঠিপত্র আদান প্রদানে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল। এমতাবস্থায় কর্মরত আর্মী ঝাড়ুদার টর্চারিং সেন্টারের বহিরাংশে ঝাড়ু দিতে দিতে সেই খিড়কীর নিকটে আসত এবং অতি সাবধানে তার পোশাকের ভিতর বা অন্য কোন স্থানে লুকানো পত্র জানালায় রেখে দিত। আর কোন মুজাহিদ পাহারারত তিন সৈন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে তাড়াতাড়ি সেই পত্র উঠিয়ে নিত। তারপর পত্রটি হযরতের বা শহীদ সাজ্জাদ (রহঃ)এর

খেদমতে পেশ করত। তিনি উপযুক্ত সময়ে সতর্কভাবে উত্তর লিখতেন। পরদিন ঝাড়ুদার ঝাড়ু ঘুরাতে ঘুরাতে জানালার নিকট পৌঁছত। তখন জানালার বাইরে পত্র ফেলে দেওয়া হত। ঝাড়ুদার কাগজ কুড়ানোর স্বভাবসুলভ পন্থায় তা উঠিয়ে ময়লার মধ্যে ফেলে দিত। এভাবে সেখান থেকে নিরাপদে মুজাহিদদের নিকট পত্র চলে যেত। ভারতীয় আর্মীদের এমন অনেক লোক মুজাহিদদের জন্য এখনো কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

বাদামী বাগ টর্চারিং সেন্টারের আঙ্গিনায় অবস্থিত দুটি কক্ষ কারাগারের সম্মুখভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই কক্ষদ্বয়ে বন্দী মুজাহিদদের থেকে বিবৃতি নেওয়া হত। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা পালাক্রমে কয়েদীদেরকে এখানে ডেকে নিত এবং তদন্তের নামে তাদের উপর জুলুম অত্যাচার করত। লোহার রড দিয়ে তাদেরকে পিটাত। রাতে পূনরায় লকাপে বন্ধ করে রাখত। কখনো কখনো সেই কক্ষসমূহে এমন অত্যাচার চলত যে, বন্দী মুজাহিদ আর জীবিত ফিরত না। বরং তার লাশ সেন্টারের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কয়েক দিন পর পরই হযরতকে সেই কক্ষগুলোতে নিয়ে যাওয়া হত এবং তদন্তের নামে ঘন্টার পর ঘন্টা অত্যাচার চালাত। হযরত যতদিন এই সেন্টারে বন্দী ছিলেন, প্রত্যেক দিন নিত্য নতুন পন্থায় শত্রুরা তাঁর উপর অত্যাচার চালাতো। কোনদিনই

শত্রুদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি স্বীয় আদর্শের উপর সর্বদা অটল থাকেন। সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসার এসে হযরতের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হত। এদিক সেদিকের কথা বলে মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাসী প্রমাণ করার চেষ্টা করত। পরিশেষে হযরতের অকাট্য প্রমাণের মুখে পরাজিত হয়ে মুখ বিকৃত করে একথা বলে চলে যেত যে , এ লোক পরিবর্তন হবে না।

এই সেন্টারে দায়িত্বে নিয়োজিত শত্রুরা মুজাহিদদেরকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য পূর্ণ চেষ্টা চালাত। তারা চেষ্টা করত যেন মুজাহিদদের কাছে সংবাদ পৌছার কোন পথ না থাকে এবং তাদের সংবাদও বাইরে পৌছতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ পাক স্বীয় রহমত দ্বারা শত্রুর লোকদের হাতেই মুজাহিদদের জন্য রেডিওর ব্যবস্থা করে দেন। রেডিওটি লুকিয়ে রাখা হত। খবরের সময় তা বের করা হত। খবর শুনে পূনরায় লুকিয়ে রাখা হত। ১৯৯৪ ঈসায়ীর সেপ্টেম্বর মাসে হযরতকে ও তাঁর অপরাপর সঙ্গীদেরকে জম্মুর একটি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و على آله واصحابه اجمعين

২৫শে শাওয়াল মোতাবেক ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০০, রোজ মঙ্গলবার।

***

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শ্রীনগরের বাদামীবাগের এই টর্চারিং সেন্টারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। আসুন এবার সেসব ঘটনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করি। এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাব যে, সেই টর্চারিং সেন্টারসমূহে জিহাদের ফরয আদায় করতে গিয়ে বন্দী হওয়া মুজাহিদদের দেহ ও মনের উপর কেমন অত্যাচার চালানো হয়। আজকের বৈঠকে যে ঘটনাটি পেশ করা হচ্ছে তা আমি দিল্লীর ‘তিহার’ কারাগারে বন্দী থাকাবস্থায় লিখেছিলাম। এবার আসুন জেল সম্পর্কে জেলে বসেই লেখা প্রবন্ধটি পাঠ করুন। এর শিরোনাম—“তদন্তের মর্মন্তুদ দিক।”

তদন্তের মর্মন্তুদ দিক
সকাল আটটা বাজতেই সকল বন্দীর অন্তর ধড় ফড় করতে থাকে। কারণ, প্রতিদিন সে সময়েই মিলিটারী পুলিশের একজন লোক ঐসব বন্দীর নাম ডাকত, যাদেরকে ইন্ট্রোগেশন অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এটি ছিল আর্মীদের

ইন্ট্রোগেশন কেন্দ্র, তাই এখানে ভিন্নধর্মী কিছু আইন ছিল। যেগুলোর লক্ষ্য ছিল বন্দীদেরকে তদন্তকালীন সময়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা। আমি শুনেছি যে, পূর্বে এখানে অর্থাৎ বাদামীবাগ ইন্ট্রোগেশন সেন্টারে বেশ কয়জন মুজাহিদ তদন্তের সময় তীব্র অত্যাচারের শিকার হয়ে শহীদ হন। এ সব ঘটনায় সরকারের বদনামের ভয় হলে সেনাবাহিনীর উপরস্থ লোকেরা কিছু নিয়ম প্রণয়ন করে। তার মধ্যে একটি নিয়ম এই করা হয় যে, জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে এবং পরে একজন ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডার বন্দীকে চেক করবে এবং চিকিৎসা প্রদান করবে।

পরে জানতে পারি যে, এই নিয়ম শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর তদন্ত কেন্দ্রেই রয়েছে, আর বি.এস.এফ (অর্থাৎ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) ও জম্মু কাশ্মীরের পুলিশ এ নিয়মের ঊর্ধ্বে। সুতরাং শ্রীনগরে অবস্থিত বি.এস.এফ এর তদন্ত কেন্দ্র ‘পাপটো’তে শত শত মুজাহিদকে জবাই করা হয়। অনেকে মার খেতে খেতে শহীদ হন। অনেকের এক কান দিয়ে লোহা ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করা হয়। এখানকার পরিভাষায় এই অমানবিক নির্যাতনকে ‘টাইগার’ করা বলে। বি.এস.এফ এর একজন মুসলমান চাকুরীজীবি, যিনি বাধ্য হয়ে এই ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছিলেন এবং মুসলমানদের উপরে চালিত অত্যাচার দেখে

সর্বদা ব্যথিত হতেন, তিনি পাপটোর মত ভয়ংকর জায়গাতেও সাধ্যমত মুজাহিদদের সাহায্য করতেন। একবার তিনি আমাদের এক সঙ্গীকে, যিনি এই সেন্টারে নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন, বলেন যে, বি,এস,এফ, এর অমুক গোঁড়া হিন্দু সদস্যটি এ পর্যন্ত আশিজন মুজাহিদকে তদন্তকালে নিজ হাতে জবাই করেছে। আমি যখনই সুযোগ পাব ওকে হত্যা করে আমার মনকে ঠাণ্ডা করব, ইনশাআল্লাহ। সেই সৈন্যটি উক্ত মুজাহিদের এলাকার লোক ছিল বলে তাকে বিশ্বাস করে এই গোপন তথ্য এবং তার মনের বাসনা ব্যক্ত করে। এমনিভাবে পুলিশের ইন্ট্রোগেশন সেন্টারেও কোনরূপ ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা নেই। সেখানে জুলুম ও অত্যাচারের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। সেসব সেন্টারেও অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন এবং অনেকেই চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন। কিন্তু ইণ্ডিয়ান আর্মী নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে কিছু আইন বানিয়েছে। তবে তারা বি,এস,এফ ও পুলিশের মত মুজাহিদদেরকে খুন করার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে রেখেছে। ব্যবস্থাটি এই যে, মুজাহিদদেরকে গ্রেফতার করে সেখানেই তদন্তের নামে টর্চার করা হয়। যেখানে অত্যাচার করার কোন প্রকার আইন কানুন বা সীমারেখা নেই।

সেখানকার নির্যাতনের শিকার হয়ে কোন মুজাহিদ মারা গেলে, গুলি বিনিময়ে নিহত

হয়েছে বলে প্রচার করে হত্যাকাণ্ডটিকে হজম করা হয়। তবে বন্দী মুজাহিদের নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশা থাকলে বা উচ্চপদস্থ কোন লোক হলে তাকে ইন্ট্রোগেশন সেন্টারে নেওয়ার পূর্বে কোন ক্যাম্পে আটক রাখা হয়। ক্যাম্পে ঠিক বি.এস.এফ এর লোকদের মতই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সুতরাং অসংখ্য মুজাহিদ সেসব ক্যাম্পে শহীদ হয়েছেন। নদীতে তাদের লাশ পাওয়া গেছে। তবে মারার সময় সতর্কতা অবলম্বন করে ক্লাশনিকভ দ্বারা গুলি করে হত্যা করা হয়। যেন হত্যার দোষ মুজাহিদদের মাথায় চাপানো যায়। ক্যাম্পে বন্দী রাখার পর অনেক দিন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক মাস পর্যন্ত যদি কেউ বেঁচে থাকে তাকে ইন্ট্রোগেশন সেন্টারে আনা হয়। সেখানে নতুন করে তদন্ত করা হয় এবং মারাত্মক টর্চার করা হয়। তবে তা সীমার মধ্যে থাকে।

যেসব বন্দীকে এম.আই রুমে যেতে হবে সকাল আটটায় মিলিটারী পুলিশের লোক তাদের নাম ডাকে। তারপর তাদেরকে এম আই রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেই নিয়ে যাওয়ার পন্থাও আশ্চর্যজনক। বন্দীদের চক্ষু বন্ধ রাখার জন্য তাদের মাথা ও মুখের উপর জামা ঝুলিয়ে রাখা হয়। তাদেরকে রুকূ অবস্থায় হাঁটতে হয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা চলার পথে তাদের ঘাড় ধরে রাখে। এভাবে রুকূ অবস্থায় হাঁটিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে

যাওয়া হয়। ডাক্তার কোন মতে দেখে ইন্ট্রোগেশনের অনুমতি লিখে দেয়। তবে কেউ মারাত্মক রোগী হলে তার ইন্ট্রোগেশনের অনুমতি দেয় না। এরপর বন্দীকে তার কক্ষে ফিরিয়ে আনা হয়। তারা সেখানে কম্পিত হৃদয় আর অশ্রুপূর্ণ চোখে যিকির করতে থাকে আর দশটা বাজার অপেক্ষা করতে থাকে।

দশটা বাজলে পূনরায় পূর্বের মতই রুকু অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদের রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কাগজ, কলম, লাঠি, ডাণ্ডা, লোহার রড ও কারেন্টের তার নিয়ে প্রস্তুত কয়েকজন পশু আকৃতির অফিসার তাদের প্রতীক্ষায় থাকে। তারপর এই বন্দী যুবকদের চিৎকার ধ্বনি তাদের অপরাপর সঙ্গীদেরকে অস্থির করে রাখে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তদন্ত চলতে থাকে। সন্ধ্যার সময় সেই অফিসার যুবকদেরকে খুনির দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরের দিনের কঠিন পরিণতির ভয় দেখিয়ে একরাতের সুযোগ দিয়ে চলে যায়। তারপর বন্দীদেরকে তাদের সেলে রেখে দেওয়া হয়। তদন্তেরও ধরনও বিচিত্র। বেশির ভাগ সময় কয়েকজন অফিসার সম্মিলিতভাবে তদন্ত করে থাকে। তারা চেয়ারে বসে থাকে। তাদের একজন থাকে খালি হাতে, আর একজন প্রহার করার জন্য হাতে রড নিয়ে অথবা বিদ্যুতের শক লাগানোর জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

বন্দীদের নির্যাতন করার কাজে নিয়োজিত লোকগুলোর বেশির ভাগই নেশায় চুর হয়ে

থাকে। তারা হরদম গালি দিতে থাকে। তারপর বন্দীকে তাদের সম্মুখে দাঁড় করে দেওয়া হয়। প্রশ্নের ঝড়, গালির বর্ষণ এবং ডাণ্ডা ও গরম শলাকার মাঝে তাকে একেকটি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। নিজের অতীত জীবনের একেকটি মিনিটের হিসাব দিতে হয়। মূর্খ অফিসারদের মুখে ইসলাম, পাকিস্তান ও জিহাদের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য কথা শুনতে হয়। অনেকগুলো বাঘের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ এই অসহায়দেরকে পেরেশান করার জন্য আশ্চর্য আশ্চর্য কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

অকস্মাৎ বাহির থেকে একজন অফিসার প্রবেশ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কোন মুজাহিদের দিকে তাকিয়ে বলে—আচ্ছা, এই তো সেই ব্যক্তি। তারপর সে তদন্তকারী অফিসারের কানে ফিস ফিস করে কিছু বলে। তখন তদন্তকারী অফিসার বলে, এসব কথা আমাকে দিল্লী থেকে ফোনে জানানো হয়েছে। এখন তার ইচ্ছা। সে ভালভাবে বলতেও পারে বা মারও খেতে পারে। সব কথা তো আমাদের জানা। এরপর হঠাৎ কোন অফিসার নরম হয়, আর অন্য একজন কঠোর হয়। নম্রতার অভিনয়কারী লোকটি বাহ্যিকভাবে মুজাহিদকে বাঁচাতে চায়, আর বিনিময়ে সে গোপন তথ্য জানতে চায়। কোন কোন অফিসার কোন মুজাহিদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বীয় ভদ্রতা প্রকাশ করার জন্য তাকে চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। নরম নরম কথা বলে। এই সময় অন্য দুইজন অফিসার সেই মুজাহিদকে

মারার জন্য বারবার দৌড়ে আসে। আর ঐ অফিসারটি তা প্রতিহত করার অভিনয় করে।

মোটকথা বন্দীদেরকে পেরেশান করার জন্য বিভিন্ন প্রকার অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করা হয়। ভারতের ধারণায় এ পর্যন্ত তাদের সকল মেধাবী ও চতুর গুপ্তচর ও গোয়েন্দা কাশ্মীরে প্রেরণ করেছে। কিন্তু আমি চারটি ভিন্ন ভিন্ন টর্চারিং সেন্টারে এক বৎসর সময় অতিবাহিত করেছি। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, এসব অফিসারদের চেয়ে নির্বোধ আর কেউই নেই। সব ধরনের নির্যাতন, সব ধরনের চতুরতা, সব ধরনের ছলচাতুরী এবং সারা দুনিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করেও তারা কোন মুজাহিদের নিকট থেকে একটি গোপন কথাও বের করতে সক্ষম হয়নি। আমি দশ বছরের বালক মুজাহিদদেরকে দেখেছি, যাদেরকে ইণ্ডিয়ান আর্মী ও পুলিশরা মেরে মেরে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে কিন্তু তারা তাদের প্রকৃত নাম পর্যন্ত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। দুই ভাই একত্রে গ্রেফতার হয়েছিল। সীমাহীন নির্যাতন করা সত্ত্বেও পুলিশ তাদের পরস্পরের সম্পর্ক উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

বড় বড় কমাণ্ডার গ্রেফতার হয়েছেন, তারা ভয়ানক মার খেয়ে মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু তদন্তকারী অফিসাররা তাদের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি। তাদের যাবতীয় সফলতা গুপ্তচর নির্ভর।

গুপ্তচররা তাদেরকে বলে দেয় অমুক ব্যক্তি মুজাহিদ, অমুকের কাছে অস্ত্র আছে, অমুক অমুক এ্যাকশন করেছে। মোটকথা এই গুপ্তচরদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই তারা সফলতা লাভ করে। নিজেদেরকে ইণ্ডিয়ার সর্বাধিক বুদ্ধিমান গুপ্তচর ধারণাকারীদেরকে আমি পনের বছর বয়সী মুজাহিদের সামনে অসহায় দেখেছি। প্রহার করতে করতে তাদের হাত ক্লান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তারা কোন তথ্যই বের করতে পারেনি।

আমি সত্তর বছরের বৃদ্ধকে দেখেছি, যাদেরকে বিবস্ত্র করে রশি দিয়ে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু তাদের মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে সক্ষম হয়নি। পরিশেষে তারা ক্লান্ত হয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। পরবর্তীতে আমরা জানতে পেরেছি যে, তারা মুজাহিদদের বিশিষ্টজন ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এগুলো তো পরের কথা— অনেক মহিলাকে প্রহার করে করে তাদের পাঁজর গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা স্বগৃহে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র সম্পর্কে কিছুই বলেনি। হায়! কাশ্মীরে যদি গুপ্তচর বৃত্তি না থাকত! কাশ্মীরীদের মধ্যে পরস্পরকে সহ্য করার মনোবৃত্তি থাকত। তাহলে যে পরিমাণ কুরবানী তারা করেছে, এতদিন ইণ্ডিয়ার নৌকা ডুবে যেত। কিন্তু পরস্পর বিশ্বস্ততার তীব্র অভাব ও

বিশ্বাসঘাতকতা এই সংগ্রামকে দীর্ঘ এবং মঞ্জিলকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

তদন্ত সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। আমার সম্পর্কে তাদের নিকট রিপোর্ট ছিল যে, সে অনেক দেশে গিয়েছে, সাংবাদিক, তাবিজ দেওয়ায় পারদর্শী। তাই কয়েক জায়গায় আমার সঙ্গে বাহ্যত নরম আচরণ করেছে, আবার অনেক জায়গায় অত্যন্ত কঠোরতা করেছে। বাদামীবাগে কিছুটা নম্রতা করা হয়, তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় কোটভলওয়াল ও তালাব তালুর টর্চারিং সেন্টারসমূহে। বাদামীবাগে যতজন অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, তাদের সবাই আমাকে চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তারা খুব বেশী অভদ্র আচরণও করেনি। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ এমন একটি কষ্টকর কাজ যে, নম্রতার সাথে করুক আর কঠোরতার সাথে করুক, তা মানুষকে পেরেশান করে ছাড়ে।

যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় শত্রুদেরকে সত্য বলে দেওয়া জায়েয নেই। ওদিকে মিথ্যা বলার অনুশীলনও ছিল না। তাছাড়া মিথ্যা বললে তা আবার ভুলে যেতাম, তাই সকাল আটটা হলেই বুক ধড়ফড় করতে আরম্ভ করত। যদি আমাদের নাম না ডাকা হত, তাহলে তৃপ্তির বাস গ্রহণ করতাম। আর যদি ডাক পড়ত, তখন মনের উপর দিয়ে কি যে অতিবাহিত হত, তা আল্লাহ মাবুদই ভাল জানেন। জীবনের বেশির ভাগ সময় কেউ আমাকে কেন বলে প্রশ্ন করেনি। আর এখন

প্রত্যেক কথায় কেন প্রশ্ন শুনতে হয়। জীবনে কাউকে গালি দেইনি, শুনিওনি, এখানে তা শুনতে হয়। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় সে সময়, যখন তারা ইসলাম ও জিহাদকে নিয়ে কটুক্তি করে। আমরা জবাব দিলেও তা তারা শুনে না। অথবা নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করে দেয়।

একদিন মিলিটারী পুলিশ আসতেই আমার অন্তরে ঘন্টা বাজতে আরম্ভ করে। সে তখন বন্দীদের নাম ডাকছিল। প্রথম নামই ছিল আমার। অথচ আমার বন্দী হওয়ার পর কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। তদন্ত কাজ শেষ হয়েছে। কিছুদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদও বন্ধ ছিল তাই অকস্মাৎ ডাক পড়ায় আমার মন শংকায় ভরে যায়। জানিনা, তারা কোন নতুন বিষয় অবগত হয়েছে কিনা? জানিনা কোন বকাবকি শুনতে হয়। যা হোক, আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে দশটার সময় আমাকে সেই কক্ষে পৌছে দেওয়া হয়। সেখানে ছোট একজন অফিসার হাতে ডাণ্ডা নিয়ে উপবিষ্ট ছিল। ইতিপূর্বে আমাকে সে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। আমি ভিতরে প্রবেশ করলে সে আমার দিকে নরখাদকের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে দেখল। তারপর মাটিতে বসতে ইঙ্গিত করে। আমি তার সম্মুখে মাটিতে বসে পড়ি। সে আমাকে বলে, তুমি এ পর্যন্ত যা কিছু বলেছ তা সবই মিথ্যা। এখন তোমার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে এভাবে বদতমিযী করতে থাকে এবং ধমকাতে থাকে। সাথে সাথে সেই কৃষ্ণবর্ণের অফিসারটি তার ট্যারা চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে অবিরাম দেখতে থাকে। আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করি—আমার কোন কথা মিথ্যা?

সে বলে, সব কথাই।

তারপর হঠাৎ করেই বিষয় ও ভঙ্গি উভয়টি পরিবর্তন করে লাঠি টেবিলের উপর রেখে দেয় এবং আমার দিকে নম্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে-

‘শুনেছি, তুমি নাকি অনেক কিতাব লিখেছ?

আমি বললাম, হাঁ, কিছু লিখেছি।

— তাহলে তো তুমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছুই জান।’

আমি বললাম, আমি শিক্ষাই লাভ করেছি ইসলাম সম্পর্কে, তাই সে বিষয়ে জ্ঞান থাকাই তো স্বাভাবিক।

— তোমাদের ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে মতবিরোধ কিসে? সে প্রশ্ন ছুড়লো। আর তার চেহারায় শয়তানী হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সে জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের ও আহলে হাদীসের মধ্যে কি নিয়ে মতবিরোধ, তাও বল।

তার বলার ভঙ্গিতে মারাত্মক বিদ্রুপ মেশান ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, যেন কেউ আমাকে ভোতা ছুরি দিয়ে জবাই করছে। আমার মনমগজে তখন

ঝড় বইতে শুরু করে। আমার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত ছিল, যাকে বেঁধে ফেলে তার সম্মুখে তার অতীব শ্রদ্ধেয় কোন গুরুজনের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। আমার ভিতর থেকে কেউ ডেকে উঠল, ওঠো! এই মুশরিকটাকে এমন এক ঘুষি লাগাও.... একেবারে মিসরের কিবতীর মত..... যাতে দ্বিতীয় ঘুষির প্রয়োজন না হয়।

কালো আত্মাধারী, গোচোনা পানকারী, প্রত্যেক পাথরের সামনে মাথা নতকারী, লিঙ্গ পূজারী, কদর্যতার স্তুপ এই মুশরিকের আমাদের মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর, ইসলামের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করার অধিকার কে দিল? এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার অন্তরে চিন্তা ও উত্তেজনার এক অবিরাম ঝড় বইতে থাকে। কিন্তু আমি ছিলাম অসহায়। দগ্ধ হওয়া ও ছটফট করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না। মুশরিক আমার ব্যথিত শিরায় হাত রেখে মুচকি হাসছিল। আমার নিজের উপরই বিস্ময় জাগছিল যে, সামান্য এই কথা আমার অন্তরে কেন এমন আঘাত করল। এসব মতবিরোধ তো মুসলমানদের দৈনন্দিন কর্ম, আকর্ষণীয় ও প্রিয় আমল। কিন্তু আমার জায়গায় অন্য কোন মুসলমান হলে হয়তো তার মনেরও এই একই অবস্থা হত। যেমনটি হয়েছে আমার। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মুশরিকটি আমাকে শুধু বিদ্রুপ করেছে। আমাদের বড় একটি

দুর্বলতা, তাদের অস্তিত্বের যামানত, তা সে প্রকাশ করেছে। সে কিছু জানতে চায় না বরং সে আমাকে দুর্বল করতে চায়। সে আমাকে নিরীক্ষণ করে দেখছে। আমার মুখ দিয়ে সে এমন কিছু বলতে চাচ্ছে, যা সে মুজাহিদদের মতবিরোধের আগুনের উপর পেট্রোলরূপে ব্যবহার করবে। আমি এসব চিন্তার মাঝে হারিয়ে যাই। আমার মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত অসন্তোষের লক্ষণ সেও দেখছিল, আর উপভোগ করছিল।

বলছ না কেন? জলদি করে বল। তোমাদের আর জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে মতবিরোধ কি নিয়ে?

সে গর্জে উঠল। আমি মাথা উঠিয়ে ঘৃণাভরে তার দিকে তাকালাম এবং পরিণতির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সাহস করে বললাম, কোন মতবিরোধ নেই।

-তুমি মিথ্যা বলছো, সত্য সত্য বল। নইলে কিন্তু...সে গর্জে উঠল।

আমি বললাম, তাদের রাজনৈতিক পার্টির নাম জামায়াতে ইসলামী আর আলেমদের রাজনৈতিক পার্টির নাম জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। তাদের আমীর কাযী হুসাইন আহমাদ আর জমিয়তের আমীর মাওলানা আবদুল্লাহ দরখাস্তী ও মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব। সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, এসব তো আমিও জানি।
আমাকে বলো, মাওলানা মওদুদী ও উলামায়ে

দেওবন্দের মধ্যে কি নিয়ে মতবিরোধ? আমি বুঝে ফেললাম, খবীস অনেক কিছুই জানে।
আমি ক্রোধ ভরে বললাম, আমার জানা নেই।

-তুমি সবই জানো। কিন্তু তুমি এমনি তা বলবে না, তোমাকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি। আমি জানি, তুমি বড় একজন আলেম।

আমি বললাম, আমি শুধু এতটুকু জানি যে, মওদুদী সাহেব রাজনীতির উপর বেশি জোর দিতেন, আর অন্যান্য আলেমগণ কিছুটা কম জোর দিতেন। আর এ নিয়েই মতবিরোধ শুরু হয়। আর মতবিরোধ হলে তা বাড়তেই থাকে।

সে বলল, আহলে হাদীসদের সাথে কি নিয়ে বিরোধ?

আমি বললাম, মুসলমানদের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ, যেগুলো ছাড়া কোন মানুষ মুসলমান হতে পারে না, সেগুলোতে কোনই মতবিরোধ নেই। প্রাক্টিক্যাল নিয়ে সামান্য মতবিরোধ আছে। আমরা একটু নিচে হাত বাঁধি, ওরা একটু উপরে। উভয়ে একই খোদার ইবাদত করি, হাজারটির নয়।

আমার আঘাত কার্যকরী হল। এরপর সে বিষয়বস্তুই পাল্টে ফেলল। কিন্তু আমি তখনও উপরোক্ত বিষয়ের আগুনে দগ্ধ হচ্ছিলাম। সে আমার অন্তরে এক অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে চলে যায়। আমি আমার মুখমণ্ডলে বিষাদের ঘনঘটা আর অন্তরে মণ-কে- মণ বোঝা নিয়ে যখন আমার সেলে ফিরে আসি।

তখন সাথীরা বুঝতে পারে যে, আজ আমার উপর অতি ভয়ানক অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু তারা বিস্মিত ছিল যে, চিৎকারের আওয়াজ এলো না কেন। সবাই যখন জিজ্ঞাসা করল, তখন আমি কেঁদে ফেললাম। বললাম, হতভাগা মুসলমানদের নিয়ে প্রশ্ন উঠিয়েছে। যে কারণে আমার অন্তর ব্যথিত হয়েছে। এই মুশরিকরা আটশ' বছর মুসলমানদের গোলাম ছিল। তাদের জুতা পরিষ্কার করে বেঁচে থাকত। আর আজ তাদের ইসলামকে নিয়ে কথা বলার মত সাহস হয়েছে।

রাতে যখন আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি, নিদ্রা ছিল তখন আমার নাগাল থেকে অনেক দূরে। আমি ভাবছিলাম, হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)এর সঙ্গে মাল্টার জেলে সম্ভবত এমনই কোন ঘটনা ঘটেছিল। যার ফলে শাইখ জেল থেকে বের হয়ে মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র দুটি জিনিসের দাওয়াত দিয়েছেন। একটি হল—কুরআনকে মজবুত করে ধরো, পড়, বোঝ ও তা নিয়ে ভাবো। আর অপরটি হলো—পরস্পর এক ও ঐক্যমত থাক।

আমি কল্পলোকে হযরত শাইখুল হিন্দ এর পদযুগল চুম্বন করলাম। তার হস্ত চুম্বন করলাম। আমার মনে হচ্ছিল, যেন তিনি আমার আহত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিচ্ছেন। আর আমাকে বলছেন, তোমার পেরেশান হওয়া যথার্থ। তোমরা তো মুসলমানদের জানমাল বাঁচানোর জন্য লড়ছো আর জান দিচ্ছো শুধুমাত্র এইজন্য যে, তাদের সাথে তোমাদের ইসলামের রিশতা রয়েছে, তোমরা সবকিছু যেন

ইসলামের জন্যই করছো। এ অবস্থায় যখন কেউ ইসলামের উপর তোমাদের সম্মুখে অঙ্গুলী নির্দেশ করছে, আর তোমরা সেই অঙ্গুলী কর্তন করতে পারছ না। মুশরিক ইসলামকে নিয়ে কটুক্তি করছে, কিন্তু তোমরা তার রসনা মুখ থেকে ছিড়ে নিতে পারছ না। তাই তোমার অন্তরে চোট লেগেছে। এসো আমি তোমার ব্যথিত হৃদয়ে মলম লাগিয়ে দিচ্ছি। বাস্তবিকই তুমি ঠিক বুঝেছ। মুশরিকটি তোমাদের মুখে চপেটাঘাত করছিল। সে বলছিল, তোমরা মুসলমানরা এখন শতধাবিভক্ত। এখন তোমরা আমাদেরকে কিছুই করতে পারবে না, কিন্তু আমরা তোমাদের সবকিছুই করতে পারব। তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করে মরবে এবং আমাদের হাতেও মারা পড়বে। তোমাকে হয়ত এই চিন্তাও কষ্ট দিচ্ছে যে, দু'সপ্তাহ পূর্বে একজন মুশরিক তোমাকে বলেছিল, এই চিন্তা ছেড়ে দাও যে, কোন গজনবীর উদ্ভব হবে, আর সোমনাথ পর্যন্ত চলে আসবে। কিন্তু তুমি পেরেশান হইও না। তাদের সব কথারই উত্তর আছে।

বাস্তবিকই যদি ইসলাম বর্তমানে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে থাকে, মুসলমান যদি একেবারেই একে অপরের আপন না থেকে থাকে তাহলে তোমাদের মত পাকিস্তানীরা নিজেদের শান্তিপূর্ণ জীবন পরিত্যাগ করে কেন কাশ্মীরে আসছো? হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)অন্তরে প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন। আর

মনে হল, যেন তিনি সবুজ উদ্যানসমূহ এবং মতির মহলসমূহের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এরপর হঠাৎই আমার ক্রোধের উদ্রেক হতে থাকে। আমার অন্তর গোস্বায় ভরে যায়। কেন? মওদুদী সাহেবের কি প্রয়োজন হয়েছিল মতবিরোধের বীজ বপণ করার? ভালভাবে দ্বীনের খেদমত করছিলেন, পাশ্চাত্যকে চ্যালেঞ্জ করছিলেন, তারপর মানুষের ‘বাহ বাহ’ অকস্মাৎ তাকে লাইনচ্যুত করে দেয়। তারপর সে এমন সব কথা লিখতে ও বলতে থাকে, যার দ্বারা কোন মুসলমানের উপকার তো হয়নি, বরং উম্মতের মধ্যে ভিন্ন চিন্তা ও চেতনার একটি নতুন ধারা অস্তিত্ব লাভ করেছে। হায়! সে যদি আলেমদের সাথে মতবিনিময় করত কিংবা তার পরবর্তী উত্তরাধিকাররা মতবিনিময়ের জন্য তাদেরকে আহবান জানাত। আপত্তিকর বিষয়গুলো তার কিতাব থেকে বাদ দিত। উম্মতের কাছে মাফ চেয়ে নিত। তার কিতাবগুলো তো আর আসমানী ওহী না যে সেগুলোর হিফাযত করা তার সৈনিকদের জিম্মায় জরুরী। হায়! নব্য কলামিষ্টরা যদি কিছুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করত! যেসব বিষয় তাদের আয়ত্বের বাইরে সেগুলোতে যদি তারা মুখ না দিত! হায়! পৃথক পৃথক হয়ে কাজ করার এ কেমন প্রবণতা! এমন প্রবণতা থেকে ফিরে আসুন। তাদের এই প্রবণতা উম্মতকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে ছেড়েছে। উম্মতকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়েছে।

কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! এমন অনেক লোক, যারা কলম ধরতে জানে, তারা নতুন পথ তালাশ করে। নতুন নতুন অধ্যায়নের আলোকে নতুনভাবে গবেষণা করে উম্মতের কিস্তীতে আরো একটি ছিদ্র সংযোজন করে। সারাজীবন ইংরেজের জুতা পরিষ্কার করে বৃদ্ধ বয়সে কুরআনের তাফসীর লিখতে বসে। ইসলামকে সবাই এক মৃত দেহ মনে করেছে। সবাই তাকে টার্গেট বানিয়েছে। তার একেকটি অঙ্গকে অপারেশনের পর অপারেশন করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের সেই শক্তি নাই, যা দ্বারা মুসলমানদেরকে একত্র রাখতে পারে। অন্তরে পরমতসহিষ্ণুতা নেই। সব দলেই মতবিরোধ প্রিয় লোকদের প্রতিপত্তি। বড় বড় লোকেরা দু’ একটি বিষয়ে মতবিরোধের কারণে উম্মত থেকে পৃথক হয়ে যায়। এমন যদি হত যে, পরস্পরের যেসব বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব, পরস্পরে তার সমাধান করত, আর শত্রুরা তার বাতাসও না পেত, তাহলে চিত্র আজ অন্যরকম হত। কিন্তু প্রত্যেকে শুধুমাত্র নিজেকে হকের উপর মনে করে। আর বাকী সকলকে দোযখের শেষ প্রান্তে নিক্ষেপ করে। যারই পেট মোচড় দিয়ে ওঠে, সেই কোন নতুন গবেষণার জঞ্জাল তুলে ধরে পরিবেশ নষ্ট করে। পরে বাধ্য হয়ে হকপন্থী আলেমদেরকে তার প্রতিবাদ করতে হয়। বস্তুত মুসলমানদের থেকে খেলাফত ছিনিয়ে নিয়ে সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর বাচ্চারা যেভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, খেলাফত বিলুপ্তির পর আমরাও

বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছি এবং হতে চলেছি। মুরগীর ডানার নীচে সব রংয়ের বাচ্চা আশ্রয় নেয়। আমরাও সর্বশ্রেণীর মানুষ খেলাফতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতাম।

খেলাফতের শক্তিতে অনেক ফিতনাই প্রতিহত হত। কিন্তু সে শক্তি এখন এক অতীত কাহিনী। এখন গণতন্ত্র চলছে। যা পিতা থেকে পুত্রকে পৃথক করে দেয়। ভাইকে ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত করে। পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মোহ সৃষ্টি করে। মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। উত্তরাধিকারী ও ছোট লোকদেরকে শাসকে পরিণত করে। অশ্লীলতা ও নোংরামীকে আইনী নিরাপত্তা দান করে।

আমার মালিক! শক্রর হাতে নির্যাতিত তোমার দ্বীনের মর্যাদা বক্ষে ধারণকারী তোমার এক দুর্বল অসহায় বান্দা তোমার কাছে সবিনয় প্রার্থনা করছে যে, মুসলিম উম্মাহকে খেলাফতে রাশেদা ফিরিয়ে দাও। যেন কোন মুশরিক কোন মুসলমানকে তিরস্কার করতে না পারে। কোন ক্রুশপূজারী আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে খেলতে না পারে। তোমার বান্দাদের দাড়ি নখ দিয়ে আঁচড়ে ছিড়ে ফেলতে না পারে। ইসলামকে লাওয়ারিশ মনে করে মুসলমানদের সাথে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ না করে।

আমার প্রতিপালক! এখন তো মুজাহিদদের কাফেলা জিহাদের পথে নেমে পড়েছে। শহীদদের শোনিত ধারায় পাহাড়, প্রান্তর ও পাথুরে

ভূমি রঞ্জিত হচ্ছে। তোমার দুর্বল বান্দা কারাগারে বন্দী অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে আছে। উম্মত খেলাফতের পথে অর্থাৎ জিহাদের জন্য যেনতেনভাবে চলতে শুরু করেছে, এখন শুধু তোমার রহমত দরকার, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন।

টর্চারিং সেন্টারে হজ্জের বয়ান বাদামীবাগের টর্চারিং সেন্টারে উল্লেখযোগ্য আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে, তার কয়েকটি পাঠকের খেদমতে তুলে ধরছি।

রোদ উপভোগ ও ‘লা-শারীকা লাকা’ এর ব্যাখ্যা দান ইণ্ডিয়ান আমীর একজন লেঃ কর্নেল এই টর্চারিং সেন্টারের সিকিউরিটি ইনচার্জ ছিল। তার পুরা নাম আমাদের জানা ছিল না। সে তার নাম সংক্ষেপে কর্নেল ডাগর বলত। কিন্তু আমাদের সাথীরা তাকে কর্নেল ডাংগর বলত। বেঁটে, শীর্ণদেহী ও শ্যামলা রংয়ের প্রতিপত্তিহীন ব্যক্তি। সে ছিল বানিয়ে কথা বলার উস্তাদ। সে তার পাতলা কোমর ও সুশৃংখল স্বভাবের জন্য গর্ব করত। সাধারণ অবস্থাতেও সৈনিকের ভঙ্গিতে চলাফেরা করত। বেশির ভাগ সময় উর্দী পরে আর কখনো কখনো সাদা কাপড় পরে আসত। আমাদের সেলের সম্মুখে এসে আমাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করা, দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলা এবং তার ঘটনাবলী

শোনানো তার প্রিয় কাজ ছিল। তাকে সহজাত ভীরু ও সুবিধাবাদী মনে হত। সে তার অন্তরের বিদ্বেষ আড়াল করতে দক্ষ ছিল। তার সাথে মুজাহিদদের দু’ একবার ঝগড়াও হয়েছে, কিন্তু সে তা হজম করে নিয়েছে। মগজ ধোলাইয়ে সে পাকা ছিল। কাশ্মীরী মুজাহিদদের উপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা করত। কিন্তু তাকে বারজন মেহমান মুজাহিদের সামনে ব্যর্থতা স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ সে মেনে নিয়েছে যে, এই পাগলদের মত পরিবর্তন করানো তার ক্ষমতার বাইরে। সে ইসলামের অনেক বিষয়ই স্বীকার করত। সে বলেছে যে, একবার সে একমাস রোযা রাখে, ফলে দৈহিক অনেক উপকার লাভ করেছে। কখনো কখনো নামাযও পড়ত। তার কথায় নামায উৎকৃষ্টমানের একটি ব্যায়াম।

একবার সে আমাদেরকে নামায পড়িয়েও দেখিয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের তুলনায় সে উত্তমভাবে রুকু সেজদা করছিল। তার এসব কর্মকাণ্ড দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, হিন্দুরা বাস্তবিকই বড় জটিল কাফের। তাদের প্রতারণা থেকে বাঁচা বড় দুরূহ ব্যাপার। কারণ, হিন্দুরা নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা সবকিছুই করতে পারে। সকলের সম্মুখেই তারা মাথানত করে। মুসলমানদের সাথে তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ পাকাপোক্ত, কিন্তু স্বার্থের খাতিরে তারা

মুসলমানদের সামনেও মাথা নত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কর্নেল ডাগর আমাদেরকে সেকুলার হওয়ার লম্বা চওড়া দাওয়াত দিত। আমরাও তাকে মুসলমান হওয়ার পরিপূর্ণ দাওয়াত দিতাম। একদিন সে নিরুত্তর হয়ে বলে—আচ্ছা বল দেখি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস কি কি?

আমি এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তবে সহজবোধ্য একটি ভাষণ দিলাম। পরদিন সে একটু আগে আগেই চলে আসে এবং বলে যে, মুবারক হোক, আমি মুসলমান হয়েছি। বিশ্বাস করার মত না হলেও তার এই কথা শুনে আমরা সবাই খুশী হয়ে তাকে মুবারকবাদ দিতে থাকি। সে বলে—আমি বাড়ী গিয়ে এ নিয়ে খুব ভেবেছি। আপনার দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছি। তখন আমার মন বলল—ইসলাম গ্রহণ করলে ক্ষতি কি? আমরা তো আগে থেকেই অনেক ভগবানকে মানি। আরো দু'জন ভগবানকে মেনে নিলে অসুবিধা কি। সুতরাং আমি আল্লাহ ও মুহাম্মাদকেও আজ থেকে মানতে শুরু করেছি। মুবারক হোক, আমি মুসলমান হয়েছি। তার এই কথা শুনে আমাদের আনন্দ উবে গেল। আমরা অনেক পরিশ্রম করে পূনরায় তাকে ‘ভি’ (ও) ও ‘হি’ (ই) এর তফাৎ বুঝাতে থাকি, কিন্তু সে তার জিদের উপর অবিচল থাকে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামের কালেমার সূচনা ‘লা’ এর তরবারী দ্বারা কেন করা হয়েছে। যতক্ষণ ‘শিরক’এর নোংরামী ও কদর্যতা পরিষ্কার না হবে, ততক্ষণ তার উপর

সুগন্ধী ছিটানোর কি লাভ হতে পারে। যতক্ষণ গাইরুল্লাহর কদর্যতা অন্তর থেকে বের না হবে, ততক্ষণ আল্লাহকে স্বীকার করা অস্বীকার করা থেকেও মারাত্মক। এ কারণে ‘মুশরিক’ কাফেরের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট। কারণ, কাফের আল্লাহকে অস্বীকার করে, আর মুশরিক আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে আল্লাহকে হেয় করে। হেয় প্রতিপন্ন করা অস্বীকার করার চেয়েও মারাত্মক গুনাহ।

সাত মাস পর্যন্ত কর্নেল ডাগরের সাথে আমাদের বিতর্ক চলতে থাকে। সেও আমাদেরকে বদলাতে পারেনি, আমরাও তাকে বদলাতে পারিনি। সে ভারতপ্রেমী ছিল, তার জিদ আমাদেরকে পাকিস্তানের প্রত্যেক জিনিসের প্রেমিক বানায়। এমনকি একবার সে আমাদেরকে একটি পুরাতন খবরের কাগজ এনে দেয়। তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর ছবি ছিল। সে একটি কথা নিয়ে বিদ্রুপ করলে আমরা বলি, জনাব ভাল করে ছবির দিকে লক্ষ্য করুন, একদিকে এক সম্রাজ্ঞীকে দেখা যাচ্ছে, আর অপরদিকে এক মেথরকে। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছবি দেখে একেবারে লজ্জিত হয়ে যায় এবং বিষয় পাল্টিয়ে কথা বলতে শুরু করে। অথচ আমরা ছবিরও পক্ষপাতি না এবং বেনজীরেরও না। কিন্তু মুশরিকের জিদ বিষয়টিকে গোড়ামীর পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। তাছাড়া বিষয়টি

সুবিচারের জন্যও ছিল না, মনোবৃত্তির লড়াই ছিল মাত্র। সে সব দিক থেকে আমাদের সাহস ভাংতে চাচ্ছিল, আর আমরা সর্বতোভাবে তাকে একথা বিশ্বাস করাতে চাচ্ছিলাম যে, কারাগারে এসেও আমরা আলহামদুলিল্লাহ জীবিত আছি।

সেই টর্চারিং সেন্টারে পত্রপত্রিকা, রেডিও প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল। কর্নেল ডাগর আমাদেরকে প্রায়শই নৈরাশ্যপূর্ণ সংবাদ শোনাত। যেন সংকীর্ণ ও অন্ধকার পরিবেশের সাথে সাথে ভয়ংকর এসব সংবাদ আমাদের অন্তরস্থ উৎসাহ ও উদ্যমকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। কিন্তু নির্বোধ একথা বুঝত না যে, এই টর্চারিং সেন্টারেই দেড় শতাধিক কাশ্মীরী মুজাহিদ রয়েছে। আমাদের কাশ্মীরী মুজাহিদদের সঙ্গে সপ্তাহে একবার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের মাধ্যমে একদিকে যেমন আমাদের নিকট কাশ্মীরের আপেল ও অন্যান্য উপঢৌকন আসত, অপরদিকে বাইরের তাজা আশাব্যঞ্জক ও সাহসবর্ধক সংবাদসমূহও পৌছত। আমাদের ও কাশ্মীরী মুজাহিদদের মধ্যে বাহ্যত সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। কিন্তু ইণ্ডিয়ার দূর্নীতিবাজ সৈন্য থাকতে কোন কাজই অসম্ভব নয়। অন্য কথা তো বাদই থাক, বন্দী হওয়ার কিছুদিন পর থেকে রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুজাহিদদের পত্র পর্যন্ত আমাদের নিকট পৌছতে আরম্ভ করে। এমতাবস্থায়

কর্নেল ডাগরের বক্তৃতা ছিল আমাদের নিকট অর্থহীন।

সে আমাদেরকে কয়েকটি দুঃসংবাদ শোনাত। আর আমরা প্রতি শনিবারে অসংখ্য সুসংবাদ শুনতে পেতাম। কর্নেল ডাগরকে বাহ্যিকভাবে আমাদের মুক্তির প্রত্যাশী-দেখা যেত। সে বলত—আমি চাই আপনারা খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেয়ে সগৃহে চলে যান। তার এই কথা মুজাহিদদের অন্তরে তার ব্যাপারে সমবেদনা সৃষ্টি করত। কারণ, বন্দী অবস্থায় যে ব্যক্তিই মুক্তির কথা বলে, তাকেই বন্দীর প্রিয় মনে হয়। মনস্তাত্ত্বিক এই অস্ত্র উকিলেরা খুব বেশি ব্যবহার করে থাকে। ফাঁসির দড়ি পর্যন্ত পৌঁছা প্রত্যেক আসামীকে তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করায় যে, এই তো কয়েক মিনিটের মধ্যে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। আমি তিহার কারাগারে মিনিটের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় বিশ বছর ধরে অপেক্ষমান লোককে দেখেছি।

কর্নেল ডাগর সরকারের পলিসীর ওজর দেখিয়ে আমাদের আযাদীর প্রত্যাশা করত। এভাবে সে অনেক বন্দীরই মন জয় করত। কিন্তু অকস্মাৎ মুজাহিদরা কয়েকজন বিদেশী পর্যটককে অপহরণ করে কয়েকজন বন্দীর মুক্তি দাবী করে। সেদিন কর্নেল ডাগর সীমাহীন বিষাদগ্রস্ত ছিল এবং চেষ্টা করা সত্ত্বেও অন্তরের বিষাদ লুকাতে পারছিল না। সেদিন আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের মুক্তির জন্য

চিন্তান্বিত এই মুশরিক কর্নেল তার অন্তরে আমাদের ব্যাপারে কি পরিমাণ বিদ্বেষ রাখে। কর্নেলের সে দিনটি অত্যন্ত বিষাদময় কাটে। কিন্তু যখন বৃটিশ নাগরিকদ্বয় কোন বিনিময় ছাড়াই মুক্তি লাভ করে এবং আমাদের আযাদীর ভয় কেটে যায়। তখন কর্নেলের ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে। সে পূর্বের মত পূনরায় আমাদের সেলে এসে কিচির মিচির করতে থাকে।

কর্নেল ডাগর মুসলমান বুযুর্গদের মাযারে যাওয়ার জোরালো প্রবক্তা ছিল। সে ছুটির সময় স্বগৃহে (হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য) যাওয়ার পূর্বে বলত, আমরা আপনাদের অন্য কোন সেবা তো করতে পারব না, তবে আপনাদের পক্ষ থেকে কোন মাযারে এক-আধটি মোমবাতি জ্বালাতে পারি, বা দুই এক টাকার প্রসাদ দিতে পারি।

আমরা সেসব কথায় চুপ থাকতাম। আমাদের নীরবতা দেখে সে চরম বিস্মিত হত। সে মনে করত যে, এরা মাযারে প্রসাদ দেওয়ার কথা শুনলে খুবই আনন্দিত হবে। কিন্তু আমাদের মুখমণ্ডলে আনন্দের লক্ষণ দেখতে না পেয়ে সে অস্থির হয়ে যেত। সে বলত, অতীতে তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ মাযারে প্রসাদ দেওয়ায় পুরা হয়েছে। এখনও সে তার অনেক প্রয়োজন মাযারে পেশ করে সেগুলো পুরা হওয়ার অপেক্ষায় আছে। সে মুজাহিদদেরকে

সিংহভাগ সময় নামায ও তেলাওয়াতে লিপ্ত দেখে কখনো কখনো তাদের ভক্ত হয়ে যেত।

একবার সে মুজাহিদদেরকে দুধ,সেমাই খাওয়ায়। তার এই দাক্ষিণ্য দেখে সকল মুজাহিদ হতবাক হয়। কারণ, টর্চারিং সেন্টারে পানাহারের বড় দুরাবস্থা ছিল। দুধ-সেমাই খাওয়ানোর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে যে, আমি মান্নত করেছিলাম যে, আমার অমুক কাজ হলে আমি তাদেরকে (বারজন মেহমান মুজাহিদ) এই খাবার খাওয়াব। আমার সেই প্রয়োজন পুরা হয়েছে তাই আমি আপনাদেরকে এই মিষ্টি খাওয়াই। তার কথা শুনে সকল মুজাহিদ বমি করতে আরম্ভ করে। কারণ, আমাদের জানা ছিল না যে, সে কার নামে মান্নত করেছিল। এই খাবার হালাল না হারাম, অথচ আমাদের জন্য অপারগতা, অক্ষমতা ও অজ্ঞতা প্রভৃতি ওজর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এর হালাল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে পরস্পর তর্ক ও আলোচনা চলতে থাকে। মূলত মুজাহিদরা স্বীয় আখেরাতকে সজ্জিত করার জন্য এসেছিল। তারা কারাগারের শিকের মধ্যের কয়েক মুঠো গ্রাস দ্বারা নিজের আখেরাতকে বরবাদ করার পক্ষপাতি ছিল না।

কর্নেল ডাগর অনেক সময় তার উদারতা দেখানোর জন্য মুজাহিদদেরকে জিজ্ঞাসা করত যে, আপনাদের কোন সমস্যা বা অভিযোগ নেই তো? মুজাহিদদের জানা ছিল যে, তার এই প্রশ্ন হয় গতানুগতিক অথবা নতুন কোন বিপদের

পূর্বাভাস। তাই তারা নীরব থাকত। একবার সে খুব পীড়াপীড়ি করে জিজ্ঞাসা করায় কোন কোন সাথী বলেন যে, এই সেলে আমাদের কয়েক মাস কেটে গেছে, প্রচণ্ড শীতের মৌসুম, আমরা এখনো সূর্য দেখতে পাইনি, তার উষ্ণতা উপভোগ করতে পারিনি। যদি আমাদেরকে কয়েক মিনিটের জন্য রোদে বের করা হয়, তাহলে শীতের প্রকোপে আমাদের দুর্বল হওয়া দেহ কিছুটা আরাম লাভ করবে। কর্নেল ডাগরের কাছে সাথীদের এই ফরমায়েশ করা ঠিক হয়নি। কারণ, এগুলো চাইতে হবে আল্লাহর নিকট। কোন মুশরিকের নিকট নয়। কিন্তু সাথীরা সংকীর্ণ ও অন্ধকার সেল ও শীত মৌসুমের কারণে সীমাহীন কষ্টে ছিল। তাদের কিছু কিছু অঙ্গ ঠিকভাবে কাজ করছিল না। অনেকের চক্ষু অন্ধকারে থাকার কারণে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু প্রতিদিনের অবর্ণনীয় অত্যাচার ক্ষতস্থানে লবণ দেওয়ার কাজ করছিল। ওদিকে কর্নেল ডাগর প্রত্যহ বুক ফুলিয়ে ফরমায়েশ জিজ্ঞাসা করত। তাই কিছু সাথী এই ফরমায়েশ করে।

কর্নেল ডাগর চিন্তায় পড়ে যায়। সে নীরবে ফিরে চলে যায়। পরদিন এসে বলে, আপনাদের ডিমাণ্ড নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। এক মাসের অধিক কাল পর্যন্ত এই ভাবনা চলতে থাকে। এরই মধ্যে ঈদুল আযহার দিন চলে আসে। কর্নেল ডাগর সেদিন আমাদেরকে প্রথমবার বাইরে বের করার নির্দেশ দেয়।

ইণ্ডিয়ান আর্মীরা আমাদের মুখের উপর জামা দিয়ে রুকু অবস্থায় চালিয়ে নিয়ে সেলের বাইরে বের করে লোহার শিকের বেড়ার পাশে নিয়ে যায়। মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে আমাদেরকে মাটিতে বসানো হয়। চতুর্দিকে কড়া পাহারা রাখা হয়। ইণ্ডিয়ান সৈন্যদেরকে অস্ত্রহাতেও অত্যন্ত আতংকিত দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল ডাগরের কথায়—সে আমাদের জন্য বিরাট রিস্ক নিয়েছে। অথচ আমরা গারদের প্রাচীর এবং বেড়ার ভিতরই ছিলাম। চতুর্দিকে সেনা ছাউনী ও সশস্ত্র পাহারা ছিল। এতসব সত্ত্বেও কর্নেল ডাগরসহ সকল সৈন্যের মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট ভয়ের নিদর্শন দেখা যাচ্ছিল।

সেদিন খুব চমৎকার রোদ উঠেছিল। আমাদের শরীর এতদিন পর রোদের তাপ পেয়ে অপূর্ব স্বাদ অনুভব করছিল। এক ধরনের আনন্দ অনুভূতি তড়িতের ন্যায় দেহের সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছিল। দেহ আনন্দিত ছিল, কিন্তু চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। আমরা সকলে আমাদের আশেপাশের সৈন্যদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এক মহান নি'আমতের পুলক উপভোগ করছিলাম। শ্রীনগরে তীব্র শীত পড়ে। কয়েক দিন পর্যন্ত অবিরাম তুষারপাত হতে থাকে। কাশ্মীরী লোকেরা হাড্ডীর মধ্যস্থ মজ্জা জমাটকারী তীব্র এই শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্নভাবে যত্ন নিয়ে থাকে। আংটা, কাংড়ী, লবন চা, ফার্ন, মোটা

গদী, ভীষণ ভারী লেপ, পশমীর দেরাজ, গরম টুপি, পশুর পশমী চামড়া, আরো অনেক কিছু। তারপরেও তারা শীতে উহু উহু... করে।

অনেক সময় গরম এলাকায় বসবাস শুরু করে। আমরা কয়েক মাস ধরে শীতল শ্রীনগরে অবস্থান করছি। উপরোক্ত ব্যবস্থাপনার কিছুই আমাদের নিকট ছিল না। ঠাণ্ডা বিছানা আর দুর্গন্ধময় কালো কম্বল শীত থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই আজকের এই রোদ বড় ভাল লাগছিল। রোদ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে, আল্লাহ তাআলার এই অমূল্য নিআমতের তোমরা কখনো শুকরিয়া আদায় করোনি। এখন কিছুদিনের জন্য এই নিআমত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাই এবার বুঝতে পারছ যে, এর মূল্য কত বেশি। সূর্য পরম মুক্তভাবে হেসে হেসে তার কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সূর্য এক আল্লাহর প্রকৃত দাস হয়েছে, ফলে সকলের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

সে আমাদেরকে গোলামী থেকে আযাদী লাভের পথ বলে দিচ্ছিল। অর্থাৎ সে শিক্ষা দিচ্ছিল যে, এক আল্লাহর সত্যিকার আনুগত্য ও গোলামীর মধ্যে মুসলমানদের আযাদীর পয়গাম রয়েছে। আমরা সকলে নীরবে সূর্যের কিরণের মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। হঠাৎ কর্নেল ডাগর আমাকে বলে—মাওলানা! আজ আপনাদের ঈদের দিন। শুনেছি মুসলমানরা এই সময় হজ্জ করতে যায়। আপনি এ বিষয়ে

বক্তৃতা করুন। আমি তার কথামত দাঁড়িয়ে তাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বয়ান শুরু করি। ঈদ , হজ্জ ও বাইতুল্লাহর আলোচনা শুরু হলে আমাদের সকলের চোখে অশ্রু চিক চিক করতে থাকে। আমি বয়ানের মধ্যে বলি যে, হাজী সাহেবগণ প্রেমিকের মত ফকিরের বেশ ধরে সাজসজ্জা পরিত্যাগ করে স্বীয় রবের দিকে পাগলপারা হয়ে দৌড়াতে থাকে। তার গৃহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। হজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা প্রতি মুহূর্তে এই 'তালবিয়া ' পাঠ করে-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْـكَ لاَ شَـرِيكَ لَـكَ لَبَّيْـكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

তারপর আমি সবিস্তারে তালবিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করি। বিশেষ করে 'লা শরীকা লাকা ' শব্দের ব্যাখ্যা খুব ভালভাবে তুলে ধরি। প্রভুভক্তি কখনোই শিরক সহ্য করে না। কোন ব্যক্তিই স্বীয় স্ত্রীর অংশীদারীত্ব সহ্য করে না। কিন্তু আফসোস ! আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অংশীদার খাড়া করা হয়। আমি জোরালোভাবে শিরককে বাতিল প্রমাণ করছিলাম। কুরআন হাদীস ও যুক্তির নিরীখে এর ক্ষতির দিকসমূহ বর্ণনা করছিলাম। আর মুশরিক কর্নেল ডাগর খুব মনোযোগ সহকারে ও অভিভূত হয়ে তা শ্রবণ করছিল। আমি জীবনে বহু বক্তৃতা করেছি , কিন্তু এই বয়ানের ভাবাবেগই ছিল আলাদা। মুশরিকদের

কারাগারেই শুধু নয় বরং তাদের টর্চারিং সেন্টারে বসে মুশরিকদের সশস্ত্র পাহারায় মুশরিক অফিসার বর্তমান থাকতে তাওহীদের সপক্ষে শিরকের বিপক্ষে বয়ান। আমি লক্ষ্য করেছি যে, কর্নেল ডাগরের চক্ষুও সিক্ত হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার কথা তার অন্তরে দাগ কাটছে। আমি বয়ান শেষ করে সাথীদের সাথে বসে পড়ি। সাথীদের চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত ছিল। কর্নেল ডাগর বলে—আপনার মগজ ধোলাইয়ের বিরাট যোগ্যতা রয়েছে। আমরা আগামীতে আপনার দ্বারা বয়ান করাব।

আরো কয়েক মিনিট রোদে বসার পর আমাদেরকে পূর্বাবস্থায় পূনরায় সেই অন্ধকার সেলে বন্দী করে রাখা হয়।

ভারতীয় সৈন্যদের যথাযোগ্য নাম টর্চারিং সেন্টারে কর্মরত অফিসার ও সৈন্যরা সাধারণত তাদের নাম গোপন রাখত, ফলে মুজাহিদরা বাধ্য হয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের নাম রাখত। এসব নাম একদিকে খুব মনোমুগ্ধকর হত, অপরদিকে মুজাহিদদের অন্তরে কাফেরদের প্রতি যে তীব্র ঘৃণা বিরাজ করত, তাও তার মধ্য দিয়ে ঝরে পড়ত। আমি মুশরিক সৈন্যদের সেই মনোমুগ্ধকর নাম সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে দুটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজনীয় মনে করছি।

১, পবিত্র কুরআনে মুসলমানদেরকে পরস্পরের নাম বিকৃত করা ও পরস্পরের মন্দ নামকরণ করা থেকে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু কুফরের পূজারীদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনই..... (অতএব তাদের দৃষ্টান্ত কুকুরের দৃষ্টান্তের ন্যায়) এর মত শব্দ প্রয়োগ করেছে। এমনিভাবে মক্কার কুরায়েশ সরদারের নামও ইসলাম আবূ জেহেল নির্ধারণ করেছে।

২, মুজাহিদ সাথীরা কষ্টদায়ক পশু শ্রেণীর মুশরিক সৈনিকদের বড় মারাত্মক ও অকথ্য নাম রেখেছিল। আমি এই প্রবন্ধে সেসব নাম বাদ দিয়ে, শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য নামের আলোচনা করছি। তবে যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল সাথীকে মুক্তি দান করবেন, তখন তারা নিজেরাই এসে তাদের দোস্তদের সকল নাম বলে দিবে, ইনশাআল্লাহ। এবার নিন, ইণ্ডিয়ান আর্মীর কয়েকজন সৈন্যের নাম লক্ষ্য করুন।

রিক্সাঃ
সি.এম.পি (সেন্ট্রাল মিলিটারী পুলিশ)এর সদস্য, আসামের অধিবাসী একজন সৈনিক—সে তার নামের শুধুমাত্র শেষের অংশ ‘রায়’টুকু আমাদেরকে বলত। রিক্সার সাথে তার কয়েক দিক দিয়ে সাদৃশ্য ছিল। তাই মুজাহিদরা তাকে এ নামে ভূষিত করেছিল।

(১) সে তার কথায় ‘টে' অক্ষরটি অধিকহারে ব্যবহার করত। যা রিক্সার শব্দের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন সে বলত—মেরে মাটাপিটা মুঝে বোহুট ইয়াদ কটটে হেঁ। (আমার বাবা-মা আমার কথা খুব বেশি মনে করে)।

(২)—সে দ্রুত চলত, হাটত এবং রিক্সার মত হঠাৎ মোড় নিত।

(৩)—সে কয়েদীদের প্রয়োজনীয় সামানা খরিদ করে আনার দায়িত্বে ছিল। কিন্তু রিক্সার মিটারের মত তার রেট ছিল।

কোন কোন সাথীর মতে সে এই পরিমাণ লোভী যে, টাকা দিলে সে নামাযও পড়বে। মোটকথা, তার প্রত্যেকটি নড়াচড়া একমাত্র পয়সার জন্যই হত। তার মিটার সবসময় গতিশীল থাকত। তাছাড়া সত্য কথা এই যে, তাকে দেখতেও রিক্সার মতই লাগত।

সিংঘারাঃ

সে দীর্ঘ গোফধারী একজন সৈনিক ছিল। বাইরে খুব ভদ্র মনে হত। অন্যান্য ভারতীয়ের মত সে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করত। তার মোচ ও অবয়ব দেখে ‘সিংঘারা’ নামীয় সামুদ্রিক মাছের কথা মনে হত। প্রকৃত নাম জানা না থাকার কারণে সাথীরা নিজেদের মধ্যে এই নামেই তার আলোচনা করত।

বদআমলঃ

জম্মুর তালাব তালুর টর্চারিং সেন্টারে একজন হাবিলদার ছিল। বেঁটে , ঘনকৃষ্ণ রং , চোখ ও দাঁত উভয়টি সীমাহীন হলুদ। তার মুখ থেকে সবসময় মদের গন্ধ আসত। কালো রং অনেক সময় সাদা থেকেও অধিক সুন্দর ও নূরানী হয়। কিন্তু এই ব্যক্তির রং মৃতজীবের পঁচা চামড়ার মতই কদাকার ছিল। সে রাতে আমাদের হাতকড়া তালাবদ্ধ আছে কিনা তা দেখার জন্য আসত। সে আসতেই মদের দুর্গন্ধে কক্ষ ভরে যেত। সাথীরা তার নাম রেখেছিল বদ আমল। হাদীস শরীফে আছে-

মানুষের খারাপ আমল কবরে একজন মারাত্মক কদাকার ব্যক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

সাথীরা বলত —এ আমাদের বদআমলের রূপ। যা প্রতি রাতে আমাদের সাথে দেখা দেয়।
সাথীরা তার এই নাম আমরা যাওয়ার পূর্বে রেখেছিল। আমরা যাওয়ার পর তার দেখা পাই।
সাথীরা আমাদের নিকট তার নাম ও নামকরণের কারণ বলে। তা থেকে খুব শিক্ষা পাই।

وَاعْـفُ عَنَّا وَاغْفِـرْ لَنَـا وَارْحَمْنَـا أَنْتَ مَوْلَانَـا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ-

“তুমি আমাদেরকে মাফ কর , ক্ষমা কর এবং রহম কর। তুমিই আমাদের মনিব , অতএব তুমি কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।”

বিড়ি -সিগারেটঃ

এ দীর্ঘাকৃতির টেরা চক্ষুবিশিষ্ট একজন সৈনিক। সে যখনই ওয়ার্ডে ঢােকে, তার অতি কষ্টের সশব্দ ধমকের আওয়াজ সারা ওয়ার্ডে তার আগমনের খবর পৌঁছে দেয়। হিন্দুস্থানের সৈন্যদের মধ্যে হযরত লুত (আঃ)এর জাতির ন্যায় মজলিসের মধ্যে সশব্দে বায়ু ত্যাগ করার ঘৃণিত এই অভ্যাসটি খুব বেশি প্রচলিত। তবে এ ব্যাপারে এই সৈনিকটি ছিল সর্বসেরা। যদি আহার করার সময় সে এসে তার এই শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করত, তখন ঘৃণায় আমাদের গলায় গ্রাস আটকে যেত। রাতের বেলায় তার শব্দ খুব বেশি গুঞ্জরিত হত। কোন কোন সময় সে শক্তি প্রয়োগ করার জন্য মুখে আওয়াজ করত। বাস্তবিকই ভারতের এমন সৈনিকদের জন্য গর্বিত হওয়া দরকার। সে সাথীদের সাথে গল্পসল্পও করত। তাদেরকে খুব চিন্তান্বিতভাবে বলত—আমার বেতন থেকে প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা বিড়ি-সিগারেটের পিছে ব্যয় হয়। সে সিগারেটকে সবসময় শিগারেট বলত এবং কাশ্মীরী মুজাহিদদের মধ্যে উচ্চ শব্দে ঘোষণা করত—যারা বিড়ি- শিগারেট নিবে, তারা বাইরে চলে এসো। তার এই ঘোষণার কারণেই সম্ভবত আমাদের সাথীরা তার নাম রেখেছিল বিড়ি-শিগারেট।

সে বড় অদ্ভুত ঢংয়ে সেলের তালা খুলত। আমাদের সাথীরা তা নকল করে অপরাপর সাথীদের বিনোদনের ব্যবস্থা করত। একবার তার

বগলতলায় ফোঁড়া হয়। সে আমার কাছে এসে বলে, আমাকে দম করে (ফু দিয়ে) দাও। আমি এমনি এমনি ফুঁ দিয়ে বিদায় করে দেই। দ্বিতীয় দিন অধিক পীড়াপীড়ি করায় কিছু পড়ে ফুঁ দেই। আল্লাহ তাআলা সেদিন তার ভাগ্যে নিরাময় লিখেছিলেন। সে খুব খুশী হয় এবং এসে বলে, পরশু তুম নে ঐশেহি দম কিয়া থা। হাঁ কাল তুমনে আকল শে দম কিয়া। (পরশু দিন তুমি এমনি ফুঁ দিয়েছিলে, তবে কাল বুদ্ধির সাথে ফুঁ দিয়েছ)।

বাচুংড়া ও পাঠঠাঃ
সে ছিল একজন শিখ সৈনিক। টর্চারিং সেন্টারে এসে সে মুজাহিদদেরকে প্রচুর সহযোগিতা করত। অনেকগুলো স্পর্শকাতর মুহূর্তে সে কাজে আসে। তার নাম সবারই জানা ছিল, তবে পারস্পরিক আলোচনায় তার নাম নেওয়া হলে তার গ্রেফতার হওয়ার আশংকা ছিল বলে প্রথমে তার নাম বাচুংড়া (ছোট শিশু) নির্ধারণ করা হয়। পরে এই নাম পরিবর্তন করে পাঠঠা রাখা হয়।

চোর মুখান্নাসঃ (হিজড়া)
সে সি.এম.পি এর একজন নায়ক ছিল। দীর্ঘ দেহ, হালকা স্বাস্থ্য ও ভয়ংকর চেহারার অধিকারী। সে যখনই সেলে আসত তার চক্ষু বিস্ফারিত থাকত এবং চেহারায় সুস্পষ্ট ভীতি দৃষ্টিগোচর হত। সাথীরা বলত একে তো চোরের মত লাগছে। ফলে এ নামই তার জন্য

বরাদ্দ হয়। কিন্তু কিছু দিন পর যখন তার অধিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেল, তখন আমরা এটি দেখে বিস্মিত হই যে, কথাবার্তার সময় সে তার উভয় হাত প্রসারিত করে নারীদের মত নাড়তে থাকে। অনেক কথার সময় সে কোমরও ঘুরাত। আমাদের অনশন চলাকালে এক রাতে সে মদপান করে ওয়ার্ডে চলে আসে এবং আমাকে মিনতি করে বলতে থাকে, তুমি খাবার খাও। খাবার খেলেতো তোমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। আমি অস্বীকার করলে সে আদর করে বলতে থাকে, আমার খাতিরে না হয় খাও। আমি হাসি সংবরণ করে পূনরায় অস্বীকার করি। তখন উভয় হাতের আঙ্গুল দুলিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, “যাও, আমি তোমার সাথে কথা বলব না।

সে ‘সীন’ কে ‘ছা’ উচ্চারণ করত। প্রথম প্রথম সে মুজাহিদদের উপর চরম নির্যাতন চালাত, তবে ক্রমে তা কমে আসে। তার উপরোক্ত আচরণের কারণে উপদেষ্টা পরিষদ তার মুখান্নাস (নপুংশক হিজড়া) নামকরণ করে।

ভেড়াঃ

সে সি.এম.পি (সেন্ট্রাল মিলিটারী পুলিশ)এর একজন সহকারী সুবেদার ছিল। প্রথম দিকে তার ভয়ংকর চেহারা দেখে সবাই অস্থির হত। পরে জানা যায় যে, তার মেজাজও খুব কড়া। তাই তার নাম রাখা হয় ‘ভেড়া’। মুজাহিদরা যখন আল্লাহ পাকের তাওফীকে টর্চারিং সেন্টারের পরিবেশ অনেকটা অনুকূলে এনেছে,

এমন সময় সে ইনচার্জ হয়ে আসে। সে এসেই পূনরায় কঠোরতা করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়। প্রথম দিকে এই টর্চারিং সেন্টারে কোন অফিসার আসতেই প্রত্যেক বন্দীকে দাঁড়িয়ে তার সম্মুখে ‘জয় হিন্দ’ বলা আবশ্যকীয় ছিল। কিন্তু মেহমান মুজাহিদরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে পরিবেশ পাল্টে ফেলে। অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, যত বড় অফিসারই আসুক না কেন, ‘জয় হিন্দ’ বলা তো দূরের কথা, কেউ দাঁড়ানও পছন্দ করত না। বরং অনেক সময় কোন উপরস্থ সেনা অফিসার এলে মুজাহিদরা তাদের পা আরো ছড়িয়ে দিত। এই পরিবেশে যখন ‘ভেড়া’ দায়িত্ব নেয়, তখন সে খুব ছটফট করে।

একবার সে বড় একজন সেনা অফিসারকে নিয়ে এলে মুজাহিদরা তাকে কোনই গুরুত্ব দেয় না। বরং সেলের মধ্যে তার সামনেই শুয়ে থাকে। অফিসারটি ভেড়ার উপর ক্রোধান্বিত হয়। কিছুক্ষণ পর ভেড়া অধিক ক্রোধে কৃষ্ণবরণ ধারণ করে কাঁপতে কাঁপতে এসে আমাদেরকে একত্র করে বলে, আগামীতে কোন অফিসার এলে তোমরা না দাঁড়ালে এবং ‘জয় হিন্দ’ না বললে আমি তোমাদের সাথে চরম খারাপ ব্যবহার করব। আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নেই এবং নিজেদের বর্তমান কর্মপদ্ধতির উপর অটল থাকার দৃঢ়সংকল্প করি।

পরের দিন ভেড়া অন্য একজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে আসে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আজকে পাকিস্তানী মুজাহিদরা শুধরে গেছে। কিন্তু কোন সাথী নিজের জায়গা ছেড়েও ওঠেনি। কতক সাহসী সাথী তো সেই অফিসারের সম্মুখে নিজের পা আরো ছড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে তাকে তিক্ত উত্তর শুনিয়ে দেয়। ইণ্ডিয়ান আমীর টর্চারিং সেন্টারে এই সাহস ও নির্ভীকতা শুধুমাত্র আল্লাহর সাহায্যে এবং নিজেদের ঐক্যমতের কারণে হয়েছিল। আল্লাহ পাক এসব অসীম সাহসী ব্যক্তিদেরকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

ডিসিপ্লিনঃ

সে একজন বড় আহম্মক হাবিলদার। ওয়ার্ডে এসেই বলত—সকলে ডিসিপ্লিনের সাথে থাকো। তার এই ঘোষণার কারণে তার নাম হয়ে যায় ডিসিপ্লিন। স্বাধীন কাশ্মীরের একজন সাথী তাকে ‘বুজাও’ (বাদর) বলত। তার নির্বোধপূর্ণ ঘটনা লিখলে একটি শিক্ষণীয় গ্রন্থ রচিত হবে। প্রথম দিকে সে মুজাহিদদের উপর অত্যন্ত জুলুম অত্যাচার করত। কিন্তু প্রতিভাধারী মুজাহিদরা যখন তাকে নিয়ে খেলতে শুরু করে, তখন সে মুজাহিদদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়। কেউ তাকে মাটিতে শোয়াতো, কেউ লোহার শিকে ঘুষি

মারতে বলত। কেউবা তাকে অন্য সৈনিকের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত করাত।

সে চর্সের নেশায় অভ্যস্ত ছিল। প্রায়শই সে বলত—আমি তো ভগবানকে বলব-পরবর্তী জনমে আমাকে শূকর বানিয়ে দাও। সারাদিন আরামে কাদার মধ্যে পড়ে থাকব। আমরা তাকে বলতাম, জনাব! আপনার হাত তো লোহার মত শক্ত মনে হচ্ছে। তখন সে তার ছোট হাত দুটোকে লোহার শিকের উপর মারতে আরম্ভ করত। যার কষ্ট তার মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হত। কিন্তু সে প্রশংসা কুড়ানোর জন্য অবিরত ঘুষি মারতে থাকত। সে প্রায়শই তার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিশোধ গ্রহণের একটি ঘটনা শোনাত। ঘটনাটি ভারত সরকারের পলিসি ও তার প্রকৃতি বুঝতে বিশেষ সহযোগী হবে বলে বাধ্য হয়ে উল্লেখ করছি। সে বলত-

এক দুষ্ট লোক একবার আমাকে মারধোর করে। আমি পালিয়ে আমার বড় বোনের নিকট যাই এবং পুরো ঘটনা তাকে শোনাই। আমার বোন খুবই রাগান্বিত হয় এবং বলে যে, সে পৃথ্বীরাজ গোত্রের ন্যায় রাজবংশের উপর হাত উঠিয়েছে। আমি তাকে ক্ষমা করব না। পরদিন সেই দুষ্ট লোকটি বাজারে গেলে আমার বোন পথিমধ্যে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে ফেরার পথে তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমার বোন নিজের শাড়ী নিক্ষেপ করে চিৎকার শুরু করে দেয় এবং বলে যে, সে আমার মান নষ্ট করেছে। লোকজন একথা শুনে ও এ

দৃশ্য দেখে তাকে আচ্ছামত ধোলাই দেয়। বিকেল বেলায় সে পট্টিবেঁধে যাচ্ছিল। তখন আমি তাকে বললাম, দেখেছো আমাদের প্রতিশোধ।

আজ ভারতও মুজাহিদ ও পাকিস্তানকে এমনইভাবে বদনাম করার চেষ্টা করে। কিন্তু একথা ভাবেনা যে, এতে তার নিজের কি পরিমাণ অসম্মান ও অমর্যাদা হয়।

ডিসিপ্লিনের সঙ্গে একবার এই মনোমুগ্ধকর ঘটনাও ঘটে যে, একদিন সে আমার সেলে এসে মাথা ধরে রেখে বলে যে, মাথা খুব ব্যথা করছে। কোন বড়ির নাম বলে দাও। আমি বললাম, ‘জরকায়ী’- এর এক গুলিই (উর্দুতে বড়ি তথা টেবলেটকেও গুলি বলে) আপনার মাথা সেরে দিবে। সে এ নাম মুখস্থ করে অন্য সেলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, বাস্তবিকই ‘জরকায়ী’-এর গুলিতে মাথা ব্যথা সারে কিনা। তখন আমার সাথী স্বীকার করে বলে যে, এক গুলি খেলে আর কখনোই আপনার মাথায় ব্যথা হবে না। (নোট পশতু ভাষায় লাইট মেশিনগানকে ‘জরকায়ী’ বলে। ইণ্ডিয়ার মুশরিক এ শব্দের অর্থ বুঝত না।)।

পাটে খানঃ
সে বেঁটে গঠনের এক পণ্ডিত ছিল। সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও সারাদিন পণ্ডিতগিরি করত। কারো হাত দেখে ভাগ্য বলত আবার কখনো কখনো কোন বিশেষ ধরনের রেখা আঁকত। তার আকৃতি, আওয়াজ ও গঠন দেখে

খুব কষ্ট হত এবং ভয় লাগত। এসব কিছুই আল্লাহর তৈরী। কিন্তু কুফরীর অকল্যাণ খুবই মারাত্মক , তা সব কিছুকেই নষ্ট করে দেয়। সাথীরা তার নাম রাখে পাটে খান। যা খুবই পছন্দ করা হয়। সে বলত —আমি একশ' বছর পর্যন্ত মরব না। একবার সে অথবা অন্য কোন সৈন্য আমাদের এক সহজ সরল সাথীর সম্মুখে সগর্বে বুক ফুলিয়ে বলে , আমি জীবনে কখনো ডিম এবং গোস্ত চেখে দেখিনি। সেই সাথী সাথে সাথে বলে —

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

"ইহকাল- পরকাল দুটাই খোয়াইছ। "

সে তো এর অর্থ বুঝেনি , তবে সকল সাথী হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে।

খাদ্য প্রসঙ্গে কিছু কথা

শ্রীনগরের বাদামী বাগ টর্চারিং সেন্টারের খাবার ছিল বড় অদ্ভুত ধরনের। একজন মুসলমান হিসাবে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই নীতি সর্বদাই আমাদের সম্মুখে থাকে যে , তিনি কখনো খাদ্যের নিন্দা করতেন না। পছন্দ হলে আহার করতেন , না হলে বাদ দিতেন। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে , খাদ্য মুসলমানের জীবনের লক্ষ্যবস্তু নয় , নিছক প্রয়োজন মাত্র। পক্ষান্তরে কাফেররা একে জীবনের

লক্ষ্য মনে করে। সুতরাং আপনি যে কোন কাফেরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করবেন, তাতে খাবারের আলোচনা অতি বিশদভাবে দেখতে পাবেন। ভারতে অবস্থানকালে কারাগারে যখন পত্রপত্রিকা পেতে শুরু করি, তখন আমার কয়েকজন হিন্দু ও শিখ কলামিষ্টের প্রবন্ধ ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠের সুযোগ হয়। খ্যাতনামা শিখ কলামিষ্ট খোশবন্ত সিং, ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য, শতপাল মহাজন এবং এমন আরো অনেক সাহিত্যিক ও কলামিষ্ট আছেন, যারা তাদের কোন ভ্রমণ কাহিনী লিখলে খাদ্যই হয় তার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তার পেটুকেপনার কারণে প্রায়ই পত্রপত্রিকার আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হন। তার স্বদেশের ও বিদেশের ভ্রমণকালে তার খাদ্যতালিকা পত্রপত্রিকার শোভা বর্ধন করে। কারাগারে অতিবাহিত ছয় বছর সময়কালে যখনই কোন মুশরিক অফিসার আমাদের পরিদর্শনে এসেছে, সে সহানুভূতিবশত প্রথম প্রশ্ন এটিই করেছে যে, খাবার পাও কিনা? আমরা ইতিবাচক উত্তর দিলে সে বলত, আপনারা আর কি চান? আরামে খেতে পাচ্ছেন। খাদ্যের সাথে হিন্দুদের এই সম্পর্ক দেখে সর্বদা আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মহান বাণী স্মরণ হত। তিনি এরশাদ করেছেন, কাফের সাত আঁতে

আহার করে, আর মোমিন এক আঁতে আহার করে। ইসলামের এ সকল শিক্ষা ও এই প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেই এই লেখনীতে খাদ্যের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে মন চায় না। তবে মুজাহিদদেরকে বন্দী হওয়ার পর কি ধরনের আচরণের মুখোমুখী হতে হয় তা বন্দী জীবন চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাছাড়া এতে করে কাফেরদের মানব অধিকারের শ্লোগানের বাস্তব অবস্থাও জানা যাবে এবং মুজাহিদরা সবরকম অবস্থার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারবে, বিধায় এ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

শ্রীনগরের বাদামীবাগ, টর্চারিং সেন্টারে মুজাহিদদেরকে তিন বার খাবার দেওয়া হয়। সকাল বেলা দুধবিহীন তিতা কফি, আর দু টুকরা পুরাতন পাউরুটি। দুপুরে তেল, মরিচ ও মসলাবিহীন সিদ্ধ সবজি, আর বালুমিশ্ৰিত আটার ছোট ছোট চাপাতি। রাতেও এই খাবারই দেওয়া হত। টর্চারিং সেন্টারে কর্মরত লোকেরা বলেছে, তরকারীর মসলা বাবদ বন্দীদের মাথাপিছু মাসিক শুধুমাত্র এক টাকা বরাদ্দ। প্রথম দিকে এ খাবার মুখে দেওয়া এবং গলধঃকরণ করা অতি কষ্টকর হত। বেশ কিছু দিন পর্যন্ত শুধুমাত্র এক দুই গ্রাস খেয়ে চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত করেছি। এ অবস্থা দেখে কোন কোন সৈনিক অত্যন্ত সমবেদনা ভরে বলত, না খেলে বাঁচবে

কেমনে? অনেককে তাদের নিজেদের মধ্যে এমন বলাবলি করতেও শুনেছি যে , বুঝিনা এরা এত কম খেয়ে বাঁচে কি করে ?

আল্লাহ পাক রিযিকদাতা , আমাদের কল্যাণের জন্য কয়দিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। যেই রব (প্রতিপালক) আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন , তিনি ধৈর্যও পর্যাপ্ত দান করেছিলেন। কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের আগ্রহ খাদ্য গ্রহণ করার উপরে এত প্রবল হত যে , খানা খাওয়ার দিকে মনোযোগই সৃষ্টি হত না। এমন অনেক বেলা অতিবাহিত হত যে, এক গ্রাস খাবারও গ্রহণ করিনি। খাবার বহনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। তারা এই পরিস্থিতি দেখে কেঁদে ফেলত এবং নির্জনে খানা খাওয়ার জন্য উপদেশ দিত। কিন্তু তাদের জানা ছিল না যে , আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধুমাত্র রুটি আর তরকারীরূপেই রিযিক দেওয়া হয় না , বরং আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন পন্থায় স্বীয় বান্দাদেরকে রুযী দিয়ে থাকেন। এ রুযী কারো খাদ্যের রূপে আর কারো বা যিকিরের মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ করে , আবার কখনো তা ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টির মাধ্যমে নছীব হয়ে থাকে ,

ذكرك للمشتاق خير شراب....
وكل شراب دونه كسراب
অর্থঃ প্রেমিকের জন্য প্রেমাস্পদের
স্মরণই অমৃত সুধা।

এছাড়া অন্য সকল পানীয় তার জন্য মরিচিকার মতই মূল্যহীন।

কিছুদিন বাহ্যিক পরীক্ষা গ্রহণের পর আল্লাহ তাআলা সেই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠেই নানা প্রকারের জাহেরী রুযীও পৌছাতে আরম্ভ করেন। তারও কিছু ঝলক নিম্নে লক্ষ্য করুন।

কাশ্মীরী বোনদের কুরবানী বন্দীকালে আমার নিকট যে টাকা ছিল, ইণ্ডিয়ান আর্মী সেগুলো হজম করে ফেলে। আমার নিকট পাসপোর্টের সঙ্গে বার শ’ ডলারও ছিল। যথাসময়ে অবহিত করানোর কারণে সেগুলো কাগজে উল্লেখ ছিল। বন্দী হওয়ার সাড়ে পাঁচ বছর পর জম্মুর একজন জজ রায় দেয় যে, ডলারগুলো কয়েদীকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এই রায় বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা আমাকে মুক্তি দান করেন। মুক্তিদানকালে ডলারগুলো আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। ফলে ইণ্ডিয়া এখনো আমার নিকট ঋণী আছে। গ্রেফতার করার সময় সবগুলো টাকা নিয়ে নিয়েছিল, বিধায় শ্রীনগরের বাদামীবাগের টর্চারিং সেন্টারে যাওয়ার সময় আমি সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত ছিলাম। প্রথম কয়েকদিন এ অবস্থাতেই অতিবাহিত হয়। পরবর্তীতে কাশ্মীরের মুসলমান ভগ্নিদের কুরবানীর বদৌলতে আমাদের নিকট

টাকা পৌঁছতে থাকে। কাশ্মীরী বোনেরা তাদের মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে কারাগারের বহিরাংশে আসার সময় অত্যধিক সতর্কতার সাথে কিছু টাকাও লুকিয়ে আনত। অথচ মহিলা পুলিশের মাধ্যমে তল্লাশী করার কড়া ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কাশ্মীরের মা- বোনেরা তো মুজাহিদদের নিকট অস্ত্র পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে থাকে। আত্মসম্মানসম্পন্না, লজ্জাশীলা ও বীরাঙ্গনা এ সকল নারীদের জন্য কয়েকটি নোট আনা এমনকি কঠিন ছিল?

এমনিভাবে কারাগারের কিছু কর্মচারীও এই খেদমত সম্পাদন করত। বাইরে থেকে মুজাহিদরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, আর ভিতর থেকে আমরা তাদের উপর জাল ফেলি। ফলে কয়েকদিন পর কারাগারে আমাদের খাদ্যের অভাব দূর হয়ে যায়।

টর্চারিং সেন্টারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সি,এম,পি (সেন্ট্রাল মিলিটারী পুলিশের)এর হাতে ছিল। এরা সেনাবাহিনীর পুলিশ। এর সদস্যরা লাল টুপি পরিধান করে। তাদের বাহুতে উর্দীর উপর একটি কাপড় লাগানো থাকে। তাতে ইংরেজীতে এমপি, অর্থাৎ মিলিটারী পুলিশ লেখা থাকে। আমাদের টর্চারিং সেন্টারে সি.এম. পির কয়েকজন কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল আসামের অধিবাসী হিন্দু রায়। তার কথা ও কঠোর আচরণের কারণে তাকে ইণ্ডিয়ার

সীমাহীন বিশ্বস্ত মনে হত। টর্চারিং সেন্টারের কয়েদীরা সেনা আইনানুযায়ী মাত্র তিনটি জিনিস বাহির থেকে ক্রয় করতে পারত। পাউরুটি, সিগারেট ও বিড়ি। এসব জিনিস কিনে আনা রায়ের দায়িত্বে ছিল। কয়েদীরা টোপ ফেললে সে তাতে ফেঁসে যায়। সে তার ইচ্ছামত রেটে এমন সকল বস্তুই বাইরে থেকে এনে দিতে থাকে, যেগুলো সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। সে চাকুরী বাঁচানোর জন্য ঘুষ নিত না। কিন্তু জিনিসের মূল্য এত বেশি নিত যে, সে এবং তার অফিসার ধীরে ধীরে মালদার হতে থাকে। মাখন, বিস্কুট, মোমবাতি, মিটাই, ফল, আচার, চাটনী ও আরও অজানা অনেক কিছুই সে এনে দিত। তখন তার দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ও দেশপ্রেম হ্রাস পেয়ে যায়। সে তখন কয়েদীদের সাথে সমবেদনাপূর্ণ কথাও বলত। সাথে সাথে সে সব কয়েদীদেরকে মিথ্যা বলার নিয়মতান্ত্রিক হাতে কলমে অনুশীলন করাত। সে বলত, আমি বড় অফিসাররূপে এসে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করব, বাইরের কি কি পান? আপনারা উত্তর দিবেন, ব্রেড, বিড়ি, সিগারেট। সুতরাং সে অফিসারের ঢঙ্গে এসে জিজ্ঞাসা করত, আর কয়েদীরা তার শেখানো উত্তর দিত। তাতে সে নিশ্চিন্ত হত যে, অকস্মাৎ বড় কোন অফিসার এসে বন্দীদের জিজ্ঞেস করলে আইনবিরুদ্ধ বস্তুর কথা প্রকাশ পাবে না।

আমার সেলে স্বাধীন কাশ্মীরের একজন মুজাহিদ বন্দী ছিলেন। সে ছিল রসিক প্রকৃতির। একবার মিথ্যার অনুশীলনের সময় রায় এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, কি কি পান? সে উত্তর দেয়, ব্রেড, মাখন, সিগারেট। একথা শুনে রায় দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে থাকে এবং বলে কতবার বুঝিয়েছি তাও বুঝেন না? মাখন বলবেন না। তারপর রায় অফিসারের রূপে পূনরায় জিজ্ঞাসা করে, কি কি পান? মুজাহিদটি বলে ব্রেড, মাখন, না মাখন না, একেবারেই না। রায় একথা শুনে ভীষণ অস্থির হয়ে আমাকে বলে, জনাব আপনি একে বুঝিয়ে দেবেন। নইলে সে সবাইকে ফাঁসাবে। আমি বললাম, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি তাকে বুঝিয়ে দেব।

রায়ের উদারতা দেখে আমরা আমাদের খাবারে সার্বিকভাবে সংস্কার করি। কিছু আচার, পিয়াজ ইত্যাদি জিনিস আনিয়ে নেই। পিয়াজ কেটে তার সাথে আচার মিশিয়ে সাথীদেরকে খাবারের সাথে দেওয়া হত। ফলে খাবার সহজেই পেটে যেত।

লাড্ডু ও মাছ
কোন কোন সাথীর নিকট বেশি পরিমাণে টাকা আসলে তারা লাড়ু কিনিয়ে এনে সকল সঙ্গীর মধ্যে বিতরণ করে। কারাগারে সেই লাড়ু অনেক বড় নি'আমত মনে হয়েছিল। সাথীরা নিজ

নিজ অংশের লাড্ডু যত্ন করে রেখে দেয়। তারা পাকিস্তানী রেওয়াজমত আহারের পর তা এক আধটি করে খেতে থাকে। এতে করে দেড় দুই দিন পর্যন্ত আহারের পর মিষ্টি খাওয়ার পাকিস্তানী অভ্যাসও পুরা হয়। আরো অগ্রসর হয়ে কোন কোন সাথী রায়কে মাছের কৌটা আনাতে সম্মত করে। সে প্যাকেটজাত মাছের ছোট কৌটা নিয়ে আসে। কিন্তু এ পরিকল্পনা স্থায়ী হয় না। কারণ, গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাইরে থেকে মাছ ক্রয় করে আনা আর সম্ভব হয় না।

মোমবাতির উপর তরকারী কোন কোন সাথী রায়কে দিয়ে মোমবাতি আনাতে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে মোমবাতি অন্ধকারে কুরআন তেলাওয়াত করতে ব্যবহার করা হত। কিন্তু মোমবাতি পরিমাণে বেড়ে গেলে একজন দক্ষ সাথী মোমবাতির উপর তরকারী সংস্কারের কাজ শুরু করে দেয়। সে দু তিনটি মোমবাতি জ্বালিয়ে কৌটা দিয়ে চুলা তৈরী করে তার উপর প্লেট বসাত। প্লেটের মধ্যে মাখন এবং কাটা পিয়াজ দিয়ে তার মধ্যে কারাগারের তরকারী গরম করত। খাবারের এই আয়েশী আয়োজন কিছুদিন চলতে থাকে। পরে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিছুদিন মোমবাতির আগুনে পিয়াজ, মাখন ও মরিচের সমন্বয়ে, চাটনী তৈরী করে তরকারীতে দিয়ে তরকারী সুস্বাদু করা হত। এসব কাজ চরম

বেআইনী হওয়ার কারণে খুব কম দিনই তা করা হত।

কারাগারের হালুয়া মোমবাতির যুগ শুরু হলে সকালের নাস্তা রাজকীয় হয়ে যায়। উপরে আমি উল্লেখ করেছি যে, সকালের নাস্তায় দুই পিস পাউরুটি ও তিতা কফি দিত। স্বচ্ছলতার সময়ে বাইরে থেকে মাখন ক্রয় করে আনানো হয়। মাখন দিয়ে পুরাতন পাউরুটি বেশ সুস্বাদু লাগত। মোমবাতির যুগে রুটিতে মাখন লাগিয়ে গরম করে নেওয়া হত। যা খুবই সুস্বাদু হত। একজন মুজাহিদ সাথী বেকারীর কাজে অভিজ্ঞ ছিল। সে হালুয়া খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। কোথাও থেকে সে একটি চিকন রশি এবং একটি পাত্র জোগাড় করে। রশির এক মাথা সেলের ছাদের লোহার সঙ্গে বেঁধে অপর মাথায় পাত্রটি বেঁধে মাটি থেকে সামান্য উপরে ঝুলিয়ে দেয়। তারপর পাত্রের নীচে মোমবাতি জ্বালায়। সেই পাত্রে মাখন গরম করে তার মধ্যে চিনি জ্বাল দেয়। তারপর পাউরুটি পানির মধ্যে চূর্ণ করে মাখনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে খুব ভালভাবে রান্না করে। ফলে বিরল ও বিস্ময়কর হালুয়া তৈরী হয়। সাথীদেরকে তা খেতে দেওয়া হয়। দুদিন পর্যন্ত এই হালুয়া খুব আগ্রহের সাথে খাওয়া হয়। কিন্তু পরে এর বিরুদ্ধে কিছু কিছু সমালোচনা শুরু হয়। কেউ কেউ তা

কাঁচা হওয়ার দোষ দেয়। মতবিরোধের কারণে বেশি দিন পর্যন্ত হালুয়া তার জালুয়া (ঔজ্জল্য) দেখাতে পারেনি। তাছাড়া মোমবাতির উন্নত যুগও খুব অল্প সময় স্থায়ী হয়।

টর্চারিং সেন্টারে ভুনা মুরগী ঈদের দিন কাশ্মীরী ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তাদের পরিবার আমাদের জন্য মুরগীর সুস্বাদু ভুনা গোশত পাঠায়। সত্য কথা এই যে, খাওয়ার সময় গোশতের স্বাদ কম এবং আল্লাহর রহমতের স্বাদ অধিক উপলব্ধি হচ্ছিল। কোথায় এই নির্যাতনের গর্ত! আর কোথায় এই উঁচুমানের খাদ্য! বাস্তবিকই তা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহ। কারাগারের ব্যবস্থাপক নসীব সিং-এর কানে একথা পৌঁছে যায়। সে কাশ্মীরীদের উপর সাক্ষাতের সময় কারাগারে কিছু আনার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অতি কঠোরভাবে সেই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে কাশ্মীরী মুসলমানগণ আমাদের জন্য কিছু রান্না করে আনলে হয় তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হত, নতুবা কারাগারের কর্মচারীদেরকে খাওয়াতে হত। নিষেধাজ্ঞার পূর্বে আমাদের নিকট প্রচুর পরিমাণে কাশ্মীরের আপেল আসত। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার পর এ সবকিছুই বাধাগ্রস্ত হয়।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لْعَٰلَمِينَ على كُلِّ حالٍ

সর্বাবস্থায়ই সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর।

উন্নত খাবার

সেনাবাহিনীর লোকদের জন্য বরাদ্দ প্রাত্যহিক খাবার থেকে কিছু করে টাকা বাঁচিয়ে রেখে কোন বিশেষ দিনে বা উৎসবকালে সঞ্চিত সেই টাকা দিয়ে উন্নতমানের খাবার তৈরী করা হয়। এখানকার সেনারা একে ‘বড় খাবার’ বলে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতেও এরূপ বড় খাবার তৈরী করা হয়ে থাকে। আমরা এই পরিভাষা সর্বপ্রথম বাদামীবাগের টর্চারিং সেন্টারে এসে শুনি। ঈদের একদিন পূর্বেই আমাদেরকে জানানো হয় যে, আগামী কাল আপনাদেরকে বড় খাবার দেওয়া হবে। সকালের নাস্তা পূর্বের মতই দেওয়া হয়। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, বড় খাবার শুধুমাত্র একবেলা দেওয়া হবে, সারাদিন নয়।

দুপুরবেলা রান্নাঘরের দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যরা সাধারণ নিয়মের বিপরীত কয়েকটি ডেগ এবং পাতিল নিয়ে আসে। সেগুলো ঢাকনা দিয়ে ঢাকা ছিল। ইতিপূর্বে আমাদের খাবার আসত বড় একটি বালতিতে করে। আজকে বালতির পরিবর্তে বড় খাবারের নিদর্শনরূপে এসব দেখা যাচ্ছিল। তখনো খাবার বন্টন করা

হয়নি এমন সময় এক কাশ্মীরী মুজাহিদের পেট ব্যথা শুরু হয়। প্রচণ্ড ব্যথায় সে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। অন্য কয়েদীরা ডিউটি রত সান্ত্রীকে একথা জানালে সে টর্চারিং সেন্টারের সেনা কম্পাউণ্ডারকে ডেকে আনে। কম্পাউণ্ডার মদের নেশায় বুদ হয়ে ছুটির দিন কাটাচ্ছিল। এমনিতেও সে ছিল খুব অত্যাচারী ও কট্টর হিন্দু। সে ঐ মুজাহিদকে মেডিক্যাল রুমে নিয়ে গিয়ে চরমভাবে নির্যাতন চালাতে শুরু করে। অসুস্থ মুজাহিদের চিৎকার সমগ্র টর্চারিং সেন্টারে গুঞ্জরিত হতে থাকে। সেল ও কামরায় অবস্থানরত মুজাহিদ কয়েদীরা তার চিৎকার শুনে অস্থির হয়ে পড়ে। ঈদের আনন্দপূর্ণ দিনে একদিকে তারা শত্রুর হাতে বন্দী, অপরদিকে এই মর্মন্তুদ অত্যাচার! বেশির ভাগ সাথী বিছানায় মুখ গুজে লুকিয়ে কাঁদতে থাকে। তাদের মধ্যে প্রতিবাদমুখর হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নির্যাতন চালানোর পর সেই মুজাহিদকে সেলে ফিরিয়ে আনা হলে তার অবস্থা দেখে সকল মুজাহিদ দুঃখ-বেদনা ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কারা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে সামলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সকলে খুব উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত ছিল। মুজাহিদরা দোষী কম্পাউণ্ডারটিকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়। কারা কর্তৃপক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করে খাবার বিতরণ করে। কিন্তু কেউ সে খাবার গ্রহণ করে না। ওদিকে সেই ঈদের দিন

সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্যও কোন কিছু নিয়ে আসা নিষিদ্ধ ছিল। কিছুক্ষণ পর সেসব ডেগ এবং পাতিল ফিরিয়ে নেয়া হয়। আর ওদিকে মুজাহিদগণ ঈদের দিনে ক্ষুধার্ত পেট আর বিষাদগ্রস্ত অন্তরে নিজেদের অতীত স্মরণ করতে থাকে।

টর্চারিং সেন্টারে জ্বিনের পশ্চাদ্ধাবন টর্চারিং সেন্টারে বেশির ভাগ মুজাহিদ খুব যত্ন সহকারে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। সাধারণ লোকেরা পবিত্র কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক তাফসীর না জানার কারণে কেবলমাত্র বাহ্যিক দিকে লক্ষ্য করে এ ধারণা পোষণ করে যে, দুঃসময়ে বেশি ইবাদত করা মুশরিকদের পন্থা; তাদের এই ধারণা ঠিক নয়। পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র বিপদের সময় আল্লাহকে ডেকে থাকে। আর স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে ভুলে যায়। উপরন্তু অন্যদেরকে তার সাথে শরীক করে থাকে। কিন্তু মুমিনের অবস্থা এই যে, তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ডাকে। এমনিভাবে বিপদের সময়েও আল্লাহকে খুব বেশি ডাকা, তার দরবারে রোনাজারী করা, তাওবা- ইস্তেগফার করা, তার সাহায্য কামনা করা, ইহাও মুমিন বান্দার বিশেষ গুণ। যেমন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214)

(অর্থাৎ , রাসূল এবং তাঁর সহচর ঈমানদারগণ বললঃ আল্লাহর সাহায্য কোথায় ?)। বিপদের মুহূর্তে ও কষ্টকর পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তর বিগলিত থাকে , মানুষের অন্তর থেকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভালবাসার মরিচা দূর হতে থাকে , ফলে ইবাদতের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তার ইবাদত প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। তবে কিছু পাষাণ হৃদয় লোক এমনও আছে , যারা মুসীবতের সময় পূর্বের তুলনায় অধিক পাপিষ্ঠ হয়ে ওঠে , তাদের অন্তর মারাত্মকভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে, এমন পরিস্থিতির শিকার হওয়া মহাবিপজ্জনক। আল্লাহ পাক এই অবস্থা থেকে হেফাযত করুন। বাদামীবাগের টর্চারিং সেন্টারে কোন কোন সাথী প্রথমদিকে অধিকহারে ইবাদত করতে থাকেন। তা দেখে অন্যান্য সাথীরাও উৎসাহিত হয় এবং কয়েকদিনের ভিতর পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। (প্রকৃতপক্ষে মুজাহিদদের জন্য সর্বাবস্থায় খুব বেশি ইবাদত করা উচিত। কারণ স্বীয় মনকে জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত রাখা এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী হওয়া উভয়টিই আল্লাহর সাহায্য ভিন্ন সম্ভব নয়। আর আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য নিয়্যাত ও আমল বিশুদ্ধ হওয়া নিতান্ত জরুরী। সুতরাং

যে সকল মুজাহিদ নামায, তেলাওয়াত ও যিকিরের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না, তারা খুব তাড়াতাড়ি জিহাদ থেকে দূরে সরে যায়। তারা শুধুমাত্র নামের মুজাহিদ থাকে।)

সাথীরা যেসব ইবাদতের প্রতি অধিক যত্নবান হয় তা এই যে, বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত, গুরুত্বসহকারে আল্লাহর যিকির, নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল আদায় করা, ধারাবাহিক নফল রোযা রাখা এবং দুআ ইউনুসের খতম করা।

আল্লাহ তাআলা মানব প্রকৃতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। সুতরাং সাথীরা লুকিয়ে লুকিয়ে ইবাদতের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকে। প্রত্যেকে অন্যের তুলনায় ইবাদতের পুণ্যময় এই ক্লেশে নিজেকে অধিক পরিমাণে অবতীর্ণ করে। কোন কোন সাথী একাধারে চল্লিশ দিন নফল রোযা রাখে। কেউ কেউ নিয়মিতভাবে অতীতের নামায-রোযা কাযা পরতে থাকে। অনেকে আয়াতের ওযীফা লক্ষবার পড়ে। সোমবার ও বৃহস্পতিবারে ইবাদতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রায় সকল সাথী রোযা রাখে। এ ব্যাপারে এত দৃঢ় পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে, কেউ উজরবশত রোযা রাখতে না পারলে নিজেকে অপরাধী মনে করত। সে অন্যদের সম্মুখে পানাহার করা থেকে বিরত থাকত। অথচ

সামগ্রিকভাবে উৎসাহ দান করা ছাড়া কোন প্রকার কঠোরতা বা বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু পরিবেশ নিজেই নিজের পথ নির্ধারণ করে নেয়। ইবাদতের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানের এই সময়ে মুক্তিলাভের জন্য বিভিন্ন ওযীফা পাঠ শুরু করা হয়। এশার নামাযের পর অধিকাংশ সাথী নির্দিষ্ট সংখ্যায় -

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

এর ওযীফা পাঠ করত। অনেকবারই সোয়া লক্ষবার দুআ ইউনুস পাঠ করা হয়। .... এর ওযীফাও লক্ষ লক্ষবার করে পাঠ করা হয়। কেউ সূরায়ে আনফাল এবং সূরায়ে জিন পড়তে বললে তাও খুব গুরুত্বসহকারে পড়া হয়। মুক্তিলাভের জন্য ওযীফা পুরা করার পর সহসাই পরবর্তী ধাপে জিন আয়ত্ব করার আমল শুরু হয়। আসলে আমালিয়াতের একটি কিতাব কিভাবে যেন টর্চারিং সেন্টারের ভিতর পৌঁছে যায়। তাতে জিন আয়ত্ব করার কিছু আমল লেখা ছিল। কোন কোন সাথী এই কিতাব পাঠ করে। তারপরে অগ্রপশ্চাত না ভেবে চোখ বন্ধ করে জিনের পিছনে লেগে যায়। আমি তাদেরকে বুঝাই যে , আপনারা নিজেরাই তো বন্দী। এমতাবস্থায় অন্য মাখলুককে কয়েদ করার চিন্তা অনর্থক। কিন্তু সাথীরা এর ধান্ধায় পড়ে যায়। মূলত এই আগ্রহের পিছনে মুক্তিলাভের বাসনা তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। তারা মনে করছিলো যে , জিন আয়ত্ব

করে তাদের কাঁধে সওয়ার হয়ে কারাগারের বাইরে চলে যাবে। অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর কোন কোন সাথী জোর জবরদস্তি অনুমতি নিয়ে নেয়। অথচ আমি কোনভাবেই এ কাজের পক্ষে ছিলাম না। সেই কঠিন জায়গায় সাথীদের কথা না মেনে উপায় ছিল না।

যাই হোক, খুব জোরে শোরে জিন অধীন করার আমালের ধারা শুরু হয়। কয়েক জন সাথী নিজ নিজ সেলে লুকিয়ে সূরা জিন পাঠ করতে থাকে। কেউ কেউ অধিক হারে রোযা রাখে এবং চিনির সরবত দ্বারা ইফতার করতে থাকে। কেউ লবণ খাওয়া ছেড়ে দেয়। কেউ আবার সাথীদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু জিন খুব বুদ্ধিমান। তারা শেষ মুহূর্তে এসে আর ধরা দেয় না। এটি ছিল সাথীদের মন্তব্য। আমি বলতাম, জিনরা তো আপনাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। তারা তাদের সন্তানদেরকে বলে, বেটা, চল, আজ তোমাদেরকে কয়েকজন পাগল দেখিয়ে আনি। যারা নিজেরা বন্দী হয়েও আমাদেরকে বন্দী করার জন্য জাল ফেলছে। আমরা উপহাস করা সত্ত্বেও সাথীরা খুব দৃঢ়তার সাথে জিন অধীন করার জন্য নিজেদেরকে ক্লান্ত শ্রান্ত করতে থাকে। তারা আমাকেও পীড়াপীড়ি করতে থাকে যে, আপনিও এই আমল শুরু করুন। কারণ, আমরা আশা রাখি যে, আপনি এই আমল করলে সাথে সাথে কাজ হবে।

সাথীদের পীড়াপীড়ির কারণে ‘কোট ভলওয়াল’ কারাগারে তিনদিনের একটি আমল আমিও শুরু করি। দুদিন দু'রাত পাঠ করার পর তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিন অকস্মাৎ কারাগারের লোকদের সঙ্গে মুজাহিদদের মারামারির অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। আমি সংবাদ পেয়ে ওযীফা ছেড়ে দিয়ে লাঠি হাতে নিয়ে বাইরে বের হই। এরপর আর কখনও এমন আমলের পিছনে পড়িনি। বরং এ ব্যাপারে অন্যদেরকেও বুঝাতে থাকি এবং বারণ করতে থাকি। বাদামীবাগের টর্চারিং সেন্টারে কোন কোন সাথী এই জাতীয় আমল করার সময় উপরি চাপ ও ভয়ের অভিযোগ করে এবং একে ভাল লক্ষণ মনে করতে থাকে। আর কোন কোন সাথী একে একাধারে বসে থাকার কারণে গ্যাসের চাপ বলে আখ্যা দেয়। আমলকারী সাথীরা যাবতীয় অযীফায় ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও কিমিয়াগীরদের (স্বর্ণ তৈরীকারীদের) ন্যায় দৃঢ়তার সাথে নিজের কাজে লিপ্ত থাকে। বাদামীবাগের ‘কোট ভলওয়াল’ কারাগারে তারপর ‘তিহার’ কারাগারে এই পরিশ্রম চলতে থাকে। তিহার কারাগারে তারা লোকচক্ষু থেকে অদৃশ্য হওয়ার একটি আমল পেয়ে যায়।

একজন সাথী কয়েকদিন পর্যন্ত শুধু খেজুর খেয়ে রোযা রাখে এবং ইফতার করে। প্রত্যহ রোদের মধ্যে বসে কয়েক ঘন্টা করে আমল করতে থাকে। শেষের দিন ঘামে নেয়ে উঠে আমল শেষ করে সাথীদেরকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

আমাকে কি দেখা যাচ্ছে? সাথীরা বলে, পূর্বের থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে। এতে সে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে রোদ থেকে ভিতরে চলে আসে। তার ইচ্ছা ছিল, সে অদৃশ্য হয়ে কারাগারের বাইরে চলে যাবে, আর ভিতরে আসবে না। এ ধরনের প্রত্যেক ঘটনার পর আমলকারী সাথীরা নিজের কোন একটি ভুল আবিষ্কার করে বলত যে, আমল তো খুব শক্তিশালী ছিল, কিন্তু পড়ার সময় আমার অমুক ভুল হয়েছিল। যেমন, কিমিয়াগীর (স্বর্ণ তৈরীকারীরা) সারা জীবন আশায় আশায় থেকে অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং জীবনের প্রত্যেক ব্যর্থতার পর একথা বলে নিজেকে প্রবোধ দেয় যে, একটি মাত্র ছ্যাকের কম বেশি হয়েছিল। ঠিক একই অবস্থা আমাদের ওযীফা পাগল সাথীদেরও ছিল।

আমাদের একজন সাথী একাধারে চল্লিশ দিন রোযা রেখে জিন অধীন করার অত্যন্ত কষ্টকর একটি আমল করে। সে আমল অনুযায়ী সর্বশেষ রাতের দুটা, তিনটার দিকে জিন হাযির হয়ে ধরা দেওয়ার কথা। শেষের রাতে আমল পুরা হওয়ার পর নিয়মিতভাবে সে দুআ পাঠ করতে থাকে, কিন্তু রাত দুটা, তিনটার দিকে তাকে নিদ্রায় পেয়ে বসে। ভোরে নামাযের জন্য উঠে, সে নিজেকে একাকী দেখতে পায়, সাথীরা জানতে পেরে বলে, অনেক জিনই এসেছিল, কিন্তু তোমার অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে তারা চলে গেছে, আর তুমি ঘুমিয়েই থাকলে। তিহার

কারাগার থেকে পূনরায় কোট ভলওয়াল গিয়েও আমালিয়াতের ধারা চলতে থাকে। কিন্তু যখন সুড়ঙ্গ খননের কাজ শুরু হলো, তখন আমলের (কাজের) ব্যস্ততা সাথীদেরকে আমালিয়াত থেকে সাময়িকভাবে নিস্কৃতি দেয়।

মিথ্যা
শ্রীনগরের বাদামীবাগের টর্চারিং সেন্টারে এমনও অনেক ঘটনা ঘটেছে যেগুলোকে মনোমুগ্ধকর আখ্যা দেওয়া যায়। আমি তিহার কারাগারে অবস্থানকালে কারাগারের বেদনাদায়ক পরিবেশকে সহনীয় করার জন্য এ সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করি। সৎপথের বন্দীদেরকে সেগুলো শুনাই। প্রবন্ধ শুনে সৎপথের বন্দীদের মুখমণ্ডলে হাসির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। এবার নিন, আপনিও সত্য ঘটনা সম্বলিত রসাত্মক এই লেখা পাঠ করুন এবং তা থেকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করুন, যা এই লেখার মূল উদ্দেশ্য।

সুবেদার নসীব সিং ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে মিথ্যা খুব সহজেই বলা যায়। অথচ সত্য বলার জন্য সতর্কতামূলক অনেক ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হয়। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত। মিথ্যা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এখানে কেউ সত্য বলতে চাইলে প্রথমে ডানে-বামে দেখে, কণ্ঠস্বর

নীচু করে, শ্রোতার কানের সাথে মুখ লাগিয়ে তবে গিয়ে শ্রোতা বক্তার মুখের তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসের সাথে সত্যের সুগন্ধি অনুভব করে। এখানে মিথ্যা জীবনের এক আবশ্যকীয় অঙ্গ এবং ফ্যাশন। ফলে তার ধরন ও মানও বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। কেউ জেনে বুঝে মিথ্যা বলে, আর কেউবা না জেনে না বুঝে। কেউ নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য এমন করে, কেউবা দেশের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য। আমার ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীর এক হাবিলদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, আপনারা ইণ্ডিয়ার সঙ্গে লড়াই করে পারবেন না। ইণ্ডিয়া বিরাট বড় শক্তি। ইণ্ডিয়ার নিকট ত্রিশ কোটি সৈন্য রয়েছে। তার কথা শুনে আমি আত্মসংযম করতে পারলাম না। আমি বললাম, ত্রিশ কোটি কি করে সম্ভব! তাহলে তো এখানকার প্রতি তিনজনের একজন সৈনিক হতে হবে। অথচ এ দেশে দেড় কোটি অক্ষম লোক রয়েছে। প্রায় এক কোটি এইডসের রোগী রয়েছে। নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেড়ে চলছে। বিরাট সংখ্যক শিশুও রয়েছে। তখন হাবিলদারজী বলে, ঠিক আছে ত্রিশ কোটি নয়, বিশ কোটি। সে এক বাসেই দশ কোটি সৈন্য গিলে ফেলে। আমি বিশ কোটি হওয়ার ব্যাপারেও আপত্তি করি। কিন্তু সে তার কথার উপর অটল থাকে।

বাদামীবাগের আর্মী এন্ট্রোগেশন সেন্টার (জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্র)এর পরিচালক ছিল

নসিব সিং নামের এক সুবেদার। কিন্তু আসলে সে বড় বদনসীব ছিল। আমরা তার নিকট থেকে পাঁচ মাসে মাত্র একটি সত্য কথা শুনেছিলাম। তাছাড়া সে কখনই সত্য বলার কষ্ট স্বীকার করেনি। তার কথাবার্তা ও চালচলন দেখে মনে হত যে, এ লোকটি ইণ্ডিয়ার কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতার জীবন্ত রূপ। তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সে মদপান করেও মিথ্যা বলতো। অথচ আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে, বেশির ভাগ হিন্দু মদপান করে সত্য বলে। কারণ, মদ মস্তিষ্ককে উল্টে দেয়। বড় বড় অফিসার রাতে মদের নেশায় বুদ হয়ে যখন কয়েদীদের কক্ষে চক্কর লাগাত, তখন তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা বলে দেয়। তাদের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বেশির ভাগ কথা সত্য হয়। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের কোন কথাই সত্য প্রমাণিত হয় না।

আর মুসলমানদের অবস্থা ছিল এর বিপরীত। তারা মদপান করে মিথ্যা বলতো, কিন্তু নসিব সিং তার মস্তিষ্কে সিধা ও উল্টা উভয়দিকে শুধুমাত্র মিথ্যাই সংরক্ষণ করতো। ফলে সর্বাবস্থায় মিথ্যা বলা তার জন্য সহজেই সম্ভব হতো। সে যখন সেন্টারে প্রবেশ করতো, তখন দরজা থেকেই কিছু বলতে বলতে আসত। আর আমরা মানসিকভাবে মিথ্যার দুর্গন্ধ শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতাম। সে আমাদের নিকট এসে একেকজনকে এভাবে ডাকতো, হাঁ ভাই!

পত্রকার (সাংবাদিক), হাঁ ভাই! ফটোগ্রাফার, হাঁ ভাই! কমাণ্ডার ইত্যাদি। তারপর আমাদের সকলকে একত্রিত করে চিহ্নিত করে করে মিথ্যা বলত। কখনো বলত, আমি আপনাদের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অতিসত্বর পাকিস্তান যাচ্ছি। কখনো সে জাতিসংঘের লোকদের সাথে দেখা করে আসত ও তার বৃত্তান্ত শোনাত।

একবার সে ১৫ দিন গায়েব থাকে। ফিরে এসে আমাদেরকে বলে, আমি পাকিস্তান ঘুরে এসেছি। তোমাদের সকলের পিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাদের একজন সাথী বলল, আমার আব্বার সাথেও কি দেখা হয়েছে? সে বলল, হাঁ, সে তো বিশেষভাবে দেখা করেছে। আমার সাথী বলল, আমার আব্বা তো অনেক দিন পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। নসীব সিং গালি দিয়ে বলল, তাহলে সে হয়ত কোন নকল মানুষ পাঠিয়েছিল।

একবার সে আমাদের সেলে আসে। আমরা তখন নামায পড়ছিলাম। সে আমাদের নামায দেখতে থাকে। আমরা নামায শেষ করলে সে বলল, তোমরা ভুল দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলে। গতকালই আমি শ্রীনগর শহরে গিয়েছিলাম। ভাবলাম আজ মুসলমানদের নামাযও পড়ে নেই। মসজিদে গিয়ে নামায পড়লাম। তারা তো অন্যদিকে মুখ করে নামায পড়ছিল। তোমরা তো আশ্চর্য লোক! নিজের ধর্ম সম্পর্কে তোমাদের এতটুকুও জ্ঞান নেই। ঐ বদনসীবের তথ্যও ছিল অদ্ভুত। সে বলত, পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধ হয় ৭৪’এ। তাতে অনেক লোক বন্দী হয়।

বন্দীদের ক্যাম্প আমি পরিচালনা করতাম। ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ৮০ লাখ ছিল, এখন ৭ কোটি হয়েছে। সে আমাদের নিকট তার জীবনের নোংরামী খুলে খুলেই শুধু নয় বরং অতিরঞ্জিত করে বলত। আমরা লজ্জিত হতাম। কিন্তু কাল আমি যখন ইণ্ডিয়ার সবচেয়ে সুনামের অধিকারী হিন্দু নেতা নরসীমা রাও এর প্রেমের দাস্তান বিবিসিতে শুনলাম, তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে, হিন্দু সমাজের ভদ্রতা ও পবিত্রতা নামক বস্তুতো শুধুমাত্র গঙ্গা ও যমুনা নদীর জন্যই উৎসর্গীত। পৃথিবীর বুকে যার নজির পাওয়া কঠিন।

সে যখন কথা বলত, তখন প্রত্যেক শব্দের পর মা-বোনকে গালি দেওয়া জরুরী মনে করত। আপনারা তার কথাবার্তার দুটি মাত্র লাইন প্রত্যক্ষ করুন। তার গালির জায়গায় ক্রস (*) চিহ্ন দিচ্ছি-

ইয়ার, আমাদের গভর্নমেন্ট বড় x, তোমাদের মত কথার ফুলঝুরিদের জন্য এখানে তিনশ’ x সেনাবাহিনীর লোক রয়েছে। আর আমরা ৭ জন x সিএমপির লোক রয়েছি। খাবার রান্না করার জন্য x পৃথক।

একবার বাবরী মসজিদ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। সে সাথে সাথে গল্প তৈরী করে ফেলল। সে বলতে লাগল, আমি অযোধ্যা যেতাম, আমি নিজে দেখেছি সেখানে মসজিদ ও মন্দির দুটোই ছিল। দুটো একেবারে পাশাপাশি এবং ছোট ছিল। একজন লোক

চাঁদা দিলে দুটোই বড় করা হয়, ফলে ঝগড়া শুরু হয়।

বাবরী মসজিদ নিয়ে ঝগড়ার এই কাহিনী সে ছাড়া হয়ত আর কারো জানা ছিল না। আমরা পাঁচ মাস তার মিথ্যার অকল্যাণ সহ্য করতে থাকি। কিন্তু তার স্থলে যাকেই পেয়েছি মিথু্যকই পেয়েছি। হিন্দুদের মধ্যে এত অধিক পরিমাণ মিথ্যা কেন, তা অন্য কোন সময় বলব ইনশাআল্লাহ। মোট কথা এই যে, সে পাঁচমাসে অসংখ্য মিথ্যা বলে। তার মধ্যে আমার যে কয়টা স্মরণ আছে সেগুলো লেখা হলেও রম্য রচনার একটি গ্রন্থ তৈরী হয়ে যাবে। তবে সে একটি সত্য কথাও বলেছে। সেই সত্যটি উল্লেখ করাই ইনসাফের দাবী। একদিন একটি সংবাদ আসে। সে এ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করছিল, তখন আমাদের একজন সাথী তাকে উত্তেজিত করার জন্য বললঃ জনাব এতে করে ইণ্ডিয়ার বড় দুর্নাম হবে। সে সহসাই বলে ফেললঃ ইয়ার, বদনাম তো তার হয়, যার কিছু সম্মান থাকে।

নানী বলে ফারসী কি নাম? কোথায় ধরা পড়েছো? কতগুলো সৈন্য মেরেছো তুমি? কত টাকা পেতে? এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে দিনরাত দিতে হত। আমরা ছোট ছোট পিঞ্জিরা সদৃশ সেলে বন্দী ছিলাম। আমাদের দর্শনার্থীদের সারি বেঁধে থাকত। প্রথমে সওয়ার হয়ে থাকত সান্ত্রীরা।
এরপর কোন অফিসার আসত। কোন কোন অফিসার

আমাদের দেখিয়ে নিজের বাহাদুরী ফোটানোর জন্য অন্য বন্ধু অফিসারকেও ডেকে আনতো। দেখাতো যে, আমরা এমন ভয়ানক সন্ত্রাসী পাকড়াও করেছি। এই পরিস্থিতির কারণে আমরা এতই বিরক্ত ও ক্ষুন্ন ছিলাম যে, আমাদের নিকট চিড়িয়াখানার পশুও ভাল মনে হচ্ছিল। তারা নির্বাক হওয়ার কারণে তামাশাকারীদের মতামত শোনা থেকে নিরাপদ থাকে। আমাদের দুরাবস্থা ছিল সেই পশুদের মত বা তার চেয়েও অধিক। উপরন্তু আমাদেরকে তাদের প্রশ্নের উত্তরও দিতে হত। নির্বোধদের কথাও শুনতে হত। একবার তো এরা সীমা ছাড়িয়ে যায়।

ইণ্ডিয়ান আর্মির এক অফিসার মহিলাদেরকেও সাথে নিয়ে আসে। সেই মহিলারাও সম্ভবত অফিসার ছিল। তাদের সাক্ষাতের সময় আমরা দৃষ্টি অবনত করে দাঁড়িয়ে থাকি। আমরা তাদের কোন কথার উত্তর দেইনি। তারা নিরাশ ও ক্রোধান্বিত হয়ে চলে যায়। আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করি। সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত এবং তা বাস্তবায়ন শুরু হয়। তারপর এক সেল থেকে বিড়ালের, দ্বিতীয়টা থেকে ছাগলের, তৃতীয়টা থেকে ঘোড়ার এবং চতুর্থটা থেকে অন্য কোন পশুর আওয়াজ আসতে থাকে। সান্ত্রীরা দৌড়ে আসে। তারা থামানোর পূর্ণ চেষ্টা করে। কিন্তু এটাতো কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত ছিল। প্রত্যেক সাথী চোখ বন্ধ করে মনোযোগ দিয়ে

তার সামর্থ্য মাফিক কোন না কোন শব্দ করছিল। অবশ্য আমার মত আনাড়ি নীরব ছিল।
কিন্তু অন্তর তাদের সাথে শরীক ছিল। সান্ত্রীরা অফিসারদেরকে জানায় যে, পাকিস্তানী সন্ত্রাসীরা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ করছে। তখন অফিসার নিজেই চলে আসে। এখানে তখনো অবিরাম শব্দ চলছিল। সে এসে জিজ্ঞাসা করে—একি হচ্ছে? উত্তর পায়— আগে সারাদিন পুরুষ আসত, আজ মহিলারাও এসেছে। এটি যেন চিড়িয়াখানা, আর আমরা তার পশু। এখন আমরাও পশুর ডাকই ডাকব। চাই যেই আসুক না কেন?

মোটকথা এই ধারা চলতে থাকে। একজন সান্ত্রী মনে করে যে, এরা আমার সাথে ঠাট্টা করছে। আমার সাথেরই সেলে একজন সাথী খুব দক্ষতার সাথে ছাগলের মত ডাকত। আল্লাহর ইচ্ছা, যাকে যেমন ইচ্ছা বৃষ্টি করেন। সান্ত্রীটি শব্দ শুনে ভয় পেয়ে যেত। একবার সে অফিসারকে সাথে নিয়ে আসে। অফিসার এসে আমাকে বলে, এই সান্ত্রীটি তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। একথা বলে সে সান্ত্রীর দিকে তাকায়। সান্ত্রীটি বলে—স্যার! এ আমাকে বকরী বলে। আমার সাথী বলে, জনাব আপনি তার দিকে নিজেই তাকিয়ে দেখুন—এতো আস্ত মানুষ। কে বলেছে এ বকরী। আমি কি তাকে বকরী বলতে পারি। অফিসারটি সান্ত্রীর মুখের দিকে তাকালে তারই হাসি পেয়ে যায়। সে তার হাসি নিয়ন্ত্রণেরও চেষ্টা করছিল এবং

প্রভাবও ঠিক রাখতে চাচ্ছিল। সুতরাং সে তাদের উভয়ের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বলে, হাঁ, ভাই! আপনি বলুন কি হয়েছে। আমি বললাম, সান্ত্রীর খামোখা সন্দেহ হয়েছে। এমন কিছু তো হয়নি।

এবার বাদ দিন এসব কথা। আমাদের দর্শনার্থীদেরও তাদের প্রশ্নের বিষয়ে কথা চলছিল। প্রত্যেক আগন্তুক শেষ প্রশ্ন করত এই যে, খাবার মিলে কি? আমরা বলতাম, জ্বি হাঁ মেলে। তাহলেই তার অবস্থা পাল্টে যেত। কেউ প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আর্ট দেখাত। কেউ উভয় হাত কোমরের উপর রাখত। আর সবারই এক কথা, এটি আমাদের হিন্দুস্থান। শত্রুদেরকেও খেতে দেয়। পাকিস্তানে আমাদের কয়েদীদেরকে খেতে দেয় না। আমাদের এখানে নিয়মনীতি আছে। আমরা সকলকে মানুষ মনে করি।

মোটকথা এক দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু হয়ে যেত। বিষাদগ্রস্ত অন্তর আর ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে আমরা তা শুনতাম। কারণ, সেখানকার খাবার, খাওয়ার যোগ্য ছিল না। অনেকে আবার “খাবার মেলে?” একথা জিজ্ঞেস করেই ইণ্ডিয়ার উদারতার উপর দীর্ঘ এক বক্তৃতা ঝাড়তে থাকে। কেউ এটিও জিজ্ঞাসা করত যে, খাবার কেমন হয়? আমরা কখনো একথা চিন্তা করে যে, খানার কি দোষ বলব, উত্তর দিতাম, ভালই হয়। তখন সে পূনরায় স্বগর্বে বক্তৃতা শুরু করে দিত। কিন্তু কখনো কখনো

আমরা বিরক্ত হয়ে বলতাম, এগুলো তো জানোয়ারও খেতে পারে না। তখন তাদের ধরন পাল্টে যেত। বলত , আমরা কি তোমাদেরকে নিজের পকেট থেকে খেতে দেব ? সরকার যা দিয়েছে তাই তোমাদের খেতে হবে। প্রত্যেক দিন এই তামাশা চলত। আমরা খাবারের দোষ না বললেও ভারতের প্রশংসা শুনতে হত। আর দোষ বললে উত্তর মিলত , আমরা কি করব? আমরা কি নিজের পকেট থেকে দেব। আমরা মনে মনে ভাবতাম , আল্লাহর শোকর যে , এরা ভাল খাবার দেয় না। কারণ বালুতে ভরা রুটি আর পানিতে সিদ্ধ খারাপ সবজি দিয়েই যখন এই মুশরিকরা এমন খোটা দিচ্ছে , তাহলে ভাল খাবার দিলে তো তাদের কত কথাই না শুনতে হবে। পরের দিন একজন মুশরিক যখন প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দক্ষ শিল্পীর মত খানা দেওয়ার জন্য ইণ্ডিয়ার প্রশংসা করতে থাকে , তখন আমি মনে মনেই উর্দুর সেই প্রবাদ □□□□□□-

دو ماش□ کی آرسی
نانی بول□ فارسی-
(দো মাসে কি আরসী ,
নানী বোলে ফারসী)।

(এই প্রবাদ এমন ব্যক্তির জন্য বলা হয় , যে সামান্য উপকার করে সীমাহীন খোটা দিয়ে থাকে)।

ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার

আমীরুল মুজাহিদীন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার দামাত বারাকাতুহুম দীর্ঘ ছয় বৎসর চব্বিশ দিন ভারতীয় কারাগারে বন্দী থাকার পর অলৌকিকভাবে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর সর্বপ্রথম পাক্ষিক ‘জায়শে মুহাম্মাদ’

পত্রিকাকে দেওয়া (গুরুত্বপূর্ণ ৪৪টি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর সম্বলিত) ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আপনার পরিচয়? মাওলানা মাসঊদ আযহার: আমি আল্লাহ তাআলার অতি নগণ্য এক বান্দা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। আমার মাতাপিতা আমার নাম রেখেছেন মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): জিহাদের সঙ্গে আপনার কখন কিভাবে সম্পর্ক হয়?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, আল্লামা বিন নূরী টাউন, করাচীতে অধ্যয়ন কালে আমি সর্বপ্রথম জিহাদের ডাক শুনতে পাই। তখন পাকিস্তানের কিছু মুজাহিদ আফগানিস্তানে যান। তারা জামেয়ারই ছাত্র ছিলেন। সেখানে গিয়ে মাওলানা এরশাদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)এর ‘তাহরিকের’ (আন্দোলনের) সাথে মিলিত হন। আমি যে সময় প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, তখন একবার জানতে পারি যে, জামেয়ার পুরাতন ছাত্রাবাসের ৩২ নম্বর কক্ষে একজন মুজাহিদের বয়ান হচ্ছে। আমি সেখানে গিয়ে দেখি, অত্র জামেয়া থেকেই শিক্ষা

সমাপনকারী, পাঞ্জাবের রহীম এয়ার খান নামক জায়গার একজন মুজাহিদ বয়ান করছেন। তার নিকট থেকে জিহাদের কথা আমি প্রথমবার শুনি। তিনি বলছিলেন যে, আপনারা শীত থেকে বাঁচার জন্য শীত বস্ত্র সঙ্গে রাখবেন। অমুক ধরনের কোর্ট রাখবেন। গরম চাদর সাথে নিবেন। তারপর আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তার এ কথাগুলো আমার কাছে খুব ভাল লাগে। তাছাড়া আপনারা জানেন, মাদ্রাসায় থাকাকালে আমাদেরকে যা কিছুই পড়ৃানো হয়, তার মধ্যে জিহাদের সুস্পষ্ট আলোচনা থাকে, তাই কোন দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের তালিবে ইলমের নিকট জিহাদ অপরিচিত কিছু নয়। তবে জিহাদের প্রশিক্ষণের এসব কথা শুনে অন্তরে একপ্রকারের পুলক অনুভূত হয়। তারপর সে সময়ের সংগঠনগুলো কিছু কিছু মাদ্রাসায় জিহাদ বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা করে। আমি তার বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এবং জিহাদ বিষয়ে বক্তব্য রাখি। আমি সে সময় তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম।

তারপর যখন আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন হযরত মুফতী আহমাদুর রহমান সাহেব (রহঃ) প্রথমবার মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ছাত্রদেরকে আফগানিস্তান পাঠান। সম্ভবত এর কিছুদিন পূর্বেই মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর সাথে তার সাক্ষাত হয়েছিল। তখন তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয় যে, তিনি

ছাত্রদেরকে জিহাদে পাঠাবেন। তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাতে অংশগ্রহণ করবে। তারপর থেকে বিননূরী টাউনে জিহাদের আলোচনা জোরেশোরে চলতে থাকে। আমি নিজেও জিহাদে যাওয়ার পূর্বে আমার বংশের কিছু লোককে জিহাদে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেই। তাদের মধ্যে আমার কয়েকজন ভাইও ছিল। তারা আমার পূর্বে সেখানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে। তবে ছাত্র যামানায় পড়াশুনার দিকে প্রবল ঝোক থাকার কারণে এবং আমার মুর্শিদ হযরত মাওলানা মুফতী ওলী হাসান সাহেব (রহঃ) বেশির ভাগ সময় অধ্যয়নের কাজে অতিবাহিত করার জন্য আমার উপর চাপ প্রয়োগ করার ফলে কার্যত তাতে অংশগ্রহণ করতে পারিনি।

আমি দাওরা হাদীসের পরীক্ষা দেওয়ার পর ফল প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। এজন্য আমি অনেক পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিতেছিলাম। পূর্বেই জিহাদের উপযুক্ত পোশাক তৈরী করে নেই। আরো অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করি। তারপর হযরত মাওলানা মুফতী আবদুস সামী শহীদ (রহঃ)এর পরামর্শে আফগানিস্তান চলে যাই। সর্বপ্রথম এক সপ্তাহ খোস্ত অঞ্চলে অতিবাহিত করি। সেখানেই আমি নিয়্যাত করি যে, ইনশাআল্লাহ আমি সারাজীবন জিহাদের সাথে জড়িত থাকব। এ সময় মুজাহিদ ক্যাম্পে আমি কয়েকটি বয়ান করেছিলাম। সেগুলো মুজাহিদদের মধ্যে ‘জিহাদের

দাওয়াত’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেগুলো দ্বারা মানুষের-উপকারও হয়। তার অনেকগুলো ক্যাসেট বের হয়।

আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসার পর আমি নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিহাদের সাথে জড়িত হই এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। মুজাহিদদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ‘সদায়ে মুজাহিদ’ নামে একটি পত্রিকাও বের করি। এমনিভাবে জিহাদের অন্যান্য দায়িত্বের সাথেও জড়িত হই। এভাবে দাওরা হাদীস থেকে ফারেগ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা জিহাদের সাথে নিয়মতান্ত্রিক ও কার্যতভাবে আমার সম্পর্ক জুড়ে দেন। যা এখনও পর্যন্ত কোন না কোনভাবে অব্যাহত আছে। আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করি, যেন মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদের সাথে সম্পর্ক ঠিক থাকে। আমার কোন ত্রুটির কারণে যেন আল্লাহ তাআলা কখনও আমাকে এ মহান আমল থেকে বঞ্চিত না করেন।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): জিহাদের পথে আপনার প্রশিক্ষণ ও দীক্ষার কাজে কার কার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: মানুষের জীবন গঠনে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন লোকের ভূমিকা থাকে। কিন্তু আমার এ ব্যাপারে শুরু থেকেই একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা রয়েছে। আমার জীবনে অভিজ্ঞতা যত বাড়ছে

আমার সে বিশ্বাসও অতীব দৃঢ় হচ্ছে, আর তা এই যে, যতক্ষণ কোন মানুষের ঈমানের সাথে মৃত্যু না হবে এবং আল্লাহর নিকট কামিয়াব হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় না নিবে, সে সময় পর্যন্ত তার ব্যাপারে কোন প্রকারের মন্তব্য করতে হলে খুবই সতর্কতার সাথে করতে হবে। তাই যেসব ব্যক্তিত্ব এখনও জীবিত আছেন, আমি তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের ঈমানকে নিরাপদ রাখুন এবং তাদের সকলকে জিহাদের উপর কায়েম রাখুন। তবে আমার যেসব বন্ধু ও সাথী শহীদ হয়েছেন, তাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাদেরকে আমি কখনই ভুলতে পারব না এবং তাদের স্মরণ থেকে আমার অন্তর শূন্য হওয়া কখনই আমার মন মেনে নেবে না। আমার স্বভাবের মধ্যে তাদের বিরাট প্রভাব রয়েছে। বরং তাদের স্মরণ ও তাদের পবিত্র খুন অত্যন্ত জটিল মুহূর্তেও আমার জন্য সাহস ও আশার সঞ্চার করে।

সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব, যার দ্বারা আমি খুব বেশি প্রভাবিত হই, আমার টুটাফাটা জিহাদী জীবনের উপর যার প্রভাব সবচেয়ে বেশী, যার নিকট থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, তিনি আমাদের কমাণ্ডার আবদুর রশীদ ভাই (রহঃ)। তিনি খোস্তেই শহীদ হন। আর সর্বশেষ ব্যক্তি, যার কথা তীব্রভাবে আমার স্মরণ হয়, তিনি আমার অতি পুরাতন সাথী, বন্ধু ও সহচর কমাণ্ডার সাজ্জাদ শহীদ (রহঃ)। এ

দু’জন ছাড়াও শহীদদের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি রয়েছে। তাদের মধ্যে পাকিস্তানী, আফগানী ও আরবের এমন অনেক সাথী আছেন, যাদের কথা আমার স্মরণ আছে এবং স্মরণ থাকবে, ইনশাআল্লাহ। তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর মকবুল, তাদের পথে আল্লাহ পাক আমাকে চলার তাওফীক দান করুন।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): বন্দী হওয়ার পূর্বে আপনি সাংবাদিকতার লাইনে কি কি কাজ করেছেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আমার জন্য সাংবাদিক শব্দটি সম্ভবত আমার বন্দী হওয়ার পর অধিক প্রসিদ্ধ হয়। অন্যথা প্রকৃতপক্ষে আমি মাদ্রাসার একজন তালিবে ইলম। আল্লাহ তাআলা আমাকে জিহাদের সাথে নিসবত দান করেছেন। কোন কোন উস্তাদের বিশেষ দৃষ্টিদানের ফলে আমার মধ্যে লেখার আগ্রহ জন্মে। আমি বার বছর বয়সে যখন ‘জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া’তে পড়তাম, তখন আমার একজন মুহতারাম উস্তাদের উৎসাহদানে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর জীবনী নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধটি তিনি দৈনিক ‘জঙ্গ’ পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন। আমার জন্য এটি বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, জীবনের প্রথম প্রবন্ধ এমন মহান ব্যক্তিত্বের উপর হয়েছে।

উপরন্তু আমার মুহতারাম উস্তাদের অনুগ্রহ যে, তিনি সাহস বৃদ্ধি করার জন্য প্রবন্ধটি

দৈনিক ‘জঙ্গ’ পত্রিকায় প্রকাশ করান। তারপর থেকে মনমগজে এই বিষয়টি বসে যায় যে, নিজের মনের ভাব লিখে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য ছাত্র যামানায় আমরা পাঁচজন তালিবে ইলম মিলে একটি ইসলাহী কমিটি (শুদ্ধি সংঘ) গঠন করি। এই কমিটির লক্ষ্য ছিল পরস্পরের সংশোধনের ফিকির করা। কোন ভুলত্রুটি দেখতে পেলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করা। কারণ, হাদীসের বর্ণনা মতে, “মুমিন মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ।” সাথীরা এই কমিটির পরিচালনার ভার আমার উপর চাপিয়ে দেয়। এখানে প্রসঙ্গত একথাও উল্লেখ করছি যে, এই ইসলাহী পদক্ষেপের প্রভূত বরকত প্রকাশ পায়। সেই কমিটির বেশির ভাগ সদস্য আজ জিহাদের পবিত্র পথে অবিচল আছেন। আলহামদুলিল্লাহ! সেই কমিটির মাধ্যমে আমরা প্রবন্ধ লেখার ধারা আরম্ভ করি। আমি বিষয় বন্টন করে দিতাম। আর সকলে সেই বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখত। তারপর কোন কোন পত্রিকাতেও আমার লেখার সুযোগ হয়। আমি যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন হারামাইন শরীফাইন (পবিত্র মক্কা-মদীনা) থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দিল্লী কলোনীর একজন বুযুর্গ বন্ধুবর হাজী খলীল সাহেবের পীড়াপীড়িতে হজ্জের মাসআলা সংক্রান্ত ছোট একটি পুস্তিকা লিখি। আনমূল তুহফা (অমূল্য উপহার) নামে তা প্রকাশ পায়। আমার মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ মুখতার শহীদ (রহঃ)

আমার এই লেখাটির বহু জায়গা সংশোধন করেন। সে সময়ই আমি কতগুলো সংস্কারমূলক প্রবন্ধও লিখি, যা হ্যাণ্ডবিল আকারে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়।

তার মধ্যে একটি ছিল দাড়ি বিষয়ক। এটি প্রচুর পরিমাণে ছাপা ও বিলি করা হয়। এতদ্ব্যতীত আকীদা সংক্রান্তও কতগুলো প্রচারপত্র ও হ্যাণ্ডবিল সাথীরা প্রকাশ ও প্রচার করে। সে সময় সাপ্তাহিক ‘খতমে নবুওয়াত’ পত্রিকাতেও আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। কিছুদিন পর আল্লাহ তাআলা ‘সাদায়ে মুজাহিদ’ পত্রিকা বের করার তাওফীক দেন। পত্রিকাটির কোন কর্মচারী বা সহযোগী ছিল না। ফলে অনেক সময় আমাকে আট নয়টি করে প্রবন্ধ লিখতে হত। এভাবে ‘সদায়ে মুজাহিদ’ পত্রিকাতেই আমার বেশির ভাগ প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। তারপর প্রবন্ধ লেখার এই ধারা অব্যাহত থাকে। কয়েকটি কিতাবও লিখি। কয়েকটি সাক্ষাৎকারও আরবী পত্রিকায় বের হয়। মোটকথা আল্লাহ তাআলা কলম ও কাগজের সাথে আমার যেই সম্পর্ক স্থাপন করে দেন, তা বেশ তৎপর থাকে। বিশেষত বিমানের সফরে প্রবন্ধ লেখাই হত আমার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এখন ‘জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’ ও ‘যরবে মুমিন’ পত্রিকায়ও লেখার তাওফীক হচ্ছে।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): সাদায়ে মুজাহিদ ও আপনার দাস্তান আপনার মুখে শুনতে চাই।

মাওলানা মাসঊদ আযহার: কতক বস্তু এমন থাকে, যার সঙ্গে আদর্শগত সম্পর্কের সাথে সাথে ভালবাসার সম্পর্কও থাকে। এমনিভাবে ‘সাদায়ে মুজাহিদ’ও আমার হৃদয়ের স্পন্দন বৃদ্ধিকারী একটি শব্দ। কারণ, আমি এটিকে সন্তানের মত ভালবাসতাম। তাই আমি হারাম শরীফের সফরে ‘মুলতাজাম’কে বুকে জড়িয়ে ধরে এই পত্রিকার জন্য অনেক দুআ করেছি। আমি পত্রিকাটির জন্য অনেক মেধা ও শ্রম ব্যয় করি। চেষ্টা করতাম যে, এর একটি শব্দও যেন বিনা উযুতে লেখা না হয়। মুসলমানরা যেন এ থেকে অধিকহারে চিন্তার খোরাক পায়। সাদায়ে মুজাহিদের সাথে আমার এই সম্পর্ক, আলহামদুলিল্লাহ খুব দৃঢ় ছিল। যার দরুন সে সময় পত্রিকাটি এত মকবুল হয় যে, ইউরোপের কয়েকটি দেশের সফরে সেখানকার উর্দু শিক্ষিত কিছু নও মুসলিম সাথীকে ‘সাদায়ে মুজাহিদ’ এর অনেক প্রবন্ধ ইংরেজীতে অনুবাদ করে বিনামূল্যে বিতরণ করতে দেখতে পাই। এতে কোনরূপ অতিরঞ্জন নেই যে, পত্রিকাটির দায়িত্ব একা আমার উপর ছিল বলে আমি তার কাজের জন্য সময় বের করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করতাম।

যখন মুজাহিদদের মধ্যে ঐক্য হয় এবং একটি প্লাটফর্ম সৃষ্টি হয়, তখন সম্মিলিত এই

জামাআতের মুখপত্র কোন পত্রিকা হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। আমি তখন সহজাত ভালবাসার কারণে ‘সাদায়ে মুজাহিদের পক্ষে পূর্ণ সমর্থন জানাই। আলহামদুলিল্লাহ, উপদেষ্টা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে এটিকে মুজাহিদদের মুখপত্ররূপে গ্রহণ করেন। যা আমার জন্য অত্যধিক আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। যখন পত্রিকা অফিস করাচী থেকে ইসলামাবাদ স্থানান্তরিত করা হয়, তখনও আমি নিয়মিতভাবে সম্পাদকীয় লিখে করাচী থেকে ইসলামাবাদ পাঠিয়ে দিতাম। আমার স্মরণ আছে যে, আমি ভারত যাওয়ার মাত্র একদিন পূর্বে সোমালিয়ার পরিস্থিতির উপর সম্পাদকীয় লিখে ইসলামাবাদ পাঠিয়ে দিয়ে ভারত রওয়ানা হয়ে যাই। সেখানে গিয়ে সাদায়ে মুজাহিদের কথা খুব স্মরণ হত। সুতরাং আমি কারাগারে থাকতে এর স্মরণে ‘পিয়ারে সাদায়ে মুজাহিদ’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধ পাঠ করে ‘সাদায়ে মুজাহিদের’ সঙ্গে আমার এত অধিক পরিমাণ ভালবাসা দেখে সাথীদের চোখেও পানি এসে যায়। কারণ, তারাও উপলব্ধি করত যে, ‘সাদায়ে মুজাহিদের’ বিচ্ছেদে আমার মনোব্যথা কত।

বন্দীকালীন সময়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ‘সাদায়ে মুজাহিদের’ সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন থাকে। তিহার কারাগারে যাওয়ার পর লেখালেখি যখন কিছুটা সহজ হয়, তখন তার

সাথে আমার যোগাযোগ হয় এবং আমি কিছু প্রবন্ধও পাঠিয়ে দেই। তার মধ্যে ‘মা আহাল কা কমজোর মোহ’ (অযোগ্যের দুর্বল আতুরী) নামে একটি সম্পাদকীয়ও শামিল ছিল ‘সাদায়ে মুজাহিদের’ এই কপি কোন এক পন্থায় আমার নিকট কারাগারে পৌছে, আমি দেখি, তাতে সম্পাদকরূপে আমার নাম লেখা রয়েছে। আমি তখন একজন দায়িত্বশীল মুজাহিদের নিকট এ ব্যাপারে একটি পত্র লিখি। আমি তাতে লিখি যে, শরীআতের দৃষ্টিতে সম্পাদকের দায়িত্ব, সম্পূর্ণ পত্রিকা তার দেখা ছাড়া যেন প্রকাশ না পায়। এই দায়িত্ব সম্পাদন করা যেহেতু আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাছাড়া জিহাদ ও জিহাদের কোনও কাজ, কোন ব্যক্তির মুখাপেক্ষীও নয়, বিধায় এ দুটি বিষয়কে সামনে রেখে অনুগ্রহপূর্বক পত্রিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়া হোক। পত্রটি আমি কারাগার থেকে পাঠিয়ে দেই এবং তা মুজাহিদদের যিম্মাদারের হাতে পৌঁছে। কিন্তু সম্ভবত বিভিন্ন কারণে প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে আমার মুক্তির দিন পর্যন্ত তাতে সম্পাদকরূপে আমার নামই লেখা হতে থাকে।

‘জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’ পত্রিকা প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের সঙ্গে ‘সাদায়ে মুজাহিদের’ ব্যাপারে আলোচনা হয়। পত্রিকার

ডিক্লারেশন নেয়া ছিল হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ জামিল খান সাহেবের নামে। তিনি মুলতানে খতমে নবুওয়তের কনফারেন্স চলাকালে লিখিতভাবে ঘোষণা করেন যে, ‘সাদায়ে মুজাহিদকে’ তার হারানো সম্পাদকের নিকট পৌছিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব ছিল, বিধায় আমি তা তার হাতে অর্পণ করছি। কিন্তু অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার বিষয় হতে দূরে থেকে ইতিবাচক কাজ করা আমার নীতি। সুতরাং এই মূলনীতি ও চিন্তাধারার কারণে ‘সাদায়ে মুজাহিদ’ থেকে এখনও আমার বিচ্ছেদকাল চলছে। আমার জানা নেই, এ বিচ্ছেদ স্থায়ী নাকি সাময়িক।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): ইসলাহে নফস (আত্মশুদ্ধি) বিষয়ে আপনার কোন কোন বুযুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আত্মশুদ্ধি করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। কোন মুসলমানের জন্য এ থেকে অমনোযোগী হওয়া ক্ষতিকর। আমি আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও ছাত্র যামানা থেকে কোন কোন উস্তাদের বিশেষত শহীদ মুফতী আবদুস সামী সাহেব (রহঃ)এর বিশেষ দৃষ্টি ও অনুকম্পার বরকতে আত্মশুদ্ধির দিকে মনোযোগী হই। আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন হযরত আকদাস মাওলানা মুফতী ওলী হাসান (রহঃ) সাহেবের

নিকট বাইয়াতের জন্য দরখাস্ত করি। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি যে, আমার মুহতারাম নানা আলহাজ মুহাম্মাদ হাসান চুগতায়ী সাহেব পবিত্র হারামে অবস্থান করা সত্ত্বেও ছাত্র যামানায় আমার উপর কড়া নজর রাখতেন। অবিরত চিঠিপত্র লিখে আমাকে দিক নির্দেশনা দান করতেন। আমি যখন আমার বাইয়াত হওয়ার ইচ্ছা সম্পর্কে তাকে অবহিত করি, তখন তিনি চরম অসন্তোষ ও ক্রোধ প্রকাশ করেন। তিনি বিস্তারিত একটি চিঠিতে প্রামাণ্যভাবে উল্লেখ করেন যে, আমাদের আকাবিরগণ তালিবে ইলমদেরকে বাইয়াত হতে নিষেধ করতেন। তিনি ইলম অর্জনের দিকে মনোযোগী হওয়ার এবং বাইয়াত প্রভৃতি থেকে বর্তমানে বিরত থাকা অধিক উত্তম বলে উপদেশ দান করেন।

আমার স্মরণ আছে যে, আমি সে সময় নানা সাহেবের নিকট কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী উত্তর লিখেছিলাম। তাতে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলাম যে, আমাদের আকাবিরগণ ছাত্র যামানায় বাইয়াত হতে নিষেধ করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। তবে সে যুগের এবং এ যুগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ, সে যুগে তালিবে ইলমকে ইলম হাসিল করার জন্য অনেক কষ্ট-সাধনা করতে হত। তাদের ইসলাহের জন্য যথেষ্ট হত। সে যুগে বড় বড় কিতাব অধ্যয়ন করতে হত। উস্তাদদের কড়া তত্ত্বাবধান ছিল। থাকা খাওয়ার ব্যাপারে

অনেক জটিলতা ছিল। স্বগৃহ থেকে বছরের পর বছর দূরে থাকতে হত। পক্ষান্তরে বর্তমান যামানায় ছাত্রদের ভাল থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তারা ডালের পরিবর্তে গোস্ত ও অন্যান্য জিনিস খেতে পায়। থালাবাটিও ধুতে হয় না। তাছাড়া অন্য কোন এমন মুজাহাদাও করতে হয় না, যার দ্বারা নফসের ইসলাহ হবে, বিধায় বর্তমান যুগে বাইয়াত হওয়াই অধিক সমীচীন।

আমার নানার সাথে বেশ কয়েকটি পত্রে এই বিতর্ক চলতে থাকে। অবশেষে তিনি অনুমতি দেন। অনুমতি পেয়ে আমি হযরত আকদাস মুফতী ওলী হাসান সাহেব (রহঃ)এর খিদমতে বাইয়াতের দরখাস্ত করলে তিনি হযরত আকদাস মুফতী আবদুস সামী সাহেব এর সুপারিশে মুরীদ করে নেন। যিকিরের পদ্ধতি বলে দেন। তারপর থেকে আমার ইসলাহী সম্পর্ক হযরতের সঙ্গে অব্যাহত থাকে। অবশেষে তিহার কারাগারে যাওয়ার পর স্নেহের ইউসুফ আযহারের একটি পত্র মারফত হযরত মুফতী সাহেবের ইন্তিকালের সংবাদ পাই। সংবাদ শুনে অত্যধিক দুঃখ ও আফসোস হয়, কারণ, আমার শায়েখের জানাযাও আমি কাঁধে নিতে পারিনি। তারপর বিভিন্ন বুযুর্গের সঙ্গে আমার ইসলাহী সম্পর্ক চলতে থাকে।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): জিহাদের দাওয়াত উপলক্ষ্যে আপনি কোন কোন দেশ সফর করেছেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: মহান আল্লাহর তাওফীকে অনেক দেশেই গিয়েছি। তার মধ্যে আরব দেশসমূহ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। কয়েকবার আফ্রিকায়ও গিয়েছি। এমনিভাবে ইউরোপেও সফর করেছি। সমরকন্দ ও বুখারা সফর করারও আমার সৌভাগ্য হয়েছে। কয়েকবার বাংলাদেশেও সফর করেছি। এভাবে আমার বহির্দেশের মোট সফর সংখ্যা ২৭শে গিয়ে পৌঁছে। বিভিন্ন সময়ে আমি এসব সফর করেছি।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডই প্রত্যক্ষ করেছেন, সেসব জায়গার মুসলমানদের অবস্থা এবং জিহাদের পরিবেশ কেমন পেয়েছেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আমার সফরসমূহ বেশির ভাগ জিহাদের জন্যই হত, বিধায় মুসলমানদের অবস্থা ও আবেগ উৎসাহের প্রতি আমার বিশেষভাবে নজর থাকত। সব জায়গাতেই এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা লাভ হয় যে, মুসলমানদের রক্তে জিহাদের ভালবাসা মিশে আছে। কিন্তু যেমনিভাবে অনেক সময় তোর কারণে রক্ত নষ্ট হয়ে যায়। তেমনিভাবে বিভিন্ন কারণে এবং বিশেষত জিহাদের দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে জিহাদের মুহাব্বত বেশ ক্ষীণ মনে হয়েছে। কিন্তু যখনই তাদের সামনে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তখনই তাঁরা সাথে সাথে সাড়া দিয়েছেন। আমার মনে আসে না যে, দীর্ঘ এই

সময়ে আমার লাখ লাখ মানুষের সাথে সাক্ষাত হয়েছে, তাদের কোন একজনও জিহাদকে অস্বীকার করেছে বা জিহাদের দাওয়াত কবুল করেননি, কিংবা গা বাঁচিয়ে চলে গেছেন। ফলে আমি অনুভব করেছি যে, মুসলমানদের মধ্যে সবসময়ই এই আবেগ উৎসাহ রয়েছে এবং একে কবুল করার যোগ্যতাও বিদ্যমান রয়েছে। আমাদেরই দুর্বলতা যে, আমরা দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত ত্ৰুটি ও শিথিলতা করেছি। কথা স্পষ্ট করে না বলে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্দাবৃত করে দাওয়াত দিয়েছি, ফলে মুসলমান জাগ্রত হয়নি। কিন্তু তাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট ও সোজা কথা বলা হলে তাদের ভিতরের জিহাদের সুপ্ত ভালবাসা জেগে উঠে। আলহামদুলিল্লাহ! সব জায়গায় এ ব্যাপারে বিরল ও বিস্ময়কর অবস্থা দেখতে পেয়েছি এবং তা দেখে আমি সীমাহীন অভিভূত হয়েছি।

বিশেষত ইউরোপের সফরকালে সেখানকার লোকেরা জানায় যে, জিহাদের দাওয়াত উপলক্ষ্যে এখানে যেই বিশাল ও সুশৃঙ্খল সমাবেশসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে, এমন সমাবেশ ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। এ ব্যাপারে আমি মানুষের আবেগ, উৎসাহ ও উক্তি বর্ণনা করতে শুরু করলে, নিশ্চয়ই তা বিরাট এক গ্রন্থ রচনার উপাত্ত হতে পারে। সেগুলোর বেশির ভাগ ঘটনাই আমার মনে গাঁথা রয়েছে। তাদেরকে আমার মুখ দ্বারা জিহাদের দাওয়াত দেওয়া

হচ্ছিল। এটি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে আমার কোন উৎকর্ষতা ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে বড় ধরনের যেসব পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি, তার সবই জিহাদের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া ছিল মাত্র। আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করছি। কারণ, তিনি আমার মত অযোগ্যকে এ ব্যাপারে সাময়িক মাধ্যম বানিয়েছেন। আমি অন্যান্য মুসলমানদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, তারা যেন জিহাদের দাওয়াতের কাজে কোনরূপ ত্রুটি না করেন। কারণ, মুসলমানগণ সর্বাবস্থায় এর প্রতীক্ষায় রয়েছে। যে ব্যক্তি স্বীয় জানমাল পেশ করে জিহাদের দাওয়াত দিবে এবং নিজেও তার উপর আমল করার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হবে, সে ইনশাআল্লাহ মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইতিবাচক উত্তরই পাবে এবং এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখতে পাবে, যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): কি কি লক্ষ্য সামনে রেখে আপনি কাশ্মীর সফর করেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আমার কাশ্মীর সফরটি ছিল প্রসঙ্গত, আর মূল সফর হয় সমগ্র ভারতের উদ্দেশ্যে। কারণ আমাদের লড়াই চলছিল ভারতের সাথে। ভারতই আমাদের প্রকৃত দুশমন। কাশ্মীর জিহাদের অগ্নিশিখা

সার্বিকভাবে ভারতকে গ্রাস করে চলছে। তাই কাশ্মীর আন্দোলনের সূত্রে আমি ভারত যাই। তারপর কাশ্মীর রণাঙ্গন অদূরেই ছিল বিধায় তাতে অংশগ্রহণ করা আমি নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করি। বন্ধুবর শহীদ কমাণ্ডার সাজ্জাদ (রহঃ) আমাকে কাশ্মীর আসার জন্য দাওয়াতও দিয়েছিলেন। আমি তার দাওয়াত কবুল করেছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতিও পরিশোধযোগ্য ছিল। তাছাড়া সংগঠনের যে দায়িত্ব আমি পালন করছিলাম, তার মধ্যে মুজাহিদদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য স্থাপন ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাশ্মীরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেই একতা ও সাম্যের ঘোষণা প্রদান ও পরিকল্পনা তৈরীর জন্য আমার সেখানে যাওয়াকে কল্যাণকর মনে করা হচ্ছিল। উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আমি কাশ্মীর সফর করি। তবে বাবরী মসজিদের যিয়ারত আমার এই সফরের বিরাট বড় একটি কারণ। যার বেশির ভাগ আলোচনা আমি বিভিন্ন প্রবন্ধে করেছি।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): বলা হয় যে, আপনি যে সংগঠনের সাথে জড়িত, তার অনুমতি ছাড়া কাশ্মীর সফর করেছিলেন। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আমীরের আনুগত্য জিহাদের অন্যতম একটি ফরয। সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ও সঠিক অনুভূতির অধিকারী কোন মুজাহিদই আমীরের অবাধ্য হয়ে নিজেকে

নিজে মৃত্যুমুখে ও শত্রুর ভীড়ে নিক্ষেপ করতে পারে না। আমার জানা নেই, কি উদ্দেশ্যে এসব কথা প্রচার করা হচ্ছে। অথচ সে সময় যারা দায়িত্বশীল ছিলেন, তাদের সকলেই বর্তমানে জীবিত আছেন। এতদ্ব্যতীত সে সময় ভারত ও কাশ্মীর সংক্রান্ত যেসব দায়িত্ব আমার উপর ছিল, সেগুলো কখনো আমি নিজের মুখে প্রকাশ করিনি। হয়ত এ কারণেই কারো এমন সন্দেহ হয়েছে। আমি তো এজন্য শোকর আদায় করি যে, এ ব্যাপারে আমার দ্বারা শরীয়তের কোন নিয়ম ভঙ্গ হয়নি।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আপনি আপনার এই সফরে ভারতেও গিয়েছেন, ভারতের অবস্থা কেমন দেখতে পেলেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আমি এই সফরের পূর্বে ভারতের অবস্থা বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। ভারতের অনেক লোক এবং মুজাহিদের সঙ্গে যোগাযোগও করেছি। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের অবস্থার উপরও আমার গভীর দৃষ্টি ছিল। তাছাড়া আমাদের শত্রুদেরকে চেনা, তাদেরকে বুঝা, তাদের অবস্থা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা এবং তার উপর কড়া নজর রাখাও জিহাদের একটি অংশ। কেননা, এরাই সেই ঘাতক, যারা প্রতিদিন আমাদের বিশ পঁচিশজন করে তরুণকে শহীদ করছে। আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।
আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করছে।

আমাদের মসজিদ ও পবিত্র স্থানসমূহ বিধ্বস্ত করছে। এ কারণেই আমি ভারত গিয়ে নতুন কোন জিনিসের সাথে পরিচিত হইনি। আলহামদুলিল্লাহ! ভারতের সার্বিক অবস্থাই আমার সম্মুখে ছিল, আর সেখানে অবস্থান করে যা কিছু করেছি তা আমি ‘খাঁচার ফাঁক গলিয়ে’ শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে লিখেছি। তবে কাশ্মীরের আন্দোলন চলছে, তাই সব কথা লেখা সম্ভব নয় এবং এ সম্পর্কে সব কথা ব্যক্ত করাও যাবে না। সতর্কতা ও সামরিক দাবীকে সামনে রেখে যা কিছু বলার মত আছে, আমি তা উল্লেখ করেছি।

ভারতের অবস্থা আমি যেমনটি শুনতাম সেখানে গিয়ে তেমনটিই দেখতে পেয়েছি। অর্থাৎ সেখানকার মুসলমানরা এখন জাগ্রত হচ্ছে। দাসত্বের যে ফাঁদে তারা আবদ্ধ ছিল, এতদিন তারা সে সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন ছিল না। তবে এখন তাদের মধ্যে দাসত্বের সেই ফাঁদ ছিন্ন করে বের হয়ে আসার চেতনা জাগ্রত হচ্ছে। সেখানে গিয়ে এর সত্যতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। মুসলমানরা সেখানে যে অস্থিরতার শিকার, তাও সেখানে খোলা চোখে দেখেছি।আর,এস,এস, ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৭০ বছরের পরিশ্রমের পর ভারতকে যেই হরিদ্রা ও গেরুয়া রঙ্গে রঞ্জিত করা হচ্ছিল, তার প্রদর্শনীও আমি সেখানে স্বচক্ষে দেখেছি। ভারতে মুসলমানদের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন করার জন্য তাদের

সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টাই তারা করছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে জাগ্রত হওয়ার যেই প্রবল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে তাতে আশার সঞ্চার হয়েছে যে, ইনশাআল্লাহ ভারতে তাদের ভবিষ্যত আলোক উজ্জ্বল হবে।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): কাশ্মীরে মুজাহিদদের সঙ্গে আপনি সময় কাটিয়েছেন, তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আমি কাশ্মীরে প্রবেশ করার পর বিমান বন্দর থেকেই আমার মস্তিষ্কে এই চিন্তা সওয়ার হয় যে, এখানে মুজাহিদরা কিভাবে কাজ করছে। চতুর্দিকে সেনা বাংকার, সর্বত্র টহলরত নিরাপত্তা বাহিনীর লোক এবং পদে পদে তাদের চেকপোষ্ট। নতুন কোন মানুষ এ কথার কল্পনাও করতে পারবে না যে, এই শহরে একটি লোকও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অস্ত্রসহ গমনাগমন করতে পারে। কিন্তু জিহাদ সর্বত্রই তার শক্তি প্রদর্শন করে থাকে। আমি মুজাহিদদেরকে সাধুবাদ জানাই যে, তারা মারাত্মক এই সামরিক তৎপরতার মাঝেও দুঃসাহসিকতা, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সাথে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে, শ্রীনগরের সেই ব্যস্ততম ও প্রসিদ্ধতম অঞ্চলসমূহে, যেখানে চতুর্দিকে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা জাল বিছিয়ে আছে। এমনকি সড়ক অতিক্রম করে আমার অবস্থান স্থলে পৌঁছা পর্যন্ত আমি শত

শত সৈন্য দেখেছি। আমি তাদের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেছি। আমি ঐ সময় খুবই বিস্মিত হই, যখন আমার পৌঁছার অল্পক্ষণ পরই কমাণ্ডার সাজ্জাদ আফগানী তার বারোজন সশস্ত্র দেহরক্ষী সহকারে সেই গৃহে প্রবেশ করেন এবং তারা ছাড়াও আরো অনেক মুজাহিদ সেখানে আসেন। তারপর আমরা সেখান থেকে সফর করি। তারপর ইসলামাবাদের—যাকে অনন্তনাগও বলা হয়, মুজাহিদদের সশস্ত্র দলের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাত হয়। আলহামদুলিল্লাহ! মুজাহিদরা অতি উচ্চ সাহসী। তারা এজন্য আনন্দিত যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিহাদের মত ফরজ কাজের জন্য তাদেরকে কবুল করেছেন। তবে কাশ্মীরের জিহাদে মুজাহিদদের জটিলতা রয়েছে সীমাহীন। তারা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন, যেন নিয়ন্ত্রণ রেখার অপরদিকে অবস্থানকারী লোকেরা মুজাহিদদের সহযোগিতা করতে কোনরূপ ত্রুটি না করেন। আল্লাহর জমিনে বিচরণকারী জীবন্ত এই ওলীগণ ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাদেরকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা আমাদের ঈমানের প্রমাণ এবং ঈমানের দাবী।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): ভারতের সৈন্যের হাতে আপনার বন্দী হওয়া নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু আজ পর্যন্ত এর প্রেক্ষাপট

পুরোপুরিভাবে কখনো জনসমক্ষে আসেনি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করুন।

মাওলানা মাসঊদ আযহার: হাঁ, এ কথা সত্য যে, আমার বন্দী হওয়ার ঘটনা পুরোপুরিভাবে জনসমক্ষে আসতে পারেনি। এর পিছনে কিছু কারণও রয়েছে। প্রথম কথা এই যে, গ্রেফতারীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিল মোট তিনজন। একজন অনন্তনাগ, অর্থাৎ ইসলামাবাদের অধিবাসী মুজাহিদ সাথী, শহীদ রইস ভাই (রহঃ)। তিনি সে সময় মুজাহিদদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং বিশেষ একটি বাহিনীর দায়িত্বশীলরূপে সেখানে কাজ করছিলেন। আর অবশিষ্ট হলাম আমরা দু'জন। অর্থাৎ কমাণ্ডার সাজ্জাদ সাহেব ও আমি। আমরা দুজনই কারাগারে ছিলাম আর রইস ভাই আমরা বন্দী হওয়ার অল্পদিন পরে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। আমরা তিনজন ছাড়া ঘটনাস্থলে এমন কেউ ছিল না, যে সঠিক অবস্থা মানুষের নিকট তুলে ধরতে পারে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে সকল মুজাহিদ রণাঙ্গন থেকে দূরে বসে রণাঙ্গনের অবস্থা লেখেন এবং মুজাহিদদের প্রচার এবং প্রকাশনার কাজ সম্পাদন করেন, তারা সাধারণত সেসব কথাই লিখে থাকেন এবং সেসব কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন, যা তাদের নিকট একাধিক সূত্রে এবং একাধিক পন্থায় পৌঁছে। তাদের নিজেদের রণাঙ্গনে যাওয়ার, সেখানকার অবস্থা প্রত্যক্ষ করার ও তা

অবহিত হওয়ার কষ্ট স্বীকার করার তাওফীক হয় না। ফলে সঠিক অবস্থা ও বিশুদ্ধ ঘটনাবলী তাদের নিকট পৌঁছতে পারে না।

তৃতীয় কারণ সেইটি, যা মুজাহিদদেরকে ব্যাপকভাবে তার আবর্তে নিয়ে নিয়েছে। তবে আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমানে মুজাহিদগণ তা থেকে ক্রমশ মুক্তি লাভ করছেন, তা হলো মুজাহিদদেরকে সর্বদা অপরাজেয়রূপে পেশ করার এবং তাদের শক্তি ও সামর্থ্যকে অস্বাভাবিক ও অতিমানবীয়রূপে জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রবণতা। ফলে কোন মুজাহিদ যুদ্ধ না করে বন্দী হওয়া অথবা অল্প সৈনিকের মোকাবেলা করতে করতে শহীদ হওয়াকে লজ্জাজনক ও দোষণীয় মনে করা হয়। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের শাহাদতবরণ বা বন্দী হওয়ার জন্য দুশমনের লক্ষ লক্ষ সৈনিকের সম্মুখে তাদেরকে দণ্ডায়মান করাতে হয়। যাতে করে জনসাধারণের মনে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যায় যে, কোন মুজাহিদকে একশ’ দু’শো সৈন্য গ্রেফতার করতে পারে না। সেজন্য এক লক্ষ, দুই লক্ষ বা তিন লক্ষ সৈন্য অবশ্যই হতে হয়। এ সকল অতিরঞ্জনের কারণেই জিহাদের অনুগামীদের অত্যধিক ক্ষতি হয়েছে এবং সঠিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর সমীক্ষাও মানুষের সামনে আসতে পারেনি। সবচেয়ে মারাত্মক এই যে, এর ফলে কিছু কিছু মুজাহিদের মধ্যে রিয়ার

(প্রদর্শন প্রবৃত্তি) মনোভাব দেখা দিয়েছে।

সুতরাং কারাগারের একটি ঘটনা আমার স্মরণ আছে যে, একটি সংগঠনের কয়েকজন মুজাহিদ, যারা দুশমনের মোকাবেলা করা ব্যতিরেকে চরম অসহায়ভাবে বন্দী হয়। তারা কারাগারের নির্যাতন ও অন্যান্য ধাপ অতিক্রম করে যখন একত্রিত হয়, তখন তাদের একজন অন্যান্য সাথীকে নসীহত করে যে, আমাদের এই ঘটনা মানুষের মধ্যে জানাজানি হলে আমাদের সংগঠনের বদনাম হবে। তাই আপনারা তাদেরকে বলবেন যে, সৈন্যদের সাথে আমাদের তীব্র মোকাবেলা হয়। দুশমন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর আমরা আহত হই। তখন আমাদেরকে তুলে নিয়ে বন্দী করে রাখে। তার অন্য সাথীরা এতে আপত্তি করে বলে, এ কথাতো মিথ্যা। বিষয়টি আমরা জানতে পেরে তাদেরকে একত্রিত করি এবং আবেদন করি যে, আপনারা এ জাতীয় ঘটনা বানিয়ে বলবেন না। কারণ, সাহাবায়ে কেরামও দুশমনের হাতে বন্দী হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন। তাই দুনিয়ার কেউই অপরাজেয় নয়। এসব কথায় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা সেই মুজাহিদদেরকে সংশোধন করে দেন। ফলে বিষয়টি তাদের বোধগম্য হয়। তারা মিথ্যা কাহিনী বলা থেকে তাওবা করে। তাই মুজাহিদদের সঠিক ঘটনা ও প্রকৃত অবস্থার সমীক্ষা তুলে ধরা উচিত। শত্রুদের

মোকাবেলা করা ছাড়াই গ্রেফতার হওয়া বা স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে গ্রেফতার হওয়া কিংবা অল্প কিছু লোকের সাথে মোকাবেলা করে গ্রেফতার হওয়াকে লজ্জাজনক মনে করা উচিত নয়। এসব বিষয় রণাঙ্গনের অবশ্যম্ভাবী অংশ। প্রত্যেক মানুষ নিজের দেহ ও নিজের শক্তিকে মেপে দেখে তারপর এসব ঘটনাবলী নিয়ে চিন্তা করলে সে নিশ্চিত লজ্জিত হবে যে, সীমাতিরিক্ত অতিরঞ্জন করায় জিহাদের মারাত্মক ধরনের ক্ষতি হয় এবং এর ফলে বহু ধরনের মন্দ স্বভাব জন্ম নেয়। আলহামদুলিল্লাহ! আহলে হক এসব জিনিস থেকে সর্বদা পবিত্র থাকেন।

যাইহোক, শহীদ কমাণ্ডার সাজ্জাদ (রহঃ) এবং তার সঙ্গে আমরা দু’জন ইসলামাবাদের একটি গ্রাম থেকে মুজাহিদদের সঙ্গে সাক্ষাত করে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সাজ্জাদ সাহেব তার সকল সশস্ত্র দেহরক্ষীকে বিদায় দিয়েছিলেন। তিনি একজন সাধারণ লোকের বেশে সফর করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে একজন সশস্ত্র সাথীকে সঙ্গে নিতে হয়। সম্মুখে অগ্রসর হলে সাধারণ ট্রাকে সেনাবাহিনীর একটি কনভয়ের মুখোমুখী হই। তারা পথচারীদেরকে থামিয়ে তল্লাশী করছিল। সেই তল্লাশীর সময় সাজ্জাদ সাহেব তার সেই মুজাহিদ সঙ্গীকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করেন। সে সৈনিকদের উপর একটি গ্রেনেড

নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে গ্রেনেডটি ফাটেনি। উপরন্তু সে দুইজন সৈন্যকে ধরাশায়ী করে তাদের আওতা থেকে বের হয়ে যায়। তার উপর তীব্র গোলাবর্ষণ করা হয় এবং সে আহত হয়। তবে ঐ অবস্থাতেই পালিয়ে যায়। সে সময় আমরা অটোরিক্সায় সফর করছিলাম। কারণ, আমাদের গাড়ী রাস্তায় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমাদেরকে নামিয়ে তল্লাশী করা হয়। সাজ্জাদ সাহেব দক্ষতার সাথে কাশ্মীরী ভাষা বলতে পারতেন। তিনি তাদেরকে নিশ্চিন্ত করেন যে, ঐ যুবকের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমি একজন ব্যবসায়ী আর ইনি হলেন আমার পীর সাহেব। সৈন্যরা নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদেরকে ছেড়ে দেয়। আমরা রিক্সায় বসে ফিরে যাচ্ছিলাম, এসময় হঠাৎ করে তাদের গাড়ী আমাদেরকে পূনরায় ঘিরে ফেলে এবং বলে যে, আপনারা আমাদের সঙ্গে চলুন। আমরা আরেকটু তদন্ত করে আপনাদেরকে ছেড়ে দেব। তাদের নিকট বেশ কয়েকটি গাড়ী ভরা সশস্ত্র সৈন্য ছিল। তাদের সাথে আমাদেরকে নিয়ে যায়। পথে পড়ে থাকা আমাদের বিকল গাড়ীটি তারা তল্লাশী করে, তার মধ্যে এমন কিছু জিনিস পায়, যার কারণে তাদের সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। এভাবে আমাদের গ্রেফতারীর ঘটনা ঘটে। পরিশেষে তারা আমাদেরকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তারা আমাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায় এবং আমরা পুরোপুরি বন্দী হই।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আপনারা কোন অঞ্চলে বন্দী হন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, শ্রীনগরের পরে একটি শহর রয়েছে। মুজাহিদরা শহরটিকে ইসলামাবাদ বলে, আর হিন্দুরা বলে অনন্তনাগ। সেখানকার দূরবর্তী একটি গ্রাম থেকে আমরা ইসলামাবাদ শহরে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমরা বন্দী হই।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আমরা শুনেছি যে, আপনাদেরকে বন্দী করার পর শহীদ সাজ্জাদ (রহঃ) আপনাকে মুক্ত করানোর জন্য নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: জ্বি হাঁ, সৈন্যরা আমাদেরকে নিয়ে যখন আমাদের গাড়ীর নিকট ফিরে আসে এবং তাদের সন্দেহ বেড়ে যায়, তখন তারা আমাদেরকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পের ফটকের নিকট পৌছে সাজ্জাদ সাহেব শেষ প্রচেষ্টা চালান। আমাদের দু'জনকে পৃথক পৃথক গাড়ীতে বেঁধে রাখা হয়েছিল। আমাকে আমার গাড়ী থেকে নামিয়ে সাজ্জাদ সাহেবের গাড়ীর নিকট নিয়ে আসা হয়। আমি দেখি যে, তার হাত বাঁধা রয়েছে, আর তার চোখে বিশেষ এক ধরনের দীপ্তি উদ্ভাসিত রয়েছে। তিনি জোরে জোরে বলছেন, সেই পীর সাহেবকেও নিয়ে আস এবং তোমাদের অফিসারকেও নিয়ে আস।

তার গাড়ীর সম্মুখে আমাকেও দাঁড় করানো হয়। এ সময় তাদের অফিসার সেখানে আসে। তখন সাজ্জাদ সাহেব প্রথমে আমাকে সম্বোধন করে বলেন, ‘পীর সাহেব! আমি আপনার উপর জুলুম করেছি, হয়ত আমি তারই শাস্তি পেয়েছি।’ তারপর সেই অফিসারকে বলেন, তোমাদের মঙ্গল হোক! তোমরা বিরাট সাফল্য লাভ করেছ, তোমরা হরকাতুল আনসারের প্রধান সেনাপতিকে গ্রেফতার করেছ।

একথা বলতেই অফিসারটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে স্যালুট করে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে। তিনি বললেন, আমি সাজ্জাদ। আপনি এই সাফল্যের জন্য পুরস্কৃতও হবেন। কিন্তু ইনি নিরপরাধ। আপনারা একে ছেড়ে দিন। আমি মুজাহিদদের জন্য চাঁদা আদায় করার উদ্দেশ্যে তাঁকে অপহরণ করেছিলাম। তাঁর অনেক ভক্ত রয়েছে। অফিসারটি বলল, ঠিক আছে, আমরা তাকে ছেড়ে দিব। তারপর আমাদেরকে পৃথক পৃথক গাড়ীতে রাখা হয়। সে সময় তারা খুব শ্লোগান দিচ্ছিল এবং নিজেদের সফলতার জন্য আনন্দ প্রকাশ করছিল। কিন্তু এতে তাদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় যে, এ সাজ্জাদ খান হলে তার সাথে তো সাধারণ কোন মানুষ থাকার কথা নয়। তাছাড়া এ লোকটিকে মুক্ত করানোর জন্য সে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে। তাহলে এর মধ্যেও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লুকিয়ে আছে। ফলে তারা আরো তদন্ত করতে থাকে এবং মারাত্মক

অত্যাচার করতে থাকে। পরিশেষে সময় পার হতে থাকে আর তারাও তথ্য উদঘাটন করতে থাকে। অবশেষে এজন্য তাদের আনন্দ আরো বেড়ে যায় যে, তারা অন্য যে একজনকে গ্রেফতার করেছে, সেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ একজন দুশমন।

শহীদ সাজ্জাদের জীবনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে, তিনি তার এক সঙ্গীর খাতিরে এত বড় কুরবানী দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমার ধারণা মতে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরে যুদ্ধরত ছিলেন। অনেক মুজাহিদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। ক্যাম্পে এমন অনেক গোয়েন্দা বর্তমান ছিল, যারা সাজ্জাদ সাহেবকে জানত। ক্যাম্পে যাওয়ার পর তার পরিচয় উদঘাটিত হতই। কিন্তু তার পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তিনি আত্মপরিচয় তুলে ধরে তার একজন সঙ্গীর মুক্তির জন্য শেষ চেষ্টা করেন। এ কাজটি নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের নিকট তার উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হবে। তার মধ্যে মুজাহিদদের যেসব সদগুণাবলী ছিল, এ ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): ইণ্ডিয়ান আর্মী আপনাদেরকে বন্দী করার পর সর্বপ্রথম আপনাদের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা দায়ের করে, নাকি নির্যাতন চালায়?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: বন্দী হওয়ার পর থেকেই মারাত্মক ও ভয়ানক নির্যাতন আরম্ভ

করা হয়। আমাদের উভয়কে পৃথকভাবে নির্যাতনের লক্ষ্য বানানো হয়। পরবর্তীতে আমরা যেসব তথ্য জানতে পারি, তাতে অবগত হই যে, তারা আমাদেরকে প্রথম ক্যাম্পেই হত্যা করতে চেয়েছিল এবং প্রচার করতে চেয়েছিল যে, সংঘর্ষের সময় আমরা নিহত করেছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ভীতি সওয়ার করে দেন। আর সেই ভীতি সৃষ্টি হওয়ার বড় একটি কারণ, সে সময়ের ইসলামাবাদের জেলা কমাণ্ডার, আমার পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সাজ্জাদ সাহেবের অতি ঘনিষ্ঠ সহচর শহীদ সেকেন্দার ভাই। ভীতি সঞ্চারের পিছনে তার বীরত্বের বিরাট ভূমিকা ছিল। আমরা বন্দী হওয়ার সাথে সাথেই তিনি তার সকল মুজাহিদকে একত্রিত করে উন্মাদের ন্যায় আর্মীদের ক্যাম্পসমূহে আক্রমণ আরম্ভ করেন। ফলে সমগ্র কাশ্মীরে আন্দোলন তীব্রভাবে উত্তপ্ত হয়ে যায়। সে সময় মুজাহিদগণ অগ্র-পশ্চাত ভেবে চতুর্দিক থেকে আর্মীদের উপর অগ্নিবর্ষণ শুরু করে। সম্ভবত এটিই তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তারা মনে করে যে, এদেরকে মারা হলে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ আরো তীব্র আকার ধারণ করবে। আর এজন্যই তের দিন পর্যন্ত আমাদেরকে সংবাদ সংস্থা ও অন্যান্য সব কিছু থেকে দূরে রাখার পর অবশেষে তারা আমাদের বন্দী হওয়ার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। অন্যথায় তাদেরই একজনের কথামতে আমাদেরকে

ক্যাম্পেই হত্যা করার ইচ্ছা ছিল। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)।

এখানে প্রসঙ্গত আমি এ কথাটিও তুলে ধরছি যে, বহু মুজাহিদের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। আর সংঘর্ষকালে নিহত হয়েছে বলে প্রচার করা হয়েছে। সুতরাং তের দিন পর্যন্ত পত্রপত্রিকায় আমাদের খবর প্রকাশ না করা, আমাদেরকে সাংবাদিকদের সামনে পেশ করা এবং আমাদেরকে গ্রেফতার করার আনন্দ উদযাপন না করা এ সবকিছু উপরোক্ত কথার সত্যায়নে সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু তের দিন পর তারা আমাদেরকে শ্রীনগরে এনে সাংবাদিকদের সম্মুখে পেশ করে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমাদের গ্রেফতারীর ঘোষণা দেয়। তার দু একদিন পর আমাদেরকে শ্রীনগরের বাদামীবাগে অবস্থিত আর.আর. সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি ছিল একটি টর্চারিং সেন্টার। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কোন চার্জশিট দেওয়া হয়নি এবং আমাদেরকে কোন দোষে অভিযুক্তও করা হয়নি। এমনকি আইনানুগভাবে আমাদের নামও রেকর্ড করা হয়নি। বরং সাতমাস পর্যন্ত আমাদের কোন প্রকার আইনগত বৈধতা ছাড়াই সেই সেন্টারে আবদ্ধ রেখে নির্যাতনের লক্ষ্য বানানো হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্নজন এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে

থাকে। আর সর্বপ্রকার অমানবিক আচরণ সকল মুজাহিদের উপর করতে থাকে। তারপর আমরা যখন জানতে পারি যে, আমাদেরকে এখানে বেআইনীভাবে রাখা হয়েছে, তখন সাথীদের মধ্যে এক চেতনার ভাব জাগ্রত হয়। তারা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। যার ফলে আমাদেরকে জম্মুর কোটভালওয়ালের একটি জে আই সি (জয়েন্ট ইন্ট্রোগেশন সেন্টার)-এ আনা হয়। এ সময় আমাদের গ্রেফতারীকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে রেজিষ্টার করা তাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেখানে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। কারাগারের ভিতরে এক হাজারের মত মুজাহিদ মুক্ত অবস্থায় ছিল। তারা আমাদের সহযোগিতা করে। তারপর সুড়ঙ্গ খনন করার সিদ্ধান্ত হয়। সুতরাং আমরা সেখানে তিন মাস রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া অবস্থান করি।

তৃতীয় মাসে তারা আক্রমন করে আমাদেরকে সেখান থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসে। প্রায় ১ মাস পর্যন্ত আমরা বিছানায় শুতে পর্যন্ত পারিনি। কিন্তু এ অবস্থাতেও তারা আমাদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালায় এবং আমাদেরকে জম্মুস্থ যুগের কলঙ্ক তালাবতলো জে আই সি (জয়েন্ট ইন্ট্রোগেশন সেন্টার)-এ স্থানান্তরিত করে। বন্দী হওয়ার প্রায় দশমাস পর তালাবতলো জেআই সি-এর রেজিষ্ট্রি খাতায় আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। আমাদের এফ,আর,আই রিপোর্ট তৈরী করা হয়।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়। যাকে আই আর বলে। ইন্ট্রোগেশন রিপোর্ট তৈরী করা হয়। তারপর সেটাকেই ভিত্তি করে আমাদের উপর দু'বছরের পাবলিক ল' আরোপ করা হয়, যাকে পি,এস,এ বলে এবং আমাদেরকে তিহার কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। তিহার কারাগারে দু বছর কাটানোর পর আমাদেরকে অন্য একটি আইনী ধারায় আটকে রাখা হয় এবং বন্দী হওয়ার প্রায় সোয়া পাঁচ বছর পর প্রথমবার আমাদেরকে টাডা কোর্টে হাজির করা হয়। আপনাদের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, সোয়া পাঁচ বছর পর্যন্ত আমাদের সম্পর্কে কোন চার্জশিট দেয়া হয়নি এবং কোন দোষে দোষারোপ করা হয়নি বরং আমাদেরকে আইনগত এমন কোন সুবিধাও প্রদান করা হয়নি, যার ভিত্তিতে আমরা কোন কোর্টের শরণাপন্ন হতে পারি বা কোন আদালত থেকে সুবিচার লাভ করতে পারি।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আপনার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কি কি অভিযোগ ছিল?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: টাডা কোর্টে আমার বিরুদ্ধে যে চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল, তাতে আমাকে বিশ্বের বড় একজন সন্ত্রাসী, অনেক দেশে গিয়ে জিহাদের দাওয়াত দাতা, মুজাহিদদের সমর্থক, তাদের আর্থিক সাহায্যকারী এবং জিহাদে অংশগ্রহণকারী একজন মুজাহিদ (মিলিট্যান্ট) সাব্যস্ত করা

হয়। জজকে বলা হয়েছিল যে, এ লোক ভারতের নিরাপত্তার জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ। ভারতের ভিতরে শ্রীনগরে আমার তৎপরতার কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বরং আমার সাধারণ জীবন সম্পর্কে এই দোষ আরোপ করে পেশ করা হয়। কিন্তু আট নয় মাস পর জজের সম্মুখে পেশ হওয়ার পর জজ সেই মামলায় আমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে। কিন্তু সরকার যখন জানতে পারে যে, জজ আমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করছে, তখন তারা সিভিল কোর্টে সুড়ঙ্গ খননের মামলায় (যেটি কোর্ট ভলওয়ালে খনন করা হয়েছিল) ট্রায়াল শুরু করে। সেখানকার জজ ছিল একজন মহিলা। সেই মামলা থেকে মুক্ত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হতেই নতুন করে এই মিথ্যা মামলা আমার নামে দায়ের করে যে, সে ঈদের দিন কারাগারের ব্যবস্থাপকদের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছে এবং মুজাহিদদেরকে ছাদে ডেকে এনে সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে বাধ্য করেছে। তারপর এমনি আরো পাঁচ ছয়টি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু তখন মাত্র দ্বিতীয় মামলার ট্রায়াল চলছিল এমন সময় আল্লাহ পাক নিজেই সমস্ত মামলা খতম করে দেন।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): টাডা কোর্ট আপনার মুক্তির আদেশ জারি করার পর এবং আপনাকে যাবতীয় দোষ থেকে মৌলিকভাবে নির্দোষ ঘোষণা করার পর

আপনার উপর কিসের ভিত্তিতে অন্যসব মোকাদ্দমা চালানো হয়। আপনি তো ইতিপূর্বেই নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন।

মাওলানা মাসঊদ আযহার: এ কথা সেই দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, যেখানে মানবতা আছে। দীর্ঘদিন ধরেই ভারত মানবীয় কানুন থেকে বঞ্চিত। আমি সেখানকার কারাগারসমূহের অবস্থা যদি আপনাদেরকে সবিস্তারে বলি, তাহলে আপনারা বিস্ময়াভিভূত হবেন যে, ভারতের লোকেরা কোন্ পরিবেশে ও কেমন অবস্থায় বাস গ্রহণ করছে। আমাদের কয়েকজন সাথী, যারা এখনও কারাগারে বন্দী রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এই মোকাদ্দমা দায়ের করা হয়েছে যে, তারা কারাগারের এক লোকের উপর পাতিল নিক্ষেপ করেছে। তারা কোর্টে একটি পাতিল হাজির করে বলে যে, এটি তার হাতিয়ার ছিল। একদিকে কাগজপত্রে লিখেছে যে, এরা বিশ্বের খুবই ভয়ানক ও মারাত্মক সন্ত্রাসী। অপরদিকে তারাই যাবতীয় মামলা থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হলে তাদের উপর পাতিল নিক্ষেপ করার মামলা দায়ের করে তাদেরকে আটকে রেখেছে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমাদের মাওলানা আবূ জান্দাল সাহেব। তাকে চারার শরীফের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে সেখানে ২২ জন সাথী এমন রয়েছেন, যাদের সম্পর্কে সেখানকার সকল আদালত পুশব্যাক করার আদেশ

জারি করেছে। অর্থাৎ তাদেরকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ রয়েছে। তাদের কারো কারো কাগজপত্র এখন আমার নিকট পৌঁছেছে। কিন্তু তারপরও তাদেরকে অবৈধভাবে আটকে রাখা হয়েছে। আপনাদের হয়ত মনে আছে যে, আমি যখন প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করি, তখন আমি সংবাদপত্রের এমন একটি রিপোর্টের ফটোকপি সেখানে বিতরণ করেছিলাম যে, ৬০ জন পাকিস্তানী তিন/সাড়ে তিন বছর ধরে বিভিন্ন থানায় পড়ে আছে। তাদেরকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আদালত রায় দিয়েছে। কিন্তু সেখানকার প্রশাসকরা বলে যে, তাদেরকে পাঠানোর মত পয়সা আমাদের কাছে নেই। তাই তাদেরকে কয়েক বছর ধরে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। যে দেশের আইনের এই অবস্থা সেই দেশ সম্পর্কে এসব প্রশ্নের কী উত্তর দিতে পারি?

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): টাডা কোর্টের ব্যাখ্যা কি? মাওলানা মাসঊদ আযহার: টাডা একটি বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ। যার। অর্থ—সন্ত্রাস নিরোধ আইন। ভারত সরকার এই আইন তৈরী করেছে। যা বিশ্বের কোন দেশের আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই আইনের দৃষ্টিতে পুলিশের সম্মুখে প্রদত্ত বিবরণ যে কোন বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। অথচ আপনারা অবগত আছেন যে,

পুলিশের সামনে প্রদত্ত বিবরণ আদালত সাক্ষীর সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণাদির আলোকে পরখ করে থাকে। কিন্তু টাডার মধ্যে এর সুযোগ মাত্রও নেই। বরং দোষী ব্যক্তি পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়ে যে বিবরণ দেয় এবং তার উপর তার টিপসই বা দস্তখত থাকে, সেই বিবরণ প্রমাণ্যরূপে আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সেজন্য দায়ী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে। টাডা আইনের কয়েকটি ধারা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক শিথিল ধারা ছিল ৫ নাম্বার। যাতে ১৫ বছরের শাস্তির বিধান রয়েছে। আর সবচেয়ে মারাত্মক ধারা হল ২নং ও ৩নং ধারা। টাডার জন্য পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেগুলো হাইকোর্টের সমকক্ষ। সুতরাং টাডা আদালত থেকে যে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তার শুধুমাত্র সুপ্রিমকোর্টে আপিল করার সুযোগ থাকে। সে হাইকোর্ট বা অন্য কোন কোর্টে আপিল করতে পারে না। টাডা আইনে ধৃত বা তার টার্গেট ৯৫ শতাংশ মুসলমান। জম্মু, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশের মুসলমানদেরকে এই আইনের টার্গেট করা হয়। এমনকি কোন কোন মুসলমানকে খঞ্জর এবং ক্ষুর রাখার দায়েও টাডা আইনের অধীনে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাদেরকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এমনিভাবে একটি পশুর উপরও টাডা আইন আরোপ করা হয় বলে একটি খবর প্রসিদ্ধ রয়েছে। কারণ, কয়েকজন মুজাহিদ তার উপর আরোহণ করে ঘোরাফেরা করত।

ঘোড়াটিকে পাঞ্জাব থেকে গ্রেফতার করা হয়।
তাকেও টাডা আইনের অধীনে বন্দী করা হয়।

যাই হোক, এই অন্ধ আইনের অনেক হাস্যকর ব্যবহার হয়েছে। এই আইনের একটি নিকৃষ্টতম দিক এই যে, এতে জামিন পাওয়া অসম্ভব। দীর্ঘ সময় এর ট্রায়াল চলতে থাকে। যাই হোক আমাদের উপর টাডার ২ ও ৩নং ধারা আরোপ করে আদালতে পেশ করা হয়। যার মধ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নীচে কোন শাস্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ যে, টাডা কোর্টের জজ এই মামলাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং আমাদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করে। কিন্তু তার পরপরই তারা সুড়ঙ্গের মোকাদ্দমা দায়ের করে আমাদেরকে অন্য কোর্টে স্থানান্তর করে।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): টাডা কোর্টের জজ ভারত সরকারের চাপ সত্ত্বেও আপনাকে কিভাবে নির্দোষ সাব্যস্ত করে?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: একজন জজের যে কোন রায় প্রদানের জন্য অবশ্যই কোন না কোন অবলম্বন থাকতে হয়। কাগজপত্র ও দলীল প্রমাণের মাধ্যমে যে কাজ পরিচালনা করতে হয় তাতে অনেক বাধ্যবাধকতাও থাকে। যে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে কোর্টে হাজির করে, তারা এমন কোন প্রমাণই কোর্টে পেশ করতে পারেনি, যাকে ভিত্তি করে জজ আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারে বা কেসটি দীর্ঘদিন

চালাতে পারে। কারণ, কাউকে সন্ত্রাসী লিখলেই তো আর সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করা যায় না। সন্ত্রাসের জন্য কোন প্রমাণ অথবা তার কোন বিবরণও সেখানে পেশ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় আপনাদেরকে বলছি, তা এই যে, জম্মু কাশ্মীরে টাডার পক্ষ থেকে সাত সহস্রাধিক মোকাদ্দমা এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কারোই তাতে শাস্তি হতে পারেনি। তবে বছরের পর বছর লোকদেরকে তাতে জড়িয়ে আটকে রেখেছে। তবে বোম্বাইতে টাডার অধীনে কয়েকজন মুসলমানের শাস্তি হয়। এখানে এ কথাটিও উল্লেখযোগ্য যে, সেখানকার মুসলমানদের প্রতিবাদের পর এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পরস্পর দ্বন্দ্বের পর ভারতের টাডা আইন বিলুপ্ত করা হয়। তবে টাডা আদালত এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। আদালত টাডা আইন রহিত হওয়ার পূর্বের রেকর্ডকৃত মোকাদ্দমাসমূহের সমাধান করছে।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): কারাগারে আপনার উপর যে জুলুম চালানো হয়েছে তার কিছু ঘটনা আমাদেরকেও শুনান।

মাওলানা মাসঊদ আযহার: এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য এই যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাঁর বিশেষ সাহায্য ও বিশেষ রহমত দ্বারা যে অনুকম্পা করে আমাকে মুক্তি দান

করেছেন, সেই রহমতকে প্রত্যক্ষ করে সেসব কথা উল্লেখ করা এবং সেসব অবস্থা বর্ণনা করা, যা আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে সমীচীন মনে হয় না। তবে আপনারা নিজেরাই অনুমান করতে পারবেন যে, আমি একজন মুজাহিদরূপে তাদের হাতে বন্দী হই এবং পরিচয় পাওয়ার পর তারা এ কথাও অবগত হয় যে, মুজাহিদদের সংগঠনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আমার সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া সেখানে থাকতেও আল্লাহ তাআলা আমার ঈমানকে নিরাপদ রেখেছেন। অতএব মুশরিক ও ভীরু কাফেরদের পক্ষ থেকে এমন লোকের সাথে কিরূপ আচরণ হতে পারে তা আপনারা খুব ভালোভাবেই অনুমান করতে পারেন। আমার চোখের সম্মুখে যা কিছু ঘটেছে তার সবই আমার হৃদয়ে চিত্রিত আছে। আমাদের মুজাহিদ সাথীদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, আমরা পরস্পরের উপর যেই নির্যাতন হতে দেখেছি, তা কখনোই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। মুশরিকরা ১৪শত বছর ধরে মক্কার উত্তপ্ত মরুভূমি থেকে শুরু করে জম্মু ও শ্রীনগরের টর্চারিং সেন্টার পর্যন্ত অত্যাচারের যেই ধারা অব্যাহত রেখেছে, তাতে কোন প্রকার নমনীয়তা বা স্বল্পতা সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং সেই প্রহার, সেই দাড়ি ছেড়া, দেহের উপর দাঁড়িয়ে সেই লম্ফ ঝম্প, গালিগালাজ করা এর সব কিছুই এমন প্রত্যেক কয়েদীর সঙ্গে ঘটে, যারা মুসলমান এবং মুজাহিদরূপে মুশরিকদের হাতে বন্দী হয়। মুসলমানদের কখনোই বিস্মৃত

হওয়া উচিত নয় যে, মুশরিকরা তাদের অতি বড় দুশমন-ইসলামেরও এবং মুসলমানদেরও। আমাদের একজনের জন্যও তাদের অন্তরে দয়ার স্থান নেই।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): ভারতের কারাগারে একজন বন্দীরূপে আপনার অনুভূতি কি ছিল?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: একজন কয়েদী কি-ইবা অনুভব করতে পারে? নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় অনুভূতি, যা আল্লাহর পথের একজন পথিকের অন্তরে বেদনার তরবারী চালায় এবং দুঃখের বর্শা বিদ্ধ করে, তা হলো জিহাদের ময়দানের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি এবং আল্লাহ পাক হয়ত দ্বীনের খিদমত ও জিহাদের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছেন এই শংকা। অথচ আমরা সেখানে পরস্পরকে এ বিষয়ে সান্ত্বনা দান করতাম। আমি নিজেও আমার বন্দী সাথীদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম যে, আপনারা জিহাদ থেকে বঞ্চিত নন, বরং আপনাদের খিদমত জিহাদের ময়দানের খিদমতরূপেই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের বাড়ীতে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তার জামিন এবং তার জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি রয়েছে। তার প্রতিটি মুহূর্ত জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত হচ্ছে।

স্বয়ং হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) আল্লাহর পথে বন্দী কিছু লোকের নিকট একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, আপনারা নিজেদেরকে বন্দী মনে করবেন না, আপনারা প্রকৃতপক্ষে বন্দী নন। বরং আল্লাহর পথের এমন মুজাহিদ, যাদেরকে আল্লাহর ভাল লেগেছে, বিধায় তিনি আপনাদেরকে তার পথে আটকে রেখেছেন, এ সকল কথা একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এই অনুভূতি অন্তরকে খুব আচ্ছন্ন করে রাখত যে, দ্বীনের কাজ থেকে এক ধরনের বঞ্চনায় পড়ে গেছি। সুতরাং আমরা পরস্পরকে মনে করাতে থাকি যে, আমাদের এখানে থাকাকালে খুব বেশি পরিমাণে নেক আমল করা উচিত এবং কারাগারে থেকেও জিহাদের আমলকে যতটুকু সম্ভব জীবন্ত রাখা দরকার। জিহাদের লিখিত ও মৌখিক দাওয়াতে লিপ্ত থাকা দরকার।

কারণ, আমাদের ইহকাল তো এদিক থেকে বাহ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যে, আমরা জিহাদের আমলী ময়দান থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ না করুন, আমাদের আখেরাতও যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে আমাদের চেয়ে অধিক হতভাগা আর কে হবে? এ কথার আলোচনায় সাময়িকভাবে আমাদের বেদনার উপশম হত। সাথীরা অধিকহারে নেক আমলে লিপ্ত হত। কুরআন মাজিদের সঙ্গে সর্বাধিক সম্পর্ক রাখত। পুরা ওয়ার্ডে এমন পরিবেশ বিরাজ করত, যা উত্তম কোন স্থানেও হয়ত পাওয়া যাবে না।

যাই হোক, এই বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি একদিকে পেরেশানীর কারণ হত, অপরদিকে সাহসও বৃদ্ধি করত এবং অন্তরে এই উদ্দীপনা সৃষ্টি করত যে, যেভাবে হোক এসব প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করে আমাদের সাধ্যমত আমরা কিছু করব। সুতরাং এই অনুভূতির ফলেই আমরা দু' দু'বার সুড়ঙ্গ খনন করি। আলহামদুলিল্লাহ! অথচ এটি সহজ কোন কাজ ছিল না। কিন্তু আল্লাহর পথের কয়েকজন মুজাহিদ সাহস করে কাজ করার ফলে দুশমনের উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত কারাগারে একবার ষাট ফুট দীর্ঘ আর দ্বিতীয় বার একশ’ বিশ ফুট দীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করতে সফল হয়। এই অনুভূতির ফলেই কারারক্ষীদের সঙ্গে আমাদের কয়েকবার সংঘর্ষও হয় এবং জিহাদের অংশ হিসেবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাতে পাহারা চলতে থাকে। কয়েকভাবে জিহাদী গ্রুপও তৈরী করা হয়। এই অনুভূতির ফলেই কারা অভ্যন্তরে জিহাদের প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। নিয়মিতভাবে টহল দেওয়া হত। সাথীরা পরস্পরকে দৈহিক কসরত ও কৌশল শিক্ষা দিত। এই অনুভূতির ফলে কারাগারের কঠোর আইন ভঙ্গ করে জিহাদ বিষয়ে অধিকহারে প্রবন্ধ লিখে তা বাইরে পাঠানোর চেষ্টা চলত। এই অনুভূতির ফলে সেখানে দরসে কুরআন এবং জিহাদের পাঠদানের নিয়মিত আসর চলতে থাকে এবং জিহাদের দাওয়াতের ধারাও চলতে থাকে।

উপরোক্ত অনুভূতির সাথে সাথে মন ও মগজে এই অনুভূতিও আচ্ছন্ন হয়ে থাকত যে, আমাদেরকে বন্দী করে দুশমনের মস্তিষ্কে যেই অহংকার নেশার মত সওয়ার হয়ে আছে, তা ধুলিস্মাৎ হয়ে যাক। তারা একে নিজেদের বিরাট সফলতা ও অর্জন মনে করছিল যে, তারা (তাদের কথামত) এমন নামকরা মুজাহিদ গ্রেফতার করেছে, যার কারণে তাদের বাহিনীর সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে। দম্ভে তাদের কর্তৃপক্ষের পা মাটিতে পড়ছে না। সুতরাং যখনই তাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হত, তখনই তারা আমাদের মধ্যে তীব্রভাবে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত যে, তারা বিজয়ী আর আমরা পরাজিত। তারা তাদের এই বিজয়ের গীত গাইতে অত্যন্ত সচেষ্ট থাকত। সুতরাং বার বার এই সংবাদ সম্বলিত রিপোর্ট প্রচার করত। বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা কাহিনী ও বানোয়াট আলেখ্য বানিয়ে তাদের বীরত্বের কথা প্রচার করত। এসব দেখে আমাদের মনে হত, কোনভাবে যদি তাদের অহংকার চূর্ণ করা যেত। সুতরাং আমরা সেখানে থাকতে যখনই একাকী কিংবা সম্মিলিতভাবে দুআ করতাম, তখন এই দুআই করতাম যে, “হে আল্লাহ! আমাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ কোন পন্থায় মুক্ত কর, যাতে কুফরের নাক ধূলায় মিশে যায়। তাদের অহংকার চূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের মস্তিষ্কে সওয়ার অহংকার লাঞ্ছনায় পরিণত হয়।”

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক সে দুআ কবুল করেছেন। যে আঙ্গিকে তিনি আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন, তার দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ উক্ত সকল উদ্দেশ্যই সফল হয়েছে। এছাড়া এমন আরো অনেক প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেসব প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বা সামাজিক জীবনের সঙ্গে। যেগুলো কারাজীবনে মানুষের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আমরা প্রতিক্রিয়ার জগত থেকে খুব বেশি দূরে থাকতে সচেষ্ট ছিলাম। কারণ, কোন কোন প্রতিক্রিয়া মারাত্মক ক্ষতিকরও হয়ে থাকে।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): কারাগারে থাকাবস্থায় আপনার অনেক লেখা এবং চিঠিপত্র বাইরে আসে, তা কি করে সম্ভব হয়? সেসব বাইরে আসায় কি আপনার উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাইনি?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর যদি একজন মুসলমানের পূর্ণ আস্থা থাকে এবং পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণিত আল্লাহর সাহায্যের ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি থাকে, তাহলে সে উত্তমভাবে বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাঁর নিকট দুআর জন্য ব্যাকুল হৃদয়ের কোন আকুতি এবং তাঁর সমীপে যাঞ্চাকারীর হাত কখনও বিফল ফিরিয়ে দেননা। শুরু থেকেই

আমাদের বাসনা ছিল, আমরা যেন জিহাদের কাজ থেকে বঞ্চিত না হই। কিন্তু একবছর পর্যন্ত কলম কাগজের সম্পর্ক গড়ার ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা এই সম্পর্ক গড়ারও তাওফীক দান করেন। এর উপকরণের ব্যবস্থা করেন। রসদও যোগাড় করে দেন। বুদ্ধিও দান করেন। তাও এমন বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে, আমার স্মরণ আছে যে, কারাগারে থাকা অবস্থায় সাড়ে ছয়শ'র অধিক পত্র লিখেছি। যার অধিকাংশ পত্র কারা আইনের পরিপন্থীভাবে লেখা হয় ও পাঠানো হয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, তার মধ্য থেকে অল্প কিছু চিঠি খোয়া গেছে। অবশিষ্ট সবগুলো চিঠিই যাদের নামে লেখা হয়েছিল তাদের নিকট পৌঁছে যায়। এসব চিঠি এমন একটি ভাণ্ডার, যার দ্বারা ইনশাআল্লাহ জিহাদের কাজে এবং কিছু মুসলমানের অবশ্যই উপকার হবে।

এমনিভাবে কারাগারে বসে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা জিহাদ ও অন্যান্য বিষয়ে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখার তাওফীক দান করেন। আর এটি শুধুমাত্র তার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা। এর মধ্যে আমাদের কারোরই যোগ্যতার অংশ নেই। সম্ভবত এর মধ্য থেকে এক দুইটি প্রবন্ধ ছাড়া আর কোনটিই বিনষ্ট হয়নি। তবে আমার রচিত পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ অগ্নি উদরে নিক্ষেপ করতে হয়। কারণ, পরিস্থিতি সে সময় অনুকুল ছিল না।

সেই পাণ্ডুলিপি আমার কাছে রাখা মারাত্মক বিপদের কারণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কোন প্রবন্ধ যখন পাঠিয়ে দিতাম এবং তা ছেপে বের হওয়ার সংবাদ পেতাম, তখন ধারণা হত যে, এখন শত্রুর জুলুম নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে। তাদের নিকট এর সংবাদ পৌছবে। সুতরাং দুশমন জিজ্ঞেস করলে জবাব দেওয়ার জন্য বিভিন্ন হিলা-বাহানা তৈরী করে রাখতাম। কিন্তু বড় আশ্চর্যের কথা এই যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছেন। ফলে এসব খবর দুশমন জানতে পারেনি কিংবা জানতে পারলেও তারা ভেবেছে যে, সম্ভবত তাদের নাম দিয়ে অন্য কেউ এগুলো লিখছে। কারণ, নিজেদের নিরাপত্তা ও সিকিউরিটি ব্যবস্থার উপর তাদের গর্ব ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহ যে, সবকিছু যথাস্থানে পৌঁছে যায়। এখনও কারাগার থেকে প্রেরিত সাথীদের বেশির ভাগ চিঠি ও জিনিসপত্র আসছে। কোন কোন জায়গায় অত্যধিক কঠোরতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতায়ালা কঠোরতা কারীদের মাধ্যমে এসব জিনিস বাইরে পৌঁছিয়ে থাকেন এবং তাদেরকে এমন অনুগত ও অধীন বানিয়ে দেন যে, তারা মুজাহিদদের কাজ করতে বাধ্য হয়। আর এটি এমন একটি জিনিস, যা ইনশাআল্লাহ কখনই শেষ হবে না।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আমরা শুনেছি যে, আপনি মুক্তি লাভের পর কারাগারের যেসব অবস্থা

লিখে প্রচার করার দরুন কারাগারে বন্দী সাথীদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাওলানা মাসঊদ আযহার: কারাগারের ভয়ংকর ও বেদনাদায়ক পরিবেশে আমার সঙ্গে যেসব সাথী ছিলেন, আমার অন্তরে তাদের জন্য যেই সমবেদনা ও ভালবাসার প্রেরণা রয়েছে, তা হয়ত অন্য কারো অন্তরে থাকতে পারে না। তাদের সম্পর্কে আমি যতটুকু সজাগ আর কেউ বোধ হয় এতটুকু সজাগ নয়। আমার উপর তাদের অসংখ্য অনুকম্পা রয়েছে। কারাজীবনে আমার সঙ্গে তারা যে আচরণ করেছেন, সত্যিই তা ঈর্ষনীয়। আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী। এমতাবস্থায় এমন কোন পদক্ষেপ আমি নিতে পারি না, যার ফলে তারা কষ্ট পেতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ, লেখার কাজে আমি খুব সতর্কতা অবলম্বন করি। আমি আমার ছয় বছরের কারাজীবনের অভিজ্ঞতা সামনে রেখেই এসব লিখেছি। কিসের দ্বারা তাদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে পারে এবং কিসের দ্বারা পারে না সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। আল্লাহ পাকের দয়া! কয়েকদিন পূর্বে কারাগারের একজন সাথীর পত্র এসেছে। তাতে সে লিখেছে, আপনার মুক্তির পর আমাদের উপর নির্যাতন হ্রাস পেয়েছে। কারণ দুশমনদের এখন আশংকা রয়েছে যে, তাদের একজন সাথী বাইরে বের হয়েছে। আর তার প্রতি হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের সমর্থনও রয়েছে। আমরা তার সাথীদেরকে

উত্যক্ত করলে বা কষ্ট দিলে আমাদের থেকে ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

যাই হোক মুশরিকরা তাদের সহজাত ভীরুতার কারণে—যা তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবেও বিদ্যমান এবং তাদের সমাজের মধ্যে সামগ্রিকভাবেও বিদ্যমান— তারা জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বরকতে মুজাহিদদের উপর নির্যাতন চালানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের সংবরন করছে। আলহামদুলিল্লাহ, সাথীরা সেখানে উৎকৃষ্টমানের জীবন যাপন করছে। আমার আশা, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অতিসত্বর মুক্তিদান করবেন।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): কারাগারে বন্দী থাকাকালে আপনাকে মুক্ত করার চেষ্টা অবশ্যই হয়েছে, বা আপনি নিজেও চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে আমাদেরকেও কিছু বলুন।

মাওলানা মাসঊদ আযহার: এটি বড় আকর্ষণীয় ও দীর্ঘ এক উপাখ্যান। আমি তা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। এ আলেখ্য মনোমুগ্ধকর হওয়ার সাথে সাথে ঈমানদীপ্তও বটে। মুসলমানদের অন্তরে পরস্পরের কেমন মর্যাদা ও মূল্য রয়েছে এবং মুজাহিদদেরকে পরস্পরের জন্য কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন, তা এসব ঘটনা আরো স্পষ্ট করে

তুলে ধরে। যাই হোক, মুক্তি পেলাম ছয় বছর ২৪ দিন পর। তবে এজন্য বন্ধু ও মুজাহিদ সাথীগণ যে পরিমাণ চেষ্টা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য এবং ইতিহাসের এক আলোকজ্জ্বল অধ্যায়। সংক্ষেপে এবং ইঙ্গিতে সেসব প্রচেষ্টার কথা আলোচনা করব।

আমরা বন্দী হওয়ার পরপরই ইসলামাবাদের (অনন্তনাগ) তৎকালীন জেলা কমাণ্ডার শহীদ সেকান্দার ভাই (রহঃ) (যার সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক ছিল) অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সকল মুজাহিদ বাহিনীকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন এবং শক্তি প্রয়োগ করে আমাকে মুক্ত করার সীমাহীন চেষ্টা চালান। সেই উদ্ধার অভিযানে কত মুজাহিদ যে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেছেন তা আমার জানা নেই। কিন্তু সেই পনের দিন ইণ্ডিয়ান আর্মীদের জন্য বড় কঠিন সময় ছিল। তাদেরকে অনেক বিপদ ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, মুজাহিদগণ তাদের প্রত্যেকটি কনভয়ের উপর, প্রত্যেকটি দলের উপর এবং তাদের প্রত্যেক কেন্দ্রের উপর তীব্র আক্রমন চালায়।

বন্দী হওয়ার প্রায় তিন মাস পর শ্রীনগরের একটি টর্চারিং সেন্টারে থাকতে খবর পাই যে, বাইরের মুজাহিদগণ কয়েকজন বৃটিশ নাগরিককে অপহরণ করেছে এবং তাদের বিনিময়ে আমাদের মুক্তির দাবী জানিয়েছে। মুজাহিদদের এই তৎপরতা সাথীদের অন্তরে আমাদের বন্দী হওয়ার কি

যন্ত্রণা রয়েছে এবং তারা এই বিষয়টিকে কত গুরুত্বের সাথে দেখছে তারই ইঙ্গিত বহন করে। তারপর জানতে পারি যে, আমাদের মুক্তি আসন্ন। টর্চারিং সেন্টারে আমাদেরকে প্রস্তুত হতে বলা হয় এবং সেখানকার আইন অনুপাতে শেষ মেডিক্যাল চেকআপও করা হয়। কিন্তু সম্ভবত এমন সময় অপহৃত লোকদের মুক্তির কোন ব্যবস্থা হয়ে যায়, ফলে আমাদের মুক্তি পুনর্বার পিছিয়ে পড়ে।

তারপর আমাদেরকে যখন জম্মু নিয়ে আসা হয়। তখন বন্দী হওয়ার প্রায় নয় মাস পর সংবাদ শুনতে পাই যে, দিল্লীতে কয়েকজন বিদেশী নাগরিককে—যাদের মধ্যে কিছু আমেরিকান ও কিছু বৃটিশ রয়েছে—অপহরণ করা হয়েছে। আলহাদীদ নামক একটি সংগঠন তাদেরকে অপহরণ করেছে এবং তাদের বিনিময়েও আমাদের মুক্তির দাবী করেছে। এই তৎপরতা জনসমক্ষে আসার কিছুদিন পরেই জানতে পারি যে, এই তৎপরতাটিও ফলাফলশূন্য অবস্থায় সমাপ্ত হয়। কিন্তু আমরা একথা বুঝতে পারি যে, বাইরে যেসব মুজাহিদ সাথী রয়েছেন, তারা এ ব্যাপারে কি পরিমাণ চিন্তান্বিত এবং কত দূর অগ্রসর হওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত।

আমি এখানে এ কথাটি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, বাইরে সাধারণের জানা অজানা যত তৎপরতা হয়েছে, তার কোনটাতেই আমাদের পরামর্শ ছিল না বা তাদেরকে আমরা করতে বলিনি। বরং মুজাহিদগণ নিজেরাই অন্তরে বেদনা অনুভব

করে, স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে এবং নিজেদের দায়িত্বের কথা মনে করে যতটুকু সম্ভব হয়েছে তারা এ ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন।

যখন আমাদেরকে তিহার কারাগারে স্থানান্তর করা হয়, তখন ভারতের অধিবাসী কিছু সাথী, যারা জিহাদের সাথে খুব একটা পরিচিত ছিল না, কিন্তু তারা আমার বিভিন্ন ক্যাসেট বিশেষ করে বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত ক্যাসেট শুনেছিল, তারা যে কোন উপায়ে কাশ্মীরের কিছু মুজাহিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। সামান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কিছু অস্ত্র হাত করে। তারপর পাঞ্জাবের একটি অঞ্চল থেকে কয়েকজন সামরিক লোক এবং কয়েকজন বেসামরিক অফিসারকে অপহরণ করে কোথাও নিয়ে যাওয়ার পথে সংঘর্ষের মুখোমুখী হয়। তাতে এই সাতজন মুজাহিদও শহীদ হন এবং তাদের সাথে অপহৃত লোকেরাও মারা পড়ে। ফলে এ তৎপরতাটিও বাহ্যিক কোন ফলাফল লাভ করতে পারেনি। তবে এ ঘটনা থেকেও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি রয়েছে। যার ফলে অজানা অচেনা এই তরুণেরা এত বড় তৎপরতা চালায়।

তিহার কারাগারে থাকতেই এক রাতে আমরা সংবাদ শুনি যে, অধিকৃত কাশ্মীরের পহলগাম অঞ্চলে কয়েকজন বিদেশী নাগরিককে অপহরণ করা হয়েছে। আল ফারান নামক সংগঠন তাদেরকে অপহরণ করেছে এবং তাদের পরিবর্তেও আমাদের

মুক্তির দাবী জানিয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমেরিকান, কয়েকজন জার্মান ও কয়েকজন বৃটিশ নাগরিক ছিল। আর একজন সম্ভবত নরওয়ের নাগরিক ছিল। এই তৎপরতাটি অনেক প্রলম্বিত হয়। এর কারণে আমাদেরকে কারাগারে নির্যাতনও করা হয়। কিন্তু আমরা এ তৎপরতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম এবং এ কাজ কারা করছে তাও আমাদের জানা ছিল না। এ সময় আমাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দেশী বিদেশী অনেক লোক আসতে থাকে। কিন্তু আমরা তাদেরকে কিছুই বলতে পারছিলাম না। তারা আমাদের নিকট এ দরখাস্ত করে যে, আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য যেন একটি আপিল করি। তখন আমরা মানবীয় সমবেদনার ভিত্তিতে সে অনুপাতে আপিলও করি। কিন্তু পরবর্তীতে সংবাদ পাই যে, সেই পর্যটকগণ নিরুদ্দেশ হয়েছে। তারা জীবিত আছে নাকি তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে তাও কেউ জানতে পারেনি।

কিছুদিন পর যখন আমাদেরকে অধিকৃত কাশ্মীরের একটি কারাগারে আনা হয়, তখন সেখানে কয়েকজন বিদেশী আগন্তুকের নিকট থেকে জানতে পারি যে,এই তৎপরতায় শহীদ কমাণ্ডার সেকেন্দার (রহঃ) জড়িত ছিলেন। এ ব্যাপারে আর যার নাম নেওয়া হচ্ছিল, তিনি আমাদের একজন মুজাহিদ সাথী শহীদ কমাণ্ডার আবদুল হামীদ তুর্কি (রহঃ)। কিন্তু তখন এরা উভয়ে শাহাদত মদিরা পান করেছিলেন। তারপর

একথাও শুনতে পেয়েছি যে, কয়েকটি দেশের দক্ষ সেনারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত পহলগাম এলাকায় হেলিকপ্টার ও অন্যান্য সামরিক উপায়ে অপহৃত লোকদেরকে খুঁজে বের করার জন্য বা কমপক্ষে তাদের লাশ উদ্ধার করার জন্য বিরাট তৎপরতা চালায়, কিন্তু তাতেও তারা সফল হয়নি।

এ ব্যাপারে কয়েকবার বিদেশী প্রতিনিধি দল এবং স্থানীয় প্রশাসনের লোকেরা কারাগারের বন্দীদের থেকে—যাদের মধ্যে আমরা তিনজন অর্থাৎ শহীদ কমাণ্ডার সাজ্জাদ আফগানী (রহঃ), কমাণ্ডার নাছরুল্লাহ মানসুর ও আমি শামিল ছিলাম—অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে। অপহৃতরা মারা গিয়ে থাকলেও তারা কমপক্ষে তাদের লাশই পেতে চাচ্ছিল। এই তৎপরতা আমেরিকা ও ইউরোপের নাগরিকদেরকে অত্যধিক পেরেশানীতে লিপ্ত করে। শেষ পর্যন্ত তাদের বিস্তারিত ঘটনা কেউই জানতে পারেনি। কারণ,এই কাজে যাদেরকে জড়িত বলা হচ্ছিল, তাদের সকলেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, আর যারা জীবিত ছিলেন, তাদের কেউই এ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। আর যে সকল কারাবন্দীদের নাম উল্লেখ করে বলা হচ্ছিল যে, তাদের মুক্তির জন্য এই কাজ করা হয়েছে, তারা নিজেরাই এর শুরু শেষ ও মধ্য সম্পর্কে নিতান্তই অনবগত।

মোটকথা! এই তৎপরতাটিও কোন ফল ছাড়াই শেষ হয়ে যায়। আর ভারত সরকার আমাদের উপর অতি

কঠোর হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক প্রচেষ্টাই তিহার কারাগারে থাকাকালে এবং সেখান থেকে কাশ্মীরের কারাগারে ফিরিয়ে আনার পর করা হয়। যার মধ্যকার কতক তৎপরতা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সহজ। কিন্তু অভীষ্ঠ লক্ষ্যের অতি নিকটে এসে সেগুলো বাহ্যিকভাবে ব্যর্থতার শিকার হয়। আর পরে আমরা চিন্তা করতাম যে, জানিনা এর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কি হেকমত রয়েছে? নিশ্চয় তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি কৃপাশীল, ঈমানদারদের মদদকারী এবং কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও হেয় প্রতিপন্নকারী। তাঁর কোন কাজই হিকমতশূন্য নয়।

কারাগারের অভ্যন্তরে যেসব তৎপরতা চালানো হয়েছে, তারও অতি দীর্ঘ এক আলেখ্য রয়েছে। কারণ, কারাগারের ভিতরের মুজাহিদগণ নিজেদের মুক্তির জন্য সুদৃঢ়, সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা করা থেকে গাফেল ছিলেন না। কারণ, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার শোকর যে, কারাগারে যাওয়া সত্ত্বেও তারা সেখানকার দাসত্ব মনে- প্রাণে মেনে নেয়নি। বরং দাসত্বের এই জাল ও ফাঁদ ছিন্ন করার সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই তারা করেছেন। সেখানকার মুজাহিদগণ কোন প্রকার কুরবানী করতেই কুণ্ঠাবোধ করেননি।

কারাগারের ভিতরে অবস্থান করে মুক্তি লাভের জন্য যেসব চেষ্টা চালানো হয়, তার মধ্যে বিরাট একটি তৎপরতা ১৯৯৪ সনেই আরম্ভ হয়েছিল। অর্থাৎ বন্দী হওয়ার বছরই যখন আমাদেরকে কোট ভলওয়ালের জে আই সিতে আনা হয় তখন। তৎপরতাটি ছিল এই-কারাগারের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ছিল যথেষ্ট খোলামেলা। ব্যারাকসমূহের প্রাচীর ও দরজাসমূহ ভেঙ্গে পড়েছিল। ফলে মুজাহিদরা সেখানে ২৪ ঘন্টা ঘোরাফেরা করত। দিনে ও রাতেও পরস্পরের ব্যারাকে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। জেল কর্তৃপক্ষ অনুমান করতে পারেনি যে, আমাদেরকে কাশ্মীরী মুজাহিদদের সঙ্গে ছেড়ে দিলে তাদের কোন ক্ষতি হতে পারে। তাই তারা নির্দ্বিধায় আমাদেরকে কাশ্মীরী মুজাহিদদের সঙ্গে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সেখানে যখন দরসে কুরআনের ধারা আরম্ভ হয় এবং ভারত সরকার সেখানে মুজাহিদদের মধ্যে যেই মতবিরোধ সৃষ্টি করেছিল, তা বিলুপ্ত হয়, তখন জেল কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। তারা আমাদেরকে সেখান থেকে অন্য একটি ভয়ংকর টর্চারিং সেন্টার তালাবতলোতে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা চালায়। আমাদের ১২ জন পাকিস্তানী মুজাহিদের মধ্য থেকে চারজনকে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু তারপর কারাগারে অবস্থানরত কাশ্মীরী মুজাহিদগণ প্রতিবাদ করে যে, আমরা আমাদের এ সকল সাথীকে সেখানে যেতে দেব না। কারণ, সেখানে ভয়ংক নির্যাতন

করা হয়। এরা ইতিপূর্বেও কঠিন কঠিন নির্যাতন সহ্য করেছে এবং তাদের যাবতীয় রিপোর্ট ও তৎপরতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মোটকথা এ নিয়েই জেল কর্তৃপক্ষ ও কারাগারে অবস্থানরত কয়েদীদের মধ্যে মতবিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জেল কর্তৃপক্ষ শক্তিবলে আমাদেরকে সেখান থেকে বের করতে চাচ্ছিল, আর ভিতরের সহস্রাধিক মুজাহিদ তাদের শক্তিবলে আমাদেরকে ভিতরে আটকে রেখেছিল। এ পরিস্থিতিতে আমাদের পরামর্শ হয় যে, বিষয়টি এভাবে দীর্ঘসময় টিকবে না। কারণ, মুজাহিদদের সংখ্যা যতই হোক না কেন তারা ছিল নিরস্ত্র, নিরুপায় ও সহায়হীন। কারাগারের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ বিভিন্ন অক্ষমতায় আক্রান্ত। পক্ষান্তরে জেল কর্তৃপক্ষ বড় ধরনের ফোর্স নিয়ে এলে তখন তারা তাদের চেষ্টায় সফল হবে এবং আমাদেরকে বের করে নিয়ে যাবে। তাই আমাদের কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার মজবুত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুতরাং কোটভলওয়ালের ৭নং ব্যারাকে প্রাচীরের পাশে একটি তাঁবু টানানো হয়। কারাগারের মধ্যে খোলামেলা পরিবেশ ছিল। সেখানে কয়েকজন মুজাহিদও তাঁবু টানিয়ে থাকত। বন্দীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে জেল কর্তৃপক্ষ এসব তাঁবু নিজেরাই জোগাড় করে দিয়েছিল।

যাই হোক, সেই তাঁবুর ভিতর দিয়ে মাটি খনন করে তার উপর ভাল একটি কেমোফ্লোজ ছাদ বানানো হয়। মুজাহিদগণ দিনরাত পরিশ্রম করে সেই সুড়ঙ্গ খনন করতে শুরু করে। দিনের বেলায় খনন করা হত, আর ছোট ছোট ঝুড়ির মধ্যে মাটি জমা করা হত। রাতে সাথীরা তাদের ফার্ন (কাশ্মীরের বিশেষ পোশাক) পরিধান করে তার মধ্যে সেই ঝুড়ি লুকিয়ে কারাগারের গর্তের মধ্যে এবং যেখান দিয়ে পানি নিস্কাশন হত সেসব জায়গায় নিক্ষেপ করত। আর তার ডানে বামে পাথর ফেলা হত। কারণ অত্যধিক বিস্তৃত ও প্রশস্ত এই কারাগারে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাথর ছিল। ফলে পাথরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কারও কোনরূপ সন্দেহ সংশয় হয়নি। সুড়ঙ্গ খনন করার ক্লেশপূর্ণ এই পরিশ্রমের ধারা একমাস পর্যন্ত চালু থাকে। মুজাহিদরা সারারাত পাহারা দিত এবং দিনের বেলায়ও পরিশ্রম করত। সাথে সাথে দুআও করা হত। সেই দৃশ্য ছিল বড় অপূর্ব। সেখানকার মাটি ঝরঝরে এবং পাথুরে, যে কারণে কয়েকবার উপর থেকে মাটি ধসে পড়ে সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে যায়। যা পরিষ্কার করতে কয়েকদিন সময় লেগে যায়। কিন্তু তবুও মুজাহিদরা সাহস হারায়নি। প্রাচীরের নিকট থেকে সুড়ঙ্গ খনন করা আরম্ভ করা হয়েছিল, বিধায় মাত্র ৬০ ফুট খনন করতেই সুড়ঙ্গ অপর প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

কিন্তু নভেম্বর মাসের এক রবিবারের সকালে জেল কর্তৃপক্ষ সি.ও.আর.পি.এফ এর সাতটি কোম্পানী ও অন্যান্য ফোর্স নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে। ছুটির দিন হওয়ায় সাথীরা পাহারার কাজে কিছুটা গাফেল ছিল। তারা ভেবেছিল আজ ছুটির দিন, আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। সেই অমনোযোগিতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চতুর্দিক থেকে তারা মুজাহিদদেরকে ঘিরে ফেলে। উভয় দলের মধ্যে লড়াই হয়। কিন্তু মুজাহিদরা অবিচলতার সাথে লড়ার সুযোগই পায়নি। কারণ, লড়াইয়ের জন্য ছাদের উপর আগে থেকেই বিপুল পরিমাণ পাথর জমা করে রাখা হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল যে, আক্রমণ হলে সকল মুজাহিদ ছাদে উঠে পাথর দ্বারা মুকাবিলা করবে। কিন্তু সকলে ছাদে ওঠার সুযোগই পায়নি। অল্পকিছু মুজাহিদ ছাদে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের অনেকেই আহত হয়ে পিছু হটেন,পরে তারা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে,ফলে আমাদের সাথী নভিদ আনজুম (রহঃ) শহীদ হন। অনেক সাথী আহত হন।

পরিশেষে জেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে সেখান থেকে বের করতে সক্ষম হয়। তখন তাদের কাছে সুড়ঙ্গ রহস্য উম্মোচিত হয়ে পড়ে। কারাগারের ভিতরের সুড়ঙ্গ খননের কাজটি ছিল অতি মজবুত ও সুশৃংখল। সুড়ঙ্গ খননের ঘটনাটি ভারত সরকারের বিরাট মাথাব্যথার কারণ হয়। তাদের যেসব দক্ষ লোক সুড়ঙ্গের

তদন্ত করে এবং সেটি কাছে থেকে দেখে, তারা মুজাহিদদের উপর সীমাহীন পীড়ন চালায়। তারা জানতে চায় যে, আপনাদের নিকট কি কি যন্ত্র ছিল, যা দ্বারা আপনারা এই কাজ করেছেন? বস্তুত এ কাজ বাহ্যত কোন যন্ত্রপাতি ছাড়া সম্ভবপর ছিল না। পরিশেষে তারা প্রহার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেই রহস্য তারা মুজাহিদদের থেকে উদঘাটন করতে পারেনি। আর কি করেই বা উদঘাটন করবে? কারণ, যারা এই সুড়ঙ্গ খনন করেছিল তাদেরও জানা ছিল না যে, তাদের হাতে এত উন্নত কাজ কি করে সম্ভব হল। নিঃসন্দেহে এসবই ছিল দয়াময় আল্লাহর মদদ।

সুড়ঙ্গ খননের দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৯ এর জুন মাসে। তখন আমাদের পাকিস্তানী মুজাহিদদেরকে কাশ্মীরী মুজাহিদদের থেকে পৃথক করে ভিন্ন ভিন্ন দুটি ব্লকে স্থানান্তরিত করা হয়। ব্লক দুটির মাঝখানে একটি প্রাচীর ছিল। মুজাহিদগণ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তা অনায়াসে অতিক্রম করতে পারত। প্রাচীরটি আনুমানিক নয় ফুট উচু ছিল। আমরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেই যে, ১২নং ব্লকে নির্মাণ কাজের জন্য একটি ম্যানহোল তৈরী করা হয়েছিল। সেটি কেমোফ্লোজ করে রেখে দেওয়া হয়। মুজাহিদরা তা দেখে ফেলে এবং তার ভিতর দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ খননের সিদ্ধান্ত

নেয়। কিন্তু এবারের সুড়ঙ্গ খনন করা পূর্বেরটার তুলনায় অনেক জটিল ছিল। সে কাহিনী বাস্তবিকই দৃঢ় সংকল্পের কাহিনী। সংক্ষিপ্ত এই যে, আড়াই তিনমাসের বিরামহীন পরিশ্রমের ফলে ৬০/৭০ জন মুজাহিদ মিলে ১২০ ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ তৈয়ার করে। কিন্তু ১৯৯৯ সালের জুন মাসের ১৪ তারিখ রাতে, তখন বরং ১৫ তারিখ শুরু হয়ে গিয়েছিল সুড়ঙ্গটি ধরা পড়ে যায়। জেল কর্তৃপক্ষের পাশবিক নির্যাতনে মুহতারাম ভাই কমাণ্ডার সাজ্জাদ আফগানী শহীদ হয়ে যান। আরো দশজন সাথী মারাত্মক আহত হন। তাদের কারো কারো উভয় হাঁটু ভেঙ্গে যায়। কারো হাত পায়ে ফাটল দেখা দেয়। এভাবে এ প্রচেষ্টাটিও বাহ্যিকভাবে নিষ্ফল রয়ে যায়।

এ দুটি ছিল এমন চেষ্টা, যার জন্য অত্যধিক শ্রম ব্যয় করা হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পরিকল্পনা সম্পর্কে বলব যে, কারাগারের যে বন্দী তার বন্দীত্বকে দাসত্ব মনে করে এবং কাজের অঙ্গনে বের হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে তার দৃষ্টান্ত সেই বাজপাখীর মত, যে তার সাধ্য ও সামর্থ্য মত ডানা আছড়িয়ে পিঞ্জর ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করে। বারবার আহত হয়। কিন্তু চেষ্টা করা থেকে বিরত হয় না। কারণ, তার স্বভাব দাসত্বকে মেনে নেয় না। তাই অসংখ্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। কোন

কোন টর্চারিং সেন্টারেও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে জেলারকে ক্রয় করে তার মাধ্যমে মুক্তির চেষ্টাও শামিল ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় আসার পূর্বেই আমাদেরকে সেসব জায়গা থেকে স্থানান্তরিত করা হয়। এমনিভাবে আরো কিছু চেষ্টা করা হয়, যেগুলো বাইরের সাহায্য না পাওয়ার কারণে সফল হয়নি। কারণ, দীর্ঘদিন ভিতরে থাকার কারণে যে কেউ বাইরে বের হওয়ার জন্য কিছু না কিছু বাইরের সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়।

মোটকথা, ছয় বছর চব্বিশ দিনের এই বন্দীকাল এমন অনেক প্রচেষ্টারই সমষ্টির নাম। যেগুলোতে আমরা মুক্তি লাভের জন্য আমাদের সকল শক্তি ব্যয় করি। পরিশ্রম করি। আমরা ইসলামের দুশমনদের উপর এই প্রভাব বিস্তার করি যে, একজন মুসলমান কখনোই মুশরিক ও কাফেরদের দাসত্ব সহ্য করতে পারে না। এসব চেষ্টার ফলে ভারত সরকারের বড় একটি ক্ষতি এই হয় যে, তারা আমাদের মধ্য থেকে কাউকে যেখানেই বন্দী রেখেছে, সেখানে নিরাপত্তার জন্য সরকারকে বিপুল ব্যয় বহন করতে হয়েছে। যার পরিমাণ কোটি টাকা। কোন কোন সময় তারও অধিক হয়েছে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, আমরা তিহার কারাগারের যেই ব্লকে থাকতাম, তার মধ্যে ১০টি সেল ছিল। সেলের বাইরে একটি উন্মুক্ত স্থান ছিল। কয়েদীরা সেখানে হাঁটাহাটি করত। তাদেরকে

সকাল সন্ধ্যা সেখানে নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু জানি না ভারত সরকারের কি সন্দেহ হল যে, সেখানেও সে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে লোহার শিকের একটি প্রাচীর তৈরী করে। এতে তার অনেক অর্থ ব্যয় হয়। পরে জানতে পারি, তাদের আশংকা হয়েছিল যে, মুজাহিদ সাথীরা হেলিকপ্টারযোগে এদেরকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। অথচ তিহার কারাগার অত্যন্ত উন্নতমানের নিরাপত্তাবেষ্টিত কারাগার। তার মধ্যে অতি উঁচু উঁচু বাংকার ও সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে। এমনিভাবে কোটভলওয়ালেও আমাদেরকে যে কারাগারে রাখা হয় এবং জম্মুতেও যে জায়গায় আমাদেরকে বন্দী রাখা হয়, সেখানেও বিভিন্ন রকম ফোর্সকে এমন এমন বিরল বিস্ময়কর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হত, তাদেরকে বারবার পরিবর্তন করা হত এবং তাদেরকে যোগাযোগের এমন ব্যবস্থা দেওয়া হত, যা তাদের সমপদের লোকদেরকে সচরাচর দেওয়া হত না। এমনিভাবে আমাদেরকে কখনো কোর্টে নিতে হলে বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করতে হলে তখনও নিয়মিততান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা করা হত। কোন কোন সময় স্থলপথ অসংরক্ষিত মনে করে আমাদেরকে বিমানযোগে স্থানান্তর করা হয়েছে।

মোটকথা আমাদের বিরামহীন এই চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে ভারত সরকার খুবই দুশ্চিন্তা ও কষ্টের মধ্যে থাকে। তার

বিরাট অংকের আর্থিক ক্ষতিও হয়। এখনও হচ্ছে। বরং আমার মুক্তির পরে তা আরো বেড়েছে। কারণ, আমার মুক্তিতে তাদের আশংকা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ পাক তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে অধিক ক্ষতির সম্মুখীন করুন।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): শহীদ সাজ্জাদ (রহঃ) আপনার অতি পুরাতন বন্ধু ছিলেন, তার সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: শহীদ সাজ্জাদ (রহঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া ইনশাআল্লাহ তখন বর্ণনা করব, যখন আপনাদের পত্রিকার শহীদ সাজ্জাদ (রহঃ) বিশেষ সংখ্যা বের হবে। আমার বেশির ভাগ প্রবন্ধ ও বক্তৃতাতেও তার কথা এসে থাকে। তার শাহাদাতের বেদনাবিধূর ঘটনাও আমি বিভিন্ন মজলিসে বর্ণনা করেছি। সংক্ষিপ্ত এই যে, ১৯৯৯ এর জুন মাসে দ্বিতীয় বার সুড়ঙ্গ খনন করা হয়, তাতে তার চেষ্টা ও পরিশ্রমই ছিল বেশি। কাজের অধিকাংশ দায়িত্বও তিনি নিজের মাথায় নিয়েছিলেন। খনন করার দায়িত্বও ছিল তার উপর। ফলে আল্লাহ তাআলা এ কাজের পুরষ্কার শাহাদাত রূপে তাকে দান করেছেন। তাকে কারাগারের বিষাদময় জীবন থেকে মুক্তি দান করেছেন। মজলুম শহীদ হওয়ায় তাকে অন্যান্য শহীদের তুলনায় বিশিষ্টমণ্ডিত করেছেন। তিনি আমাদের সবার

পূর্বে শাহাদত লাভ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে শাহাদতের সৌভাগ্য নসীব করুন। আমাদের কাউকেই যেন তা থেকে বঞ্চিত না করেন।

জায়শে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আপনার মুক্তির জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয়, সে সম্পর্কে আপনি পূর্ব থেকে অবগত ছিলেন কি?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। একদিন আমি নামায পড়ে সেলে প্রবেশ করি। অভ্যাস মাফিক খবর শোনার জন্য রেডিও অন করে হাইজ্যাকের খবর শুনতে পাই। খবর শুনে আমি এ পরিমাণ হতভম্ব ও বিস্মিত হই যে, মাটিতে না বসে আমি হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে পড়ি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই সংবাদ শুনতে থাকি। তারপর নির্বাক হয়ে এই চিন্তায় হারিয়ে যাই যে, এ কি হল? আমি আগে থেকে এ সম্পর্কে কিছু জানতাম না। তবে আমি উপলব্ধি করছিলাম যে, এ নিশ্চয় মুজাহিদদের কাজ। সম্ভবত এটি আমাদের মুক্তি প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। প্রত্যেক সাথীর ধারণা ছিল যে, আমার মুক্তির জন্যই এ চেষ্টা করা হয়েছে। আর ঘটনাক্রমে আমার ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): হাইজ্যাকের ঘটনা আরম্ভ হলে আপনার সঙ্গে ভারত সরকারের আচরণ কেমন হয়?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: এ বড় বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এ ধরনের তৎপরতার পর সাধারণত বন্দীদের উপর অত্যধিক পীড়ন করা হয়ে থাকে। অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এ ঘটনাটি ভারত সরকারের হুঁশ বুদ্ধি এভাবে বিলুপ্ত করে দেয় যে, তাদের বুঝেই আসছিল না যে, তারা কি করবে। আমরা ভারতেই ছিলাম। সেখানকার পত্র-পত্রিকা পড়ছিলাম। রেডিও শুনছিলাম। জেল কর্তৃপক্ষও আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করছিল। এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিক্রিয়া এই ছিল যে, কারগীলের যুদ্ধের মত এই ঘটনাটিও ভারত সরকারকে মারাত্মক দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত করেছে। প্রথম দুই তিনদিন পর্যন্ত তো তারা বাইরের নিরাপত্তা দৃঢ় রাখে। কিন্তু ভিতরে আমাদের সাথে কোন কথাবার্তা বলেনি। তবে চতুর্থ বা পঞ্চম দিন আমি যখন পবিত্র রমাযান মাসে যোহর পর আমার আমলে রত ছিলাম, তখন আমাকে কারাগারের অফিসে ডেকে নেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে জানতে পারি যে, কয়েকজন অফিসার এসেছে। তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তারা আমার নিকট প্রশ্ন করে যে, এই হাইজ্যাকের ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন কি? আমি বললাম না, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানিনা, তখন তারা আরো কয়েকটি প্রশ্ন করে। আমি তাদেরকে বলি যে, আপনাদের উপর আমার বিস্ময় জাগছে যে, আপনারা আপনাদের শক্তির উপর এত বড় অহংকারও করেন এবং প্রকৃতপক্ষে আপনাদের নিকট শক্তি রয়েছেও। তারপরও

আপনারা আমাদের মত অসহায় বন্দীদের নিকট সহযোগিতা নিতে এসেছেন। আলফারানের ঘটনা যখন ঘটে, তখন তিন চারজন মানুষকে মুক্ত করার জন্য আপনাদের নিকট এতগুলো ফোর্স ছিল। কিন্তু তারপরও আপনারা আমাদের নিকট ঘুরতে থাকেন এবং এখানে বিদ্যমান মুজাহিদ কমাণ্ডারদের থেকে আপিল লিখিয়ে লিখিয়ে সারা বিশ্বে প্রচার করতে থাকেন। এই বন্দীদেরকে যদি আপনারা এত প্রভাবশালী মনে করেন তাহলে এদের উপর এত অধিক অত্যাচার চালান কেন? আপনাদের ছোট থেকে ছোট সিপাহীও যখন ইচ্ছা তাদেরকে পীড়ন করে, প্রহার করে। কথাবার্তা চলাকালে আমি লক্ষ্য করি যে, তারা খুবই পেরেশান। মনে হচ্ছিল যেন যেভাবে ইদুরের মাথা কলের মধ্যে আটকে যায়, এমনিভাবে ভারত সরকারও মারাত্মকভাবে ফাঁদে আটকে গেছে। এ কারণেই জেল কর্তৃপক্ষ খুবই সতর্ক ছিল এবং খুব ভদ্রভাবে কথা বলছিল। তবে তারা পূর্ণ শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছিল, যেন আমি একটি বিবৃতি প্রদান করি এবং হাইজ্যাকারদের নিকট বিমান ছেড়ে দেওয়ার জন্য আপিল করি। তাদের এ আবেদনের উত্তরে আমি বলি যে, আমি আপিল করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনাদের অন্তরে বিমানের যাত্রীদের জন্য যেমন দরদ রয়েছে, তেমনি আমার অন্তরে কাশ্মীরের সেই লাখ লাখ মুসলমানেরও দরদ রয়েছে, যাদেরকে প্রত্যহ শহীদ করা হচ্ছে। তাই আমি আপিল করব যে, ভারত সরকার কাশ্মীরকে আযাদ করে দিক, আর

হাইজ্যাকাররা বিমান ফেরত দিক। আর এ আপিলও আমি ভিনদেশী প্রচার সংস্থার সম্মুখে করব।

আমার এ কথা শুনে তারা বলে যে, আপনি কাশ্মীরের কথা বলবেন না। কারণ, এটি পুরাতন সমস্যা। আর হাইজ্যাকের ব্যাপারটা নতুন। বিমানের যাত্রীদের প্রাণহানির আশংকা রয়েছে। আমি বললাম, কাশ্মীরেও তো প্রাণহানীর সমস্যা। সেখানে প্রত্যহ অনেক লোককে হত্যা করা হচ্ছে। কাশ্মীরের লোকদের সঙ্গে তো আমার অন্তরের সম্পর্ক আর বিমানের যাত্রীদের সঙ্গে শুধু মানবতার সম্পর্ক। আপনারা বলছেন যে, কাশ্মীরের বিষয় পুরাতন সমস্যা। তাহলে তো এটাই আগে সমাধান হওয়া দরকার। কিছুক্ষণ কথা হওয়ার পর আমি তাদের সামনে একথা বলে বিবৃতি দানে অস্বীকৃতি জানাই যে, আপনারা আমাদের উপর অত্যাচার করতে চাইলে কোনরূপ ছাড় দিবেন না। বরং এখনই শুরু করে দিন। আর যখন আমার সহ্যের বাইরে চলে যাবে, তখন আমি চিন্তা করে দেখব যে, এখন আমি কি করব। তবে আপনারা যদি মানবতার মূল্যকে সামনে রেখে অত্যাচার করতে না চান তাহলে আমি আপনাদেরকে এ জাতীয় কোন বিবৃতি দানে প্রস্তুত নই।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): কারাগার থেকে বের করে আনার পর কান্দাহার পৌঁছা পর্যন্ত আপনি কি অবস্থায় ছিলেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: এ সময়ের কারগুজারী আমি মুক্তিলাভ করার পর সম্পূর্ণটাই ‘যরবে মুমিন’ পত্রিকায় মারেকা (আযাদী ও লড়াই) শিরোনামে দুই তিন পর্বে লিখেছি, পাঠকগণ বইটি অধ্যয়ন করলেই ভাল হবে।

জায়শে মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): মুক্তির সময়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আমার জানা নাই যে, আমার মুক্তি তৎপরতার শুরু কোনটিকে ধরা হবে? যদি কারাগার থেকে বের হওয়াকেই মুক্তি ধরা হয়, তাহলে সে সময়ের প্রতিক্রিয়া একরকম ছিল, আর যদি কান্দাহারে বিমান অবতরণ করার সময়কে মুক্তির সময় ধরা হয়, তাহলে আমার সে সময়ের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। সার্বিক অবস্থা ছিল এই যে, আমি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার শোকর আদায় করছিলাম। আমার অন্তরে একটি আনন্দ ও পুলকও ছিল। আমার মুক্তির চেয়েও অধিক ইসলামের বিজয় এবং মুজাহিদদের সফলতার আনন্দ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে সময় ভাবাবেগের যেই ভীড় আমার অন্তরে ছিল, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আমি তখনও আল্লাহর শোকর আদায় করেছি এবং পরবর্তীতে ঘটনাটি স্মরণ হলেই আমার হৃদয়-মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): কারাগারে আপনার সঙ্গে অনেক সাথীই ছিল, যখন আপনি মুক্তিলাভ করছিলেন, তখন তাদের সম্পর্কে আপনার মনের আবেগ কি ছিল?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: তাদের বিচ্ছেদ আমার জন্য বড় বেদনাদায়ক ছিল। তারা আমার অতি নিকটতম সহচর ছিলেন। তাদের সঙ্গে আমার ঈমান ও জিহাদের আত্মীয়তা ছিল। আল্লাহর জন্য তাদের সকলকে ভালবাসতাম। আমাদের জীবনের বেদনাপূর্ণ কয়েকটি বছর একই সঙ্গে অতিবাহিত হয়। তারা যেভাবে আমার মত অধম ইনসানের খেদমত করেছে এবং সর্বতোভাবে সহযোগিতা ও আরামের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছে এবং কারাগারে থাকতে আমাকে হেফাজত করার যে চিন্তা তাদের ছিল, আমি তা কখনও ভুলতে পারব না। আমি তাদের কাছে বড় কৃতজ্ঞ। এখনও প্রায় সময় আমি তাদের কথা স্মরণ করে থাকি। এখন আমার জীবনের লক্ষ্যসমূহের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অতিসত্বর মুক্তি দান করুন।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): ভারত সরকার হাইজ্যাককে ব্যর্থ করতে সফল হয়নি কেন? এ ব্যাপারে আপনার ধারণা কি? মাওলানা মাসঊদ আযহার: ভারত সরকার এ সম্পূর্ণ ঘটনায় কেন ব্যর্থ হয়েছে, সে

সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন একটি কারণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ভিতর ও বাইরের এমন অনেক কারণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, যে সবের কারণে ভারতকে এমন শিক্ষণীয় পরাজয়ে পর্যুদস্ত হতে হয়।

প্রথমতঃ মনে হয় যে, যে সকল মুজাহিদ এই কাজ সম্পাদন করেছেন, তারা ছিলেন পরিপূর্ণ নিষ্ঠাবান ও দৃঢ়সংকল্প। আর নিষ্ঠা ও দৃঢ়সংকল্প সহকারে প্রাণ হাতে নিয়ে জিহাদের ময়দানে পা ফেললে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি মিলেও সে পদক্ষেপকে ঠেকাতে পারে না। এটি বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা, যা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে।

ভারতের পরাজয়ের দ্বিতীয় কারণ হলো, বিমান ছিনতাইকারীদের যথাসময়ের যথোপযুক্ত তৎপরতা। তারা যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কোনরূপ বিলম্ব করেনি। আপনারা তো পত্র-পত্রিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ পড়েছেন, যা থেকে এমন মনে হয় যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে তাদের পথপ্রদর্শন করা হচ্ছিল, যে কারণে তারা যথাযথ সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছিল। যেমন, প্রথমেই যদি বিমানটি লাহোরে অবতরণ করানো হত, তাহলে বাহ্যত হাইজ্যাকিং ব্যর্থ হত। অমৃতসরে অবতরণ করে যতটুকু সময় সেখানে অবস্থান করেছে, তার চেয়ে যদি কয়েক মিনিট বেশী সেখানে অবস্থান করত, তাহলেও তাদের ক্ষতির কারণ

হত। যেমন সম্প্রতি ছেপে বের হওয়া একটি গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে যে, ভারত সরকার সেসময় ভারতের এক নাম্বার শুটারকে বিমান বন্দরে এনেছিল। সে ফায়ার করে বিমানের টায়ার ব্লাস্ট করার পরিকল্পনা করেছিল। সে ছাড়া আর কারোই বিমানকে লক্ষ্য করে ফায়ার করে কোনরূপ বিপদ ক্রয় করার সাহস ছিল না। কিন্তু সেই শুটারের গাড়ী সবেমাত্র অমৃতসরের বিমান বন্দরে প্রবেশ করেছে এ সময় বিমান রানওয়ে ছেড়ে শূন্যে উড়ে যায়। হাইজ্যাকারদের এমন আরো অনেক সিদ্ধান্ত সময়োপযুক্ত দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং কান্দাহারেও এমনই হয়েছে। বিমানের ভিতরের প্রকৃত অবস্থা তো যারা এ কাজ করেছেন তারাই জানেন। তবে বাহ্যিক অবস্থা ও উপকরণে এমনই মনে হয় যে, হাইজ্যাকারদের শক্তিশালী সিদ্ধান্ত ভারতের পরাজয়ের বড় একটি কারণ। তৃতীয়, এর জন্য ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও বড় কারণ ছিল। বিজেপি সরকার অতিকষ্টে দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করেছে। ওদিকে তার প্রথমবারের ক্ষমতাকাল খুব অল্প সময় স্থায়ী ছিল। সুতরাং তারা নিজেদের মাথায় পরাজয়ের এত বড় কালিমা লেপন করতে চাচ্ছিল না। ওদিকে কারগিলের বিজয়ের উৎসব সমগ্র ভারতে উদযাপন করা হচ্ছিল, অথচ কারগিলেও ভারত কোন বিজয় লাভ করেনি। শুধুমাত্র সেখানকার প্রচার মাধ্যমগুলো

এবং সরকার জনগণকে বুঝিয়েছে যে, তারা কারগিল যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা কারগিলের ক্ষত তখনও চাটছিল। এমতাবস্থায় এই দ্বিতীয় পরাজয় অর্থাৎ বিমানের এতগুলো যাত্রীকে বিজেপি সরকারের ক্ষমতাকালে মেরে ফেলা হবে, বিজেপি সরকারের এই ক্ষতি বহন করার মত রাজনৈতিক শক্তি মোটেই ছিল না। আমার ধারণা এই যে, কংগ্রেসের সরকার হলে এই সরকারের তুলনায় বড় ঝুঁকি নিতে সক্ষম হত। কারণ, তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ৪৬ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর বর্তমান সরকার এতবড় ধাক্কা সহ্য করার যোগ্য ছিলনা। তাছাড়া কিছুদিন পরেই ভারতের কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন ছিল। ভারতের পরাজয়ের পিছনে এ কয়টি বাহ্যিক কারণও ছিল।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): অনেক প্রচার মাধ্যম এই দাবীও করেছে যে, হাইজ্যাকিং ছিল ভারতের নিজের তৈরী করা নীলনকশা, যা পরে তারই গলায় গিয়ে আটকে যায়। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: যার মাথায় মগজ আছে, এমন কোন লোক এমন কথা বলতেও পারে না এবং এমন কথা বিশ্বাসও করতে পারে না। সরকারের বিভিন্ন অপারগতা থাকে। পাকিস্তান ও ভারত পরস্পরের প্রতিপক্ষ। সুতরাং প্রতিটি ঘটনায় পাকিস্তান ভারতকে এবং ভারত

পাকিস্তানকে দোষারোপ করে থাকে। হাইজ্যাকিংয়ে পাকিস্তান সরকার জড়িত ছিল না বলে কোন কোন ‘জ্ঞানীজন’ বলে দিয়েছে যে, ভারত নিজেই এ ঘটনার সাথে জড়িত। কিন্তু পরবর্তীতে যেসব ঘটনা দৃশ্যপটে আসে, তা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ধরনের বিবৃতি শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল। যার কোনই গুরুত্ব বা বাস্তবতা নেই। যেসব মুসলমান হযরত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর সাহেব (মুঃ যিঃ আঃ)এর উপর আস্থা প্রকাশ করেন। তারাও যদি এমন কথা বলে, তাহলে এ ধরনের লোকের জন্য শুধুমাত্র এই দুআই করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। কেননা, মুসলমানদের এত বড় বিজয়কে কাফেরদের পদপ্রান্তে লুটিয়ে দেওয়া জ্ঞান ও বুদ্ধি কোনটারই পরিচায়ক নয়।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): কেউ যদি আপনাকে এ কথা বলে যে, ভারত তার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করার লক্ষ্যে আপনাকে মুক্তি দিয়েছে, তাহলে আপনি কি উত্তর দেবেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: ভারতের এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছয় বছর চব্বিশদিন পর কেন স্মরণ হলো। অথচ আমি যে সময় বন্দী হই, তখন আমার অবস্থান মুক্তির সময় থেকে অধিক শক্তিশালী ছিল। শক্তিশালী একটি সংগঠনের

আমি ক্ষমতাবান দায়িত্বশীল ছিলাম। আল্লাহ না করুন, এমন বিক্রয়যোগ্য সদাই হতে পারলে তখনও হতে পারতাম। তাছাড়া আমাকে যেসব কারাগারে রাখা হয়েছিল, তা পৃথক কোন কারাগার ছিল না। সেখানে আরো শত শত কয়েদী ছিল।

তবে যেসব মুসলমান আল্লাহতে বিশ্বাস রাখেনা এবং মনে করে যে, দুনিয়ায় কোন কাজই কাফেরদের ইঙ্গিত ছাড়া হতে পারে না। তারাই এমন কথা বলতে পারে। আমার মুক্তিতে ভারতে শোকের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তারা কি পরিমাণ অস্থির হয়েছে, ভারতের পার্লামেন্টে উত্তপ্ত বিতর্ক থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। তাই কেউ আমাকে এমন প্রশ্ন করলে উত্তরে আমি তাকে এ কথাই বলব যে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে একে অপরের ব্যথা বোঝার তাওফীক দান করুন। জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): হাইজ্যাকাররা ৩৮ জন মুজাহিদের মুক্তি এবং ত্রিশ কোটি টাকার দাবী করেছিল। একথা কি ঠিক?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আমাদের সূত্ৰসমূহ এ কথার সত্যায়ন করে। বরং আমি কোন কোন অফিসারের নিকট সেই কাগজটিও দেখেছি, যার মধ্যে সেই আটত্রিশ জন মুজাহিদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। হাইজ্যাকাররা ভারত সরকারের নিকট যাদের মুক্তির দাবী করেছিল, তাদের মধ্যে কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ

লাংরিয়াল এবং মাওলানা আবূ জান্দালের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এ কথাও ঠিক যে, তারা বড় অংকের অর্থও দাবী করেছিল। কিন্তু তালেবান সরকারের হস্তক্ষেপে তারা সে দাবী প্রত্যাহার করে নেয়। দীর্ঘ আলোচনার পর পরিশেষে তারা তিন ব্যক্তির মুক্তির উপর রাজী হয়ে যায়।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): মুক্তির জন্য তিন ব্যক্তির নির্বাচন হাইজ্যাকাররা করেছিল, নাকি ভারত?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: তালেবান সূত্র বলেছে যে, হাইজ্যাকাররা অন্যান্য দাবী প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিলেও তারা আটত্রিশজন মুজাহিদের মুক্তির ব্যাপারে অটল ছিল। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত সরকার তিনজনকে মুক্তি দেওয়ার জন্য রাজী হয়। তবে সেই তিনজনের নির্বাচনের অধিকার বিমান ছিনতাইকারী মুজাহিদদের নিকট ছিল। তারা আমাকে ও অপর দুইজন সাথীকে নির্বাচন করে।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আপনার ধারণায় তাদের এই সওদা কেমন হয়েছে?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।

জায়শে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): হাইজ্যাকিংয়ের ন্যায় ঘটনাবলীকে সমগ্র বিশ্বে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। এমন কাজ দ্বারা কি ভারতকে হার মানানো যাবে?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: কাউকে হার মানানো আর না মানানোর সম্পর্ক এমন সব চিন্তাধারার সাথে রয়েছে, যেগুলোর উপর সচরাচর আলোকপাত করা হয়ে থাকে, সম্ভবত আপনারা হাইজ্যাকিং এর বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, যদিও হাইজ্যাকিং একটি অসিদ্ধ পদক্ষেপ, কিন্তু ভারত সরকার কাশ্মীরী ও স্বয়ং ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে এবং বন্দী মুজাহিদদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তার সামনে এই পদক্ষেপ কোন গুরুত্বই রাখে না। ভারতের অরাজকতা এর চেয়ে অনেক বেশি।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): হাইজ্যাকাররা আপনাদের তিনজনকেই কেন নির্বাচন করল?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের মুক্তির ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছিল।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): যেসব লোক আপনাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন, তাদের ব্যাপারে আপনার মনোভাব কি?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: শুধু আমার কেন অসংখ্য মুসলমানের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কল্যাণ, বরকত ও হেফাযতের দুআ রয়েছে। তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অজস্র অশ্রু নিষ্পাপ মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হয়েছে। তাদের কাজকে যে নিন্দার যোগ্য বলেছে, সেও রাতে উঠে তাদের জন্য দুআ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তারা নিজেদের জন্য এমন এক সদকায়ে জারিয়া রেখে গেছে, যাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে। তারা মুসলিম উম্মাহর চোখের শীতলতা ও হৃদয়ের প্রশান্তিরূপে এসেছিল। আমি এমন অনেক লোকের সাক্ষাত পেয়েছি, যারা আল্লাহর এই শার্দুলদেরকে একনজর দেখার জন্য অস্থির ছিল। কিন্তু এমন কে আছে, যে তাদেরকে দেখতে পারে? জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আপনি কি মনে করেন যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন ব্যক্তি আরো রয়েছে, যারা এমন কৃতিত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করতে পারে?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: থাক আর না থাক, কিন্তু এমন লোক হওয়া দরকার। জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): বিষয়টিকে চূড়ান্তে পৌঁছানোর মধ্যে তালেবান সরকারের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আপনি তাদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি কেমন পেয়েছেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার: তালেবান সরকার পুরো ব্যাপারটিতে যেভাবে নিজেদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও উচ্চ মেধার পরিচয় দিয়েছে, তা দেখে বিশ্বের যেসব লোক তালেবানকে পশ্চাদপদ মনে করে, তারা পর্যন্ত বিস্মিত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা তো পূর্ব থেকেই তালেবানকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং তাদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও নেতৃত্বকে পূর্ব থেকেই সালাম করে আসছি। এই ঘটনা তাদের প্রতি আমাদের ভক্তি ও ভালবাসায় সীমাহীন বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): ভারত যদি বলে যে, এই ঘটনাতে তালেবান জড়িত আছে, তাহলে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি হবে? মাওলানা মাসঊদ আযহার: তালেবানকে এর সাথে জড়িত সাব্যস্ত করা ভারতের অতি বড় নির্বুদ্ধিতা হবে। কেননা যেভাবে আমাদের উপর তালেবানের অনেক বড় অনুকম্পা রয়েছে, তেমনিভাবে ভারতের উপরও তাদের অনুগ্রহ রয়েছে যে, তারা নতুন শতাব্দীর সূচনাতে ভারতকে এত বড় ক্ষতি থেকে বাঁচিয়েছে। উপরন্তু ভারত তালেবানকে স্বীকৃতি না দেয়া সত্ত্বেও তালেবান তার প্রতিনিধি দল ও দূতদেরকে তাদের দেশে আসার অনুমতিই শুধু দেয়নি, বরং তাদের সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতাও করেছে। তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। তালেবানের হস্তক্ষেপেই

ভারত হাইজ্যাকারদের অন্যান্য দাবী পুরা করা থেকে বেঁচে গেছে।

জায়শে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): কান্দাহার বিমান বন্দর থেকে বের হওয়ার পর আপনি কোন দিকে যাত্রা করেন?

মাওলানা মাসঊদ আযহার : সম্মুখ পানে।

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ

"এ হলো আল্লাহর অনুকম্পা। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।"

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

সমাপ্ত